ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব

The History of Thumri and its Influence on Bangla Classical songs

মোঃ তৌফিকুজ্জামান অপু

এম.ফিল. গবেষক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মার্চ, ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব

The History of Thumri and its Influence on Bangla Classical songs

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ তৌফিকুজ্জামান অপু

এম.ফিল. (২য় পর্ব)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

রেজিঃ নং- ১৬৩

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব' (The History of Thumri and its Influence on Bangla Classical songs) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের রচনা। এটি আমার এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পাদিত গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশবিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করা হয়নি এবং কোন জার্নাল, সাময়িকী, পুস্তক কিংবা কোন প্রকাশনার আকারেও এই গবেষণা বা এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গিকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভটিতে কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

মোঃ তৌফিকুজ্জামান অপু
এম.ফিল. (২য় পর্ব)
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০
রেজিঃ নং-১৬৩
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ তৌফিকুজ্জামান অপু, রেজিঃ নং-১৬৩, শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০২০ কর্তৃক উপস্থাপিত 'ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব' (The History of Thumri and its Influence on Bangla Classical songs) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি। আমার নিকট সম্পূর্ণ মৌলিক মনে হওয়ায় অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভটিতে কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অধিক আগ্রহ জন্মেছিল বাবার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ থেকে রাগসংগীতে স্নাতকোত্তর করার সুবাদে রাগসংগীত, ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গান সম্পর্কে আমার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুরু থেকেই এই বিষয়ে আমার এম.ফিল. ডিগ্রি সম্পন্ন করার স্বপ্ন ছিল। 'ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব' (The History of Thumri and its Influence on Bangla Classical songs) শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এরপরেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগীত বিভাগের প্রতি, আমাকে এম.ফিল. ডিগ্রি সম্পাদনের সুযোগ প্রদানের জন্য। বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী'র প্রতি। তিনি আমাকে কেবলমাত্র তথ্যানুসন্ধানেই নয়, গবেষণাকার্যের প্রতিটি বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করে গেছেন। তাঁর আশীর্বাদ ও সহায়তাটুকু না পেলে হয়তো আমার এই গবেষণাকর্মটি কোন ভাবেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আমাকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য সংগীত বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি আমি আজন্ম কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা– তাছলিমা জামান এবং বাবা– মো: অহিদুজ্জামানের প্রতি, যাঁরা ওতপ্রোতভাবে সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আমার এই গবেষণাকার্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন সমস্যায় সবসময় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের ঋণ কোন দিনও পরিশোধ করা যাবে না। আরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার স্ত্রী ইসমত জাহান সানমুনের প্রতি, আমাকে এই গবেষণাকার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য।

মোঃ তৌফিকুজ্জামান অপু

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

ঠুমরী উত্তর প্রদেশের এক ধরনের রাগাশ্রীত লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীত। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে ঠুমরী অন্যতম একটি ধারা। বিভিন্ন প্রকার অলংকার প্রয়োগ করে সংগীতের নান্দনিক রস সঞ্চার করাই ঠুমরী গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর সৌষ্ঠব এতই মধুর যে সহজেই লোকের চিত্ত হরণ করে। ঠুমরী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এমন একটি শৈলী যাতে শৃঙ্গার রস, মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লিলার কথা সহজে অনুধাবন করা যায়। এই গানে গায়ক ও গায়িকার ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর বেশ প্রভাব রয়েছে। রাগপ্রধান বাংলা গানে বোল বানানোর যে লালিত্য বর্তমানে এসেছে তা মূলত ঠুমরী অঙ্গের গানগুলোকে অনুসরণ করেই। প্রথম অবস্থায় ঠুমরী গান বাঈজী সমাজের উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু, সেই গান উন্নতমানের ছিল না। যুগে যুগে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঠুমরী গান উন্নতি সাধন করেছে। ঠুমরী গানের জনপ্রিয়তা অর্জনে বহুকাল সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং অনেক সংগীতগুণীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। তাই এই বিষয়টি নিয়ে অধিকতর অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে এবং এর পরিধিও বিস্তৃত। অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে ঠুমরী গানের উদ্ভবের ইতিহাস, এর বিকাশ, গায়নশৈলী, ঠুমরী গানের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, এর প্রচার ও প্রসারে তৎকালীন সংগীতজ্ঞ ও সংগীত ঘরানা, রাজা-বাদশাদের ভূমিকা এবং রাগপ্রধান বাংলা গানের উদ্ভব এবং এই গানে ঠুমরীর প্রভাব নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হবে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঠুমরী গানের পান্ডুলিপি, অডিও টেপ রেকর্ডিং, আর্কাইভস ইত্যাদির শরনাপন্ন হতে হবে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে ঠুমরী গান জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করেছে। খেয়াল ও ধ্রুপদের ভক্তিভাবের গাম্ভীর্যতাপূর্ণ কঠোরতার পাশ কাটিয়ে ঠুমরী রাগ সংগীতের নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। এমন একটি সমৃদ্ধশালী বিষয়ে গবেষণার ফলে ঠুমরী গানের বর্তমান প্রেক্ষাপট, শাস্ত্রীয় সংগীতে এর অবস্থান ও জনপ্রিয়তা এবং রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রয়োগ ও প্রভাব সম্পর্কে চর্চার ক্ষেত্রে গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ---------- ১০

অধ্যায় বিভাজন ---------- ১৩

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় সংগীতে রাগ ---------- ১৫

১.১ ঠাট ও রাগ সম্পর্কিত আলোচনা ---------- ১৮

১.১.১ উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঠাট ---------- ১৮

১.১.২ ভারতীয় সংগীতে রাগ ---------- ২০

১.২ রাগের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য ---------- ২২

১.২.১ সন্ধিপ্রকাশ রাগ ---------- ২৬

১.২.২ পরমেল-প্রবেশক রাগ ---------- ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঠুমরী গানের উৎপত্তির ইতিহাস ---------- ৩২

২.১ ঠুমরীর পরিচিতি ---------- ৩৪

২.২ ঠুমরী গানের উদ্ভব ---------- ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ঠুমরী গানের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান ---------- ৪৪

৩.১ ঠুমরীর ক্রমবিকাশ ---------- ৪৫

৩.১.১ নৃত্য প্রধান ঠুমরী ---------- ৪৬

৩.১.২ খেয়াল প্রধান ঠুমরী ---------- ৪৬

৩.১.৩ ভাবপ্রধান ঠুমরী ---------- ৪৭

৩.২ ঠুমরীর ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান ---------- ৪৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী ---------- ৭১

৪.১ ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ ---------- ৭২

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১ খাড়ী ঠুমরী ---------- ৭৪
৪.১.২ সরল ঠুমরী ---------- ৭৪
৪.১.৩ ঘনাক্ষরী ঠুমরী ---------- ৭৪
৪.১.৪ লচাও ঠুমরী ---------- ৭৫
৪.১.৫ কহন্ ঠুমরী ---------- ৭৫
৪.১.৬ খেয়াল ভঙ্গিম ঠুমরী ---------- ৭৬
৪.১.৭ টপ্পা ভঙ্গিম ঠুমরী ---------- ৭৬
৪.১.৮ বিলম্বিত ঠুমরী ---------- ৭৭
৪.১.৯ দ্রুত ঠুমরী ---------- ৮০
৪.২ ঠুমরী গানের বৈশিষ্ট্য ---------- ৮১
৪.২.১ ধ্রুপদ---------- ৮২
৪.২.২ খেয়াল ---------- ৮৪
৪.২.৩ টপ্পা ---------- ৮৫
৪.২.৪ ঠুমরী ---------- ৮৭
৪.৩ ঠুমরী গানের গায়নশৈলী ---------- ৯০
৪.৩.১ ঠুমরী গানে রাগ ---------- ৯১
৪.৩.২ ঠুমরী গানে তাল ---------- ১০৪
৪.৩.৩ ঠুমরী গানের ঘরানা ---------- ১১০
৪.৩.৪ নাটকীয়তা ---------- ১১৯
৪.৩.৫ গায়কের গুণ-অবগুণ ---------- ১২৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব ---------- ১২৭
৫.১ রাগপ্রধান বাংলা গান ---------- ১২৯
৫.২ রাগপ্রধান বাংলা গানের ইতিহাস ---------- ১৩১
৫.৩ পঞ্চকবি ও রাগপ্রধান গান ---------- ১৩৪
৫.৪ রাগপ্রধান বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য ---------- ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচার ও প্রসার ---------- ১৪৪

৫.৬ রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব ---------- ১৫০

উপসংহার ---------- ১৫৭

পরিশিষ্ট -১ চিত্র- ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পী ---------- ১৫৯

পরিশিষ্ট -২ উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান বাংলা গানের তালিকা ---------- ১৬৩

পরিশিষ্ট -৩ উল্লেখযোগ্য ঠুমরী গানের তালিকা ---------- ১৬৫

তথ্যসূত্র ---------- ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংগীতকে বলা হয় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সংগীত বিরাজমান ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সংগীতের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে, আদিকাল থেকেই এই অঞ্চলে সংগীতের চর্চা হয়ে আসছে। তবে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগে সংগীতের আসল রূপটি কি ছিল তা জানা যায়নি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যে নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবিষ্ট সংগীত রীতির রসাস্বাদন করতে পারছি তার সাথে জড়িয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস। আদিকাল হতে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজনের মাধ্যমে সংগীত উৎকর্ষ লাভ করেছে। বৈদিকযুগের সামগান থেকে শুরু করে বর্তমানকালের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, গজল ইত্যাদি গায়নরীতি প্রতিষ্ঠিত হতে বহু বছর সময় লেগেছে। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারাগুলোর পর্যায়ক্রমে উৎপত্তি ঘটেছে এবং সময়ের পরিক্রমায় তা উৎকর্ষ লাভের পাশাপাশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উপমহাদেশীয় সংগীত ধারাগুলোর উৎপত্তির ইতিহাসে বিরাট স্থান দখল করে আছে ভারতীয় রাগরাগিণী। ভারতীয় রাগরাগিণী বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল উপমহাদেশীয় বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারকে কেন্দ্র করে। সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী গানের মতো প্রসিদ্ধ গীতধারার। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সাধারণ শ্রোতাগণ দরবারী সংগীতের আস্বাদ পায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে যে সংগীত ধারাগুলো বহুল প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে ঠুমরী একটি জনপ্রিয় ধারা। উত্তর ভারতে এ ধারার উৎপত্তি ঘটলেও দরবারী সংগীতজ্ঞদের হাতেই এই গানের সমাধিক উন্নতি সাধন হয়েছে। প্রচীন একপ্রকার লোকগীত থেকে প্রসিদ্ধ ঠুমরী গানের রূপ পরিগ্রহ করতে সময় অতিবাহিত হয়েছে অনেক। ঠুমরী গানকে শাস্ত্রীয় অন্যান্য ধারা থেকে আলাদা করেছে এর ভাবপ্রধান গায়নরীতি। এই গানে রাগরাগিণীর শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়োগ না হলেও কাব্যভাব যথাযথ ফুটিয়ে তোলার সুনিপুণ চেষ্টা করা হয় সুরের অটুট বাঁধনে। ঠুমরী গান বিরহগাঁথা গ্রাম্যগীতের পর্যায় হতে উৎকর্ষ লাভে নৃত্যগীতের পর্যায়ভুক্ত হয়। তৎকালীন সময়ে বাঈজীরা অর্থের বিনিময়ে নৃত্যসহযোগে ঠুমরী গান গাইতো। এই নৃত্যের ‘ঠমক’ থেকে ঠুমরী শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। পূর্বে বাঈজীগণ যে ঠুমরী গান পরিবেশন করতেন তা মানসম্মত না হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল কম। কিন্তু যখন থেকে এই রীতির গান দরবারী সংগীতজ্ঞদের নজরে আসে তখন থেকেই এই গানের রূপ পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতে একটি বিশেষ স্থান করে করে নিতে সক্ষম হয়।[১] ঠুমরী গানের বিষয়বস্তু ও তাতে সুরের মায়াজাল শ্রোতার চিত্তকে হরণ করে খুব সহজেই। ঠুমরী গানের উৎকর্ষ লাভে সবচেয়ে

১। রেবা মুহুরী, *ঠুম্‌রী ও বাঈজী* (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

বেশি অবদান রেখেছেন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্। তাঁকেই আধুনিক ঠুমরী গানের প্রবর্তক বলা হয়। ঠুমরী গানের যে সুললিত রূপটি আমরা পাই, এর মূলে রয়েছে নবাব ওয়াজেদ আলীর ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতা। তিনি অবহেলিত গীতধারাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ দরবারে। পরবর্তীকালে নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবার থেকে এ গানের গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে। ঠুমরী গানের বৈচিত্র্যময় সুরের গাঁথুনিতে প্রভাবিত হয়ে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ নিজেও বহু ঠুমরী গান রচনা করেন। বঙ্গদেশের সংগীত জগতেও ঠুমরী গানকে পরিচিত করেছেন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে নবাব কলকাতায় নির্বাসীত হন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঠুমরী তথা শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি মানুষের আগ্রহ জন্মালে এই ধারার সংগীত চর্চা বেগবান হয়। কলকাতা ছিল তৎকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংগীতের কেন্দ্রবিন্দু।[২] মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দরবারের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেন। কলকাতা, বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগরসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞদের সমাগম ঘটার ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রাগরাগিণীর ব্যাপ্তি ঘটে। অষ্টাদশ শতক হতে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় রাগসংগীত ও বাংলা গান কলকাতায় উৎকর্ষ লাভ করে। এই শিক্ষা লাভের পর একই ধারায় বহু বাঙালি সংগীতজ্ঞ বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, গজল প্রভৃতি গীতধারার সৃষ্টি করলেও তা বাঙালি শ্রোতার মনে তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। তৎকালীন বাংলায় হিন্দুস্থানি রাগসংগীত ও আধুনিক বাংলা গানের একটি বিশেষ শ্রোতা সমাজ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় রাগসংগীত এবং আধুনিক বাংলা গানের শ্রোতার মনোরঞ্জনে সক্ষম এমন এক গীতরীতির উদ্ভাবন হয়। উদ্ভাবিত এই গীতধারার নাম 'রাগপ্রধান বাংলা গান'। বাংলা গানের কথার সাথে হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর মিশ্রণে সৃষ্ট এই রাগপ্রধান বাংলা গান তার সুরের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের মান অক্ষুন্ন রেখে রাগভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। বাংলা রাগপ্রধান গানের জনপ্রিয়তা অর্জনে কলকাতা বেতারের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা বেতার জনসাধারণকে তেমন বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে ১৯৩৭ সালে 'রাগপ্রধান' শিরোনামে বাংলা গানের অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে কলকাতা বেতারের সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং আত্মপ্রকাশ ঘটে নতুন এক সংগীত ধারার। বাংলা রাগপ্রধান গানের মাধ্যমে যে ভাবে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, ঠিক একই ধারায় বাংলা রাগপ্রধান গানও কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কালক্রমে রাগপ্রধান বাংলা গান সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং এই ধারার গান রচনায় তৎকালীন বাঙালি সুরকার ও গীতিকারগণ বাংলা রাগপ্রধান গান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রকাশ করে সৃষ্টি করেন অসংখ্য রাগপ্রধান বাংলা গান।

২। ডঃ অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী, *ঠুম্‌রী গানের ইতিকথা* (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)

Dhaka University Institutional Repository

রাগপ্রধান বাংলা গানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন ধারার প্রভাব রয়েছে। শুরুতে খেয়াল গানের গায়নশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালের আধুনিক রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরী গানের গায়নরীতির আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। তাই ঠুমরীর সাথে রাগপ্রধান বাংলা গানের কোথায় কি যোগসূত্র রয়েছে বা ঠুমরী গান দ্বারা বাংলা রাগপ্রধান গান কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে "ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব" শিরোনামের গবেষণায় কাজ করা হয়েছে। যেখানে ঠুমরীর বৈশিষ্ট্য, গায়নশৈলী এবং রাগপ্রধান বাংলা গানের কোন কোন দিক ঠুমরী গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

'ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা কাজটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিভাজন

'ঠুমরীর ইতিবৃত্ত ও রাগ প্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব' শীর্ষক এই গবেষণাপত্রটি মোট পাঁচটি অধ্যায় ও পনেরটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। অধ্যায় গুলোতে রাগসংগীতের প্রাথমিক পরিচয় থেকে শুরু করে ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় সংগীতে রাগরাগিণীর আবির্ভাব, ঠাট ও রাগ সম্পর্কিত আলোচনায় ঠাটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রাগের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে ঠুমরী গানের পরিচয় ও ঠুমরী সম্পর্কিত মতবাদ, ঠুমরী গানের উৎপত্তির ইতিহাস এবং এর সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঠুমরীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং এর ক্রমবিবর্তনে তৎকালীন শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদের অবদানের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে ঠুমরীর শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন প্রকার ঠুমরী গানের বর্ণনা, রাগের ব্যবহার ও ব্যবহৃত রাগ সমূহের বিবরণ, তাল সম্পর্কিত তথ্য প্রদানসহ ঠুমরীতে ব্যবহৃত তালের বিবরণ ও বোল-বাণীসহ মাত্রা বিভাজন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান ধারাগুলোর সাথে ঠুমরীর তুলনামূলক আলোচনা, ঠুমরী গানের বিভিন্ন ঘরানার পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও স্বরলিপি, ঠুমরী গানে নাটকীয়তার গুরুত্ব এবং এ গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে গায়কের কি কি গুণ থাকা দরকার ও কোন দোষ গুলো বর্জনীয় সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ে রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় রাগপ্রধান বাংলা গানের পরিচয়, রাগপ্রধান বাংলা গান কিভাবে জন্মলাভ করেছে, এর উদ্ভব ও বিকাশে বাংলা সাহিত্যের পঞ্চগীতি কবির ভূমিকা, রাগপ্রধান বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য, এ গানের প্রচার-প্রসার সম্পর্কিত আলোচনা এবং রাগপ্রধান গানে ঠুমরী গানের কোন কোন বিষয় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ উপসংহারে পুরো গবেষণাকর্ম এবং এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার, শিল্পীর স্থিরচিত্র এবং জনপ্রিয় কিছু ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের তালিকা। সবশেষে যুক্ত করা হয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি। এই গবেষণাপত্রে শিকাগো পদ্ধতি ও আধুনিক বানান রীতি (বাংলা একাডেমির বাংলা বানান অভিধান) অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংগীতে রাগ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সংগীতে রাগ

মানব সমাজে ভাষা সৃষ্টির পূর্বেই সংগীতের চর্চা হয়েছে বিভিন্নভাবে। তবে সংগীতের পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রকাশ পায় আরো পরে মানুষের জীবনধারণের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে। আদিম যুগে মানুষ পশুপাখির ডাক শুনে তা নিজের কণ্ঠে ধারণ করত এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করত বা মত বিনিময় করত। মানুষের কণ্ঠে ভাষা সৃষ্টির সাথে ধীরে ধীরে সংগীত বিকাশ লাভ করে। সংগীতকে তাই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট উৎকৃষ্ট মানের নান্দনিক শিল্পকর্মের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সংগীত মানুষের মনের খোরাক মিটায়। মনের ভাব প্রকাশেও সংগীত একটি উত্তম পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় উপমহাদেশে সংগীতের যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে এর সঠিক সময়কাল বা ঠিক কবে থেকে এই শৈল্পিক যাত্রার সূত্রপাত ঘটেছিল এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত যুগে যুগে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সংগীতের সূচনাকাল সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রকার 'দেবব্রত দত্ত' বলেছেন যে, "ভারতীয় সংগীতের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে সামবেদকে মানা হয়ে থাকে। ভারতীয় সংগীতের সুস্পষ্ট একটি রূপ এই যুগেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়।"[৩] ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংগীতের বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন সময়ে।

বিশ্বের সংগীতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হলো প্রাচ্যের বা ভারতীয় উপমহাদেশীয় সংগীত ও অপরটি হলো পাশ্চাত্যের সংগীত যা ইউরোপিয়ান বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক নামেও সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। পাশ্চাত্যের সংগীতশৈলী থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতকে যে বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে পৃথকভাবে সুপরিচিত করেছে তা হলো 'রাগ'। রাগ ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিস্বরূপ। এটি ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। তবে ভারতীয় সংগীতে রাগের আবির্ভাব ঘটে বহুকাল পরে। প্রথমেই ভারতীয় সংগীতে সংযুক্তি ঘটে তিনটি স্বরের যা বৈদিক যুগের সংগীতের অস্তিত্বের বর্ণনা করে। বৈদিক যুগের সংগীতের একমাত্র প্রধান নিদর্শন ছিল সামগান। সামগানের যুগে(সামিক যুগ) সংগীতের প্রাচীন তিন স্বরের ব্যবহার করা হতো। সেই তিনটি স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামে পরিচিত ছিল। এই তিন স্বরের মধ্যেই সংগীতের পরবর্তী সাত স্বর বিদ্যমান ছিল। যেমন– উদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল গান্ধার ও নিষাদ স্বর, অনুদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত স্বরের অন্তর্গত ছিল ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর। তৎকালীন সময়ে সর্বোচ্চ স্বর হিসাবে উদাত্ত, সর্বনিম্ন স্বর হিসাবে অনুদাত্ত এবং মধ্য সপ্তক বা উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বর হিসাবে স্বরিতকে মানা হতো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগীতও তার নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৈদিক তিন স্বর থেকে সাত স্বর, সাত স্বর

৩। দেবব্রত দত্ত, *সংগীত তত্ত্ব*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ঠাট এবং ঠাট থেকে রাগের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে 'রাগ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় সর্বপ্রথম মতঙ্গের '*বৃহদ্দেশী*' গ্রন্থে। মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে রাগের সাতটি জাতির কথা বলেছেন। এই জাতিগুলো হলো– "টকী, সাবীরা, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, বট্টরাগ, হিন্দোলক এবং টক্ককৌশিক।"[৪] অর্থাৎ 'হিন্দুযুগের'[৫] পূর্বে কোথাও রাগের কথা উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন– "রাগ শব্দটি বৈদিক ও বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিকাল যুগে ছিল কি না এ নিয়ে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ও মতভেদ আছে। বৈদিক যুগে 'রাগ' শব্দের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু তার পুরোপুরি সার্থকতা ছিল।"[৬] পরবর্তীকালে রাগরাগিণীর বর্ণনা করেন শিক্ষাকার নারদ তাঁর রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ '*সংগীত মকরন্দ*'–তে যা বৈদিকোত্তর যুগের সংগীতের নিদর্শন। ভারতীয় সংগীতে রাগের সমন্বয় এক নতুন মাত্রার সূচনা করেছিল। ভারতীয় রাগসংগীত ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষতার ছোঁয়ায় সারা বিশ্বকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। ভারতীয় রাগসংগীত সম্পর্কে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী তাঁর রচিত '*শ্রুতিনন্দন*' গ্রন্থে বলেছেন–

> "পৃথিবীর সব দেশেই তাই সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলার চর্চা আছে, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য বিধি ব্যবস্থা আছে। আদিম যুগ থেকেই এসব বিষয়ের অনুশীলন মানুষ করে আসছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, সমাজব্যবস্থা, ভাষা ইত্যাদি কারণে এক দেশের সংগীত, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যদেশের সংগীত ও সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রভেদ দেখি, তেমনি ঈশ্বরের রূপ এবং ধারণা সম্পর্কেও নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যতই প্রভেদ থাকুক না কেন একদিকে সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সব দেশের মানুষ উপলব্ধি করে। সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা, ঈশ্বরের উপাসনা সবদেশে সবকালে মানুষ কেন করে? এই প্রশ্নটি করা স্বাভাবিক। প্রশ্নটির উত্তর একটু চিন্তা করলেই পাওয়া যায়। মানুষ শুধু দেহে সুখ বা আরাম চায় না, মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তিতেই তার পরম তৃপ্তি। ভারতীয় রাগসংগীতের মধ্যে মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি পাওয়ার উপাদান ও উপকরণ আছে। কেবল ভারতীয়রাই যে সেই শান্তি ও আনন্দ পেতে পারে তা নয়। পৃথিবীর সব মানুষকেই ভারতীয় রাগসংগীত আনন্দ ও শান্তি দিতে পারে। আমার এই সিদ্ধান্ত আমার অভিজ্ঞতালব্ধ।"[৭]

স্বরই যে সংগীতের প্রাচীন উৎস সে কথা বলা বাহুল্য। মানুষের কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি সংগীত সৃষ্টির প্রধান কারণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাই সংগীতের সাথে মানুষের আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মানুষ তার আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, মান-অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাত কণ্ঠস্বরের প্রয়োগের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এই কণ্ঠস্বরের প্রয়োগে পরিবর্তন আসে, যা ধীরে ধীরে সাংগীতিক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। কণ্ঠস্বরের এরূপ পরিবর্তন চর্চার মাধ্যমে

৪। শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: সংগীত প্রকাশন, মীরা নাথ, ২০১৫), পৃ. ১৭
৫। হিন্দুযুগ– অতি প্রাচীন যুগ যা পৌরাণিক বা বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০–১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) নামেও পরিচিত।
৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*, ১ম ভাগ (কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, ১৯৫১), পৃ. ১৫৫
৭। অজয় চক্রবর্তী, *শ্রুতিনন্দন* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১১৯-১২০

Dhaka University Institutional Repository

কালক্রমে সংগীতের রূপ নেয়। ভারতীয় রাগসংগীতের প্রসঙ্গে বলতে গেলে দুই প্রকার সংগীতের কথা চলে আসে। একটি হলো দেশী সংগীত ও অপরটি মার্গসংগীত। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রীগণ এই বিভাজন করেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকে যখন সংগীতের একটি বিধিবদ্ধ রূপরেখা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ভারতীয় আদিম অধিবাসী বা অনার্যদের ভাষা, সংগীত, সংস্কৃতির সংমিশ্রণে কালক্রমে দেশী সংগীতের সৃষ্টি হয়। দেশী সংগীতে রাগ পরিবেশনের ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। মার্গসংগীত ভারতীয় সংগীতের অতি প্রাচীন নিদর্শন। এই মার্গসংগীতই কালক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীত বা রাগসংগীত হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। মার্গসংগীতকে অভিজাত শ্রেণির গানও বলা হয়। বৈদিক যুগের গান সামগান। এই সামগানের বিষয়বস্তু নিয়ে মার্গ সংগীতের সৃষ্টি।[৮] এ প্রসঙ্গে সংগীত গ্রন্থ রচয়িতা মোবারক হোসেন খান (১৯৩৮-২০১৯) বলেছেন, "মার্গ শব্দের অর্থ অনুসরণ করা, অন্বেষণ করা অর্থাৎ বৈদিক গানকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যে অভিজাত গান বা সংগীত সৃষ্টি হয় তাকেই মার্গ সংগীত বা অনুসৃত বা অন্বেষিত সংগীত বলে। বর্তমান ক্ল্যাসিকাল সংগীতকে মার্গ প্রকৃতিসম্পন্ন সংগীত বলা যেতে পারে।"[৯] *'সংগীত রত্নাকর'* গ্রন্থে উক্ত দুই প্রকার সংগীতের কথা বলা হয়েছে। শার্ঙ্গদেব তাঁর রচিত সংগীত গ্রন্থে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিয়েছেন। *'সংগীত রত্নাকর'* গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো প্রবন্ধ অধ্যায়। এই প্রবন্ধাধ্যায়ে তিনি গান্ধর্বগানের পরিচয় প্রসঙ্গে এর দুটি প্রকরণ উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো মার্গ ও দেশী সংগীত। শার্ঙ্গদেবের মতানুসারে "মার্গিত বা অন্বেষিত অর্থাৎ চার বেদ থেকে সংগ্রহীত গানই মার্গ সংগীত।"[১০] বিভিন্ন সংগীতগুণীর তত্ত্বাবধানে এসে প্রচীন এই সংগীতরীতি (মার্গ সংগীত) শাস্ত্রীয় বা রাগসংগীত নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। মার্গসংগীতে বিশেষ নিয়ম মেনে রাগ গাওয়া হয়ে থাকে। কালক্রমে এ সংগীত ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। যেমন– শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে পরিবেশিত সংগীতকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হয়। আবার রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে এই গান উচ্চ মর্যাদা লাভ করায় এটি উচ্চাঙ্গ সংগীত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। অন্যদিকে শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম মেনে ভারতীয় রাগসমূহকে গাওয়া হয়ে থাকে বলে এর নামকরণ হয়েছে রাগসংগীত।

১.১ ঠাট ও রাগ সম্পর্কিত আলোচনা

১.১.১ উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঠাট

ঠাট শব্দের অর্থ হলো কাঠামো। স্বর থেকে ঠাটের সৃষ্টি হয়েছে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, নাদ থেকে স্বর, স্বর থেকে সপ্তক এবং সপ্তক থেকে ঠাটের উৎপত্তি হয়েছে। "রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর অর্থাৎ

৮। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)
৯। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ২
১০। প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক–শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

এক সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে শুদ্ধ ও বিকৃতস্বর মিলে ৭ টি স্বরের ক্রমিক রচনাকে ঠাট বলে।"[১১] ঠাট, মেল নামেও অধিক পরিচিতি পেয়েছে। ভারতীয় রাগসংগীতের অসংখ্য রাগরাগিণী এই মেল বা ঠাটকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছে। ঠাটকে রাগের ভিত্তি বলা যায়। উত্তর ভারতের সংগীতে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে ১০টি ঠাটের প্রচার করেছেন। তবে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে ৭২টি ঠাট বা মেল অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পণ্ডিত ভাতখন্ডে উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে বহুকাল গবেষণা করে প্রচলিত ১০টি ঠাটের উদ্ভাবন করেছেন।[১২] উত্তর ভারতীয় ১০ ঠাটের পরিচয় নিম্নরূপ–

১। বিলাবল ঠাট – স র গ ম প ধ ন । সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ হয়।

২। কল্যাণ ঠাট – স র গ ক্ষ প ধ ন। শুধু মধ্যম স্বরটি তীব্র বা কড়ি।

৩। ভৈরব ঠাট – স ঋ গ ম প দ ন। ঋষভ ও ধৈবত স্বর দুটি কোমল ব্যবহৃত হয়।

৪। পূরবী ঠাট – স ঋ গ ক্ষ প দ ন। ঋষভ ও ধৈবত স্বর দুটি কোমল এবং মধ্যম স্বরটি তীব্র ব্যবহৃত হয়।

৫। মারবা – স ঋ গ ক্ষ প ধ ন। ঋষভ স্বরটি কোমল এবং মধ্যম স্বরটি তীব্র ব্যবহৃত হয়।

৬। টোড়ী ঠাট – স ঋ জ্ঞ ক্ষ প দ ন। ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত স্বর কোমল এবং মধ্যম স্বরটি তীব্র ব্যবহৃত হয়।

৭। খাম্বাজ ঠাট – স র গ ম প ধ ণ। শুধু নিষাদ স্বরটি কোমল প্রয়োগ করা হয়।

৮। কাফি ঠাট – স র জ্ঞ ম প ধ ণ। গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটি কোমল বাকি সব শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

৯। আসাবরী ঠাট – স র জ্ঞ ম প দ ণ। গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ স্বর কোমল বাকি সব শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

১০। ভৈরবী ঠাট – স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ স্বর কোমল বাকি সব শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

এই হলো উত্তর ভারতীয় ১০ ঠাটের নাম ও স্বর পরিচিতি। তবে শাস্ত্র মতে, ঠাট রচনার ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম মানা আবশ্যক। এই নিয়মগুলো রাগের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বেশ পরিচিত। যে নিয়ম মেনে ঠাট রচনা করা হয় সেগুলো হলো–

১১। পংকজ কান্তি সরকার, *রাগ সঙ্গীত সাধনা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯), পৃ. ২৮

১২। শম্ভুনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"ক) ঠাট রচনায় সবসময় ৭ টি স্বর থাকতে হবে। এর কম বা বেশী হবে না।

খ) ঠাটের স্বর গুলো ক্রমানুসারে হবে– সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না।

গ) ঠাটে শুধু আরোহী হয়। অবরোহী থাকে না।

ঘ) বিশেষ বিশেষ রাগের নামানুসারে ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে।

ঙ) কোন স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত উভয় রূপ কোন ঠাটে একসঙ্গে ব্যবহৃত হবে না।

চ) ঠাট গাওয়া বা বাজানো যায় না।

ছ) ঠাটের রঞ্জকতার প্রয়োজন নেই। এর উদ্দেশ্য কেবল রাগ সৃষ্টি করা।

জ) ঠাট গাওয়া বা বাজানো যায় না বলে এতে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, পকড়, আলাপ, তান, বোলতান, সরগম, অঙ্গ, সময় প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োজন নেই।

ঝ) ঠাটের সংখ্যা ১০টি এবং এই ১০ ঠাট থেকেই সমস্ত রাগের উৎপত্তি হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় দশ ঠাট দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে স্বর বা কাঠামো একই। যেমন–

১। বিলাবল ঠাট – ধীরশঙ্করাভরণ মেল	২। কল্যাণ ঠাট – মেচকল্যাণী মেল
৩। খাম্বাজ ঠাট – হরিকাম্ভোজী মেল	৪। কাফি ঠাট – খরহরপ্রিয় মেল
৫। আসাবরী ঠাট – নট ভৈরবী মেল	৬। মারবা ঠাট – গমনশ্রীয় মেল
৭। ভৈরব ঠাট – মায়ামালব গৌল মেল	৮। ভৈরবী ঠাট – হনুমন্ত টৌড়ী মেল
৯। পূরবী ঠাট – কামবর্ধিনী মেল	১০। টোড়ী ঠাট – শুভপন্তুবরালী মেল।"[১৩]

১.১.২ ভারতীয় সংগীতে রাগ

রাগ হলো স্বরসমষ্টি দ্বারা ভিন্ন রূপে মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা ভারতীয় সংগীতে রাগের প্রচলন ছিল। ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জকতা বা রস সৃষ্টির মাধ্যমে রাগের বিভিন্ন প্রকার বহুকাল ধরে শ্রোতার মনোরঞ্জন করে আসছে। রাগের রঞ্জকতা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বরের মাধ্যমে। তাই স্বর ও বর্ণের

১৩। পংকজ কান্তি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository

মনোমুগ্ধকারী বা চিত্তাকর্ষক রচনাকে রাগ বলা হয়ে থাকে। 'রাগ' শব্দটি ছোট হলেও এর অধিক গুরুত্ব রয়েছে হিন্দুস্থানি সংগীতে। সাধারণত শ্রোতার মনোরঞ্জনে সক্ষম এমন কোন শ্রোতব্য বিষয়কে রাগ বলে অভিহিত করা হয়। তবে রাগের যথাযথ পরিচয় দিতে গিয়ে মোবারক হোসেন খান বলেছেন– "স্বরসমষ্টি দ্বারা গঠিত মনোরঞ্জনকারী এবং আরোহী ও অবরোহীর একটি বিশিষ্ট নিয়মপদ্ধতি রক্ষাকারী রসালো রচনাকে রাগ বলে।"[১৪] তবে রাগের এই পরিচয় যথার্থ রূপে প্রকাশিত হবে রাগ গায়নকালে। কারণ রাগের সৌন্দর্য নির্ভর করে এর প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য বা গায়নপদ্ধতির উপর। রাগের পরিচয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগীতগুণী ও সংগীতশাস্ত্র রচয়িতাগণ তাঁদের মতামত দিয়েছেন। রাগের পরিচয় প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বিশ্বাস বলেছেন– "নির্দিষ্ট সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বর সমষ্টি যা নির্দিষ্ট স্বরের প্রাধান্য ও স্বর সমূহের ক্রমপর্যায়িক ভিত্তিতে গঠিত এবং যাকে অন্য সুর সমন্বয় থেকে পৃথকীকরণ করা যায়, সেই স্বর সমষ্টিই রাগ নামে খ্যাত।"[১৫] *'রাগসংগীত সাধনা'* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, "ঠাট হতে রাগের উৎপত্তি। আরোহী-অবরোহী, আলাপ-বিস্তার, মীড়, মূর্ছনা, গমক ও তানাদি সম্বলিত মনোরঞ্জক ধ্বনিকে রাগ বলে।"[১৬] রাগ এবং গানের বাণী বা কাব্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কারণ রাগের প্রকৃত সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে রাগ গায়নের মাধ্যমে। আর রাগ গায়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বাণীর। উপযুক্ত কথাটি বলা হয়েছে এই কারণে যে, রাগের প্রকৃতি অনুযায়ী গানের বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যদি দীপক রাগে বিরহের কবিতা সংযোজিত হয় অথবা শিবরঞ্জনী রাগে বীরত্বসূচক বাণীর প্রয়োগ হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই রাগ তার স্বতন্ত্রতা হারাবে। রাগের প্রকৃত রাগরূপ তখনই ফুটে উঠবে যখন স্বরের সাথে গানের বাণীর সঠিক সংমিশ্রণ ঘটবে। প্রাচীনকাল হতেই ভারতীয় রাগসমূহ গাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধারার গায়নরীতির প্রচলন রয়েছে। এদের মধ্যে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা, সাদরা, চৈতী, কাজরী, গজল, ভজন, হোরী, তারানা ইত্যাদি গায়নরীতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন এই গীতিধারা গুলো থেকে পরবর্তীকালে রাগসংগীতের প্রধান এবং জনপ্রিয় ৪টি ধারার প্রচলন অধিক দেখা যায়। ধারা চারটি হলো– ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী। তবে টপ্পা ও ঠুমরী গানকে সরাসরি শাস্ত্রীয় সংগীতের আওতাভুক্ত না করে উপশাস্ত্রীয় সংগীতের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। যদিও প্রতিটি গায়নরীতিরই নিজস্বতা রয়েছে। রাগ ব্যতীত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা গাওয়া যায় না, আবার এগুলো ছাড়া রাগের রঞ্জকতা প্রকাশ কঠিন হয়ে যায়। উক্ত চারটি গায়নপদ্ধতি রাগসংগীতের প্রকারভেদ রূপেও গণ্য হতে পারে। এই চারটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪। মোবারক হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৫। মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা* (কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৩৮৩

১৬। পংকজ কান্তি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১.২ রাগের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংগীতের সুবিশাল ও বিস্তৃত পরিধির অবস্থান শক্তিশালী রাখতে রাগের ভূমিকা অন্যতম। শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে বিভিন্ন প্রকার রাগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে বহু সংগীতগুণী এই রাগগুলোর নানারূপ শ্রেণিকরণ করেছেন। এই শ্রেণিকরণ রাগের জাতি, গায়নকাল, ঋতু, অঙ্গ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে করা হয়ে থাকে। রাগের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা করা হলো–

রাগের আরোহী ও অবরোহীতে যতগুলো স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের (স্বরের) সংখ্যার উপর ভিত্তি করে রাগের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে জাতি বলে। জাতি প্রধানত তিন প্রকার। যেমন– ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতি। কোন রাগের আরোহী-অবরোহীতে ৫টি করে স্বরের প্রয়োগ হলে তাকে ঔড়ব জাতির রাগ বলা হয়। আবার ৬টি স্বর ব্যবহৃত হলে ষাড়ব জাতির রাগ এবং ৭টি স্বরের প্রয়োগ হলে তাকে বলে সম্পূর্ণ জাতির রাগ। প্রত্যেকটি রাগেই যে সমান সংখ্যক স্বরের ব্যবহার হবে তা নয়। রাগের গঠনপ্রণালী অনুযায়ী স্বর সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে তবে তা ৫টির কম এবং ৭টির বেশি হবে না। ভারতীয় সংগীতে রাগের উৎপত্তি হয়েছে ঠাট থেকে আর ঠাটের সৃষ্টি হয়েছে স্বর থেকে। রাগ সৃষ্টিতে মূল উপাদান স্বর। ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতে সর্বমোট ১২ টি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। এর মধ্যে শুদ্ধ স্বরের সংখ্যা ৭ টি এবং বাকি ৫টি স্বরকে বিকৃত স্বর বলা হয়ে থাকে। জাতি দ্বারা রাগে প্রয়োগকৃত স্বর সংখ্যার নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার এভাবেও বলা যায় যে, "কোন রাগের আরোহ ও অবরোহতে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যা দ্বরা ঐ রাগের জাতি নির্ধারণ করা হয়।"[১৭] তিন প্রকার জাতিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

আরোহে ব্যবহৃত স্বর	**অবরোহে ব্যবহৃত স্বর**	**সৃষ্ট জাতি**
৭টি স্বর	৭টি স্বর	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
৬টি স্বর	৭টি স্বর	ষাড়ব-সম্পূর্ণ
৫টি স্বর	৭টি স্বর	ঔড়ব-সম্পূর্ণ
৫টি স্বর	৫টি স্বর	ঔড়ব-ঔড়ব

১৭। মোবারক হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬টি স্বর	৫টি স্বর	ষাড়ব-ঔড়ব
৭টি স্বর	৫টি স্বর	সম্পূর্ণ-ঔড়ব
৬টি স্বর	৬টি স্বর	ষাড়ব-ষাড়ব
৭ টি স্বর	৬টি স্বর	সম্পূর্ণ-ষাড়ব
৫টি স্বর	৬টি স্বর	ঔড়ব-ষাড়ব

উক্ত পদ্ধতিতে মোট ৯ প্রকার জাতি পাওয়া যায়। ভারতীয় রাগসমূহ তাদের স্বরবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে উক্ত ৯টি জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে এই পদ্ধতিতে রাগের শ্রেণিবিন্যাস করা হতো। তবে তৎকালীন সংগীতজ্ঞগণ রাগের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উক্ত পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। রাগের মৌলিকত্ব বা শুদ্ধতার উপর ভিত্তি করে রাগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালঙ্ক ও সংকীর্ণ প্রকৃতির রাগ বিশেষ। এখানে শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ বলতে, যে রাগ অন্য কোন রাগের মিশ্রণে গঠিত নয় অর্থাৎ জনক ঠাটের স্বর দ্বারা গঠিত হয়েছে এরূপ রাগকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নিজ নামের ঠাট হতে সৃষ্ট রাগ বা ঠাটবাচক প্রতিটি রাগই শুদ্ধ রাগ। যেমন– বিলাবল, ভৈরব, ইমন, পূরবী বা পূর্বী ইত্যাদি। রাগের ১০টি লক্ষণ মেনে (গ্রহ, ন্যাস, অংশ, অপন্যাস, ঔড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব, মন্দ্র ও তার) শুদ্ধরাগ পরিবেশিত হতো। অপরদিকে দুটি রাগের সংমিশ্রণে কোন রাগের সৃষ্টি হলে বা মূল রাগের সাথে অন্য একটি রাগের ছায়া থাকলে তাকে ছায়ালগ বা সালঙ্ক শ্রেণির রাগ বলা হয়ে থাকে। যেমন– নট-ভৈরব, নট-মালহার, বাগেশ্রী, ভীমপলশ্রী, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি। দুই এর অধিক সংখ্যক রাগের সমন্বয়ে যে রাগের উৎপত্তি ঘটে তাকে সংকীর্ণ বা মিশ্র প্রকৃতির রাগ বলা হয়। যেমন–পিলু রাগ। শ্রেণিবিন্যাসের এই প্রকারটি রাগের রূপ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। প্রাচীনকালে রাগের এরকম শ্রেণিবিভাগ করা হতো।[১৮]

রাগের গায়নকাল বা সময়ের উপর ভিত্তি করেও রাগের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। রাগের সময় নির্ধারণ করা হয় প্রহর অনুযায়ী। ১ দিন= ২৪ ঘন্টা আর ২৪ ঘন্টায় ৮ প্রহর গণনা করা হয়। অর্থাৎ প্রতি ৩ ঘন্টায় এক প্রহর হয়। "পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে প্রহর অনুযায়ী ভারতীয় রাগরাগিণীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– দিবাগেয়, ঊষাগেয় ও সান্ধ্যগেয় বা সন্ধ্যাগেয় রাগ।"[১৯] যে রাগসমূহ ভোর বেলা অর্থাৎ সূর্য ওঠার পূর্ববর্তী সময়ে

১৮। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত

১৯। ফয়সাল আহমেদ, *সঙ্গীত–রাগ উপকরণ*, *নিউজজি২৪ডটকম*, ২ *ফেব্রুয়ারি*, ২০১৭

গাওয়া হয় তাকে ঊষাগেয় রাগ বলা হয়। সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে রাগগুলো গাওয়া হয় তাকে দিবাগেয় এবং সূর্যাস্তের পর যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তাকে সন্ধ্যাগেয় রাগ বলে। এছাড়াও মধ্যযুগের অনেক সংগীতজ্ঞ দিবারাত্রির প্রহর বা সময় অনুযায়ী রাগসমূহের শ্রেণিবিভাগ নিরূপণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রামামাত্য, পণ্ডিত শুভঙ্কর, পণ্ডিত দামোদর, পণ্ডিত অহোবল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

"পণ্ডিত রামামাত্য তাঁর রচিত '*স্বরমেল-কলানিধি*' (১৫৫০ খৃঃ) গ্রন্থে সময় অনুযায়ী রাগের যে শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ–

১ম যাম বা সকালে গেয় রাগ – গুর্জরী, ললিত বা ললিতা, ধন্যাসী দেশাক্ষী, বৌলিকা (বহুলী), মলহারী, কন্নড়-

বঙ্গাল, বেলাবলী, নারায়ণী, ভূপালী, বসন্ত-ভৈরবী ও সাবেরী ইত্যাদি।

২য় যাম বা দ্বিপ্রহরে গেয় রাগ – শুদ্ধ-রামক্রিয়া।

৩য় যাম বা সায়াহ্ন গেয় রাগ – মালব–গৌল, শ্রী–রাগ।

৪র্থ যাম বা সন্ধ্যা গেয় রাগ – শুদ্ধ-নয়টী, ভৈরবী, কন্নর-গৌল, সামন্ত, আহরী, কেদার গৌল, কাম্ভোজী, মধ্যমাদি,

রীতিগৌল, নাদ-রামক্রিয়া, পাড়ি, রেবাগুপ্তি, হিজ্জুজী ইত্যাদি।

সর্বকাল(যেকোন সময় গেয়) – মুখারী, শুদ্ধ-বরালী, শুদ্ধ-বসন্ত, হিন্দোল, সাম-বরালী, ঘন্টারব, নাগধ্বনি,

সোমরাগ, অন্দোলী, ভিন্নষড়জ ইত্যাদি।

পণ্ডিত দামোদরের '*সংগীত-দর্পণ*' (১৬শ শতাব্দী) গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ সময়ের উপর রাগ গায়নের উল্লেখ রয়েছে। তিনি চার প্রহরে গীত রাগের কথা বলেছেন এবং রাগ গায়ন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলতে পারে বলেছেন।

১ম প্রহরে গেয় রাগ– মধুমাধবী, দেশাখ্য, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সোমগুর্জরী, ধনাশ্রী,

মালবশ্রী, মেঘ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্তক ইত্যাদি।

২য় প্রহরে গেয় রাগ– গুর্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সোরটী ইত্যাদি। ৩য় প্রহরে গেয় রাগ– বৈরাটী, তোড়িকা, কামোদী, কুড়াইকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ ইত্যাদি।

৪র্থ প্রহরে গেয় রাগ– শ্রী, মালব, গৌরী, ত্রিবর্ণ, নট্রকল্যাণ, সারঙ্গ, নট্রক, নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভীরিকা, বড়হংস, পাহাড়ী।

দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত গ্রন্থকার পণ্ডিত অহোবলের '*সংগীত পারিজাত*' (১৬শ–১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থের শ্রেণিকরণ নিম্নরূপ–

প্রাতর্গেয় বা ১ম প্রহরে গেয় রাগ– ধন্যাশ্রী, মালবশ্রী, রক্তহংস, বসন্ত, দেশাখ্য, দেশকারী, ভূপালী, প্রসভ, মধ্যমাদি, কোল্লহাস, বঙ্গালী, ভৈরব, নারায়ণী, বিভাস।

১ম প্রহরোত্তর বা ২য় প্রহরে গেয় রাগ– গুর্জরী, রেবাগুপ্তি, কৌমারী, কজ্জলী বা কাজ্‌রী, শঙ্করাভরণ, সোরঠী, রামকৃং বা রামকৃতি, নাদ-রামক্রিয়া, বেলাবলী, কুড়ায়িকা, গুণকরী, জয়শ্রী, শিববল্লভা।

২য় প্রহরোত্তর বা ৩য় প্রহরে গেয় রাগ– হংস, দীপক, কম্ভোদী, কঙ্কণ, সারঙ্গ, দেবগান্ধার, দেবগিরি, ঐরাবত, রত্নাবলী, আসাবরী, হিন্দোল, মনোহর, বৈজয়ন্তী, বরাটী ইত্যাদি।

৩য় প্রহরোত্তর বা ৪র্থ প্রহরে গেয় রাগ– ঘন্টা, ঢক্ক, শ্রী, কোকিল, সৌদামিনী, কুরঙ্গ, ত্রিবেণী, সুরালয়, পূর্বী, বিহাগড়, পাহাড়ী, চক্রধর, কল্যাণী-বরালী, মঞ্জুভাষ, সিংহরব, পটমঞ্জরী, গৌল সমূহ, নট সমূহ, কল্পতরু।

সর্বকালীন গেয় রাগ– সৈন্ধব, মেঘ, মল্লারী, দেশী, পঞ্চম, নীলাম্বরী, মুখারী, ভৈরবী, ললিত, মেঘনাদ, মঙ্গলকোশক, গৌন্ড, মল্লার, আনন্দভৈরবী, শঙ্করানন্দ, মানবী, রাজধানী, শর্বরী, সাবেরী।

পরবর্তীকালে, ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে ঘরানা ভিত্তিক সংগীত যুগের সূচনা ঘটে উত্তর ভারতীয় সংগীতে। এই সময় তানসেন পরম্পরা বা সেনীয়া ঘরানার সংগীতজ্ঞরা সূর্যোদয় থেকে ৮টি প্রহর গণনা করতেন। যদিও স্থান অনুযায়ী সূর্যোদয়ের সময় ভিন্ন। নিম্নে রামপুর সেনীয়া পরম্পরা বা ঘরানায় ৮ প্রহরের রাগের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

১ম প্রহরে (ভোর ৪টা-৭টা) – বসন্ত, পরজ, সোহিনী, পঞ্চম, ভংখার, ভাটিয়ার, বিভাস, ললিত, ভৈরব, রামকেলী, গুণকেলী, যোগীয়া, কালিংড়া, প্রভাত, মেঘরঞ্জনী ইত্যাদি।

২য় প্রহর (সকাল ৭টা–১০টা) – হিন্দোল, মালশ্রী, গৌড়সারং এবং বিলাবল, আলাহিয়া বিলাবল, ইমন বিলাবল, কুকুভ বিলাবল, দেশকার, ভিন্ন ষড়জ, হংসধ্বনি ইত্যাদি।

৩য় প্রহর (সকাল ১০টা–দুপুর ১টা) – ভৈরবী, আসাবরী, জৌনপুরী, দেশী, খট, টোড়ী, সারং, সুহা, সুঘরাই ইত্যাদি।

৪র্থ প্রহর(দুপুর ১টা–বিকাল ৪টা) – পিলু, ভীমপলশ্রী, ধানী, ধনাশ্রী, পটমঞ্জরী, পটদীপ্‌কী, হংসকঙ্কনী, মূলতানী ইত্যাদি।

৫ম প্রহর (বিকাল ৪টা–সন্ধ্যা ৭টা) – পুরিয়া, মারবা, শ্রী, ধনাশ্রী, টঙ্ক, মালিগৌরা, সাজগিরি, পূর্বী, গৌরী, মালবী, বরাড়ী, জয়েৎশ্রী, রেবা, ত্রিবনী ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ প্রহর (সন্ধ্যা ৭টা– রাত ১০টা) – ইমন, শুদ্ধকল্যাণ, ভূপালী, জয়েৎ-কল্যাণ, কেদার, কামোদ, ছায়ানট, হাম্বীর, শ্যাম, বিহাগ বা বেহাগ, হেমকল্যাণ, নট, মালুহা, শঙ্করা, দূর্গা, শঙ্করাভরণ ইত্যাদি।

৭ম প্রহর (রাত ১০টা– ১টা) – জয়জয়ন্তী, কাফি, সিন্ধুড়া, বাগেশ্রী, বাহার, খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, খাম্বাবতী, তিলং, রাগেশ্রী, তিলককামোদ, গারা, দেশ, সোরট ইত্যাদি।

৮ম প্রহর (রাত ১টা–ভোর ৪টা) – মালকোষ, আড়ানা, নায়কী কানাড়া, দরবারী কানাড়া, কৌশিক কানাড়া ইত্যাদি।"[২০]

উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়াও স্বরের প্রয়োগ ও সময়ের উপর ভিত্তি করে রাগের আরও দুই প্রকার শ্রেণিকরণ হয়ে থাকে যার রাগের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এই দুই প্রকারের একটি হলো সন্ধিপ্রকাশ রাগ এবং অন্যটি পরমেল–প্রবেশক রাগ।

১.২.১ সন্ধিপ্রকাশ রাগ

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। অর্থাৎ, যে রাগগুলো দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে গাওয়া হয়ে থাকে তাদের সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। দিনরাত্রির মিলনকাল বলতে দিনের শুরু রাতের শেষ বা রাতের শেষ ও দিনের শুরুর সময়কে বোঝানো হয়ে থাকে। দিনরাত্রির এই সন্ধিক্ষণ প্রতিদিন দুই বার আসে। সন্ধিপ্রকাশের এই সময়কাল প্রাতঃকালীন বা ঊষাকালীন এবং সান্ধ্যকালীন বা গোধূলি নামে পরিচিত। সংগীত বিশারদগণ প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন ভোর ৪টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত। এই সময় যে রাগ গাওয়া হয়ে থাকে তাকে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগের বৈশিষ্ট্য হলো– রাগে ঋষভ ও ধৈবত স্বর কোমল এবং গান্ধার ও মধ্যম স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ হবে। এই সময়ের রাগে ঋষভ বর্জিত হবে না। যেমন– ভৈরব। অন্যদিকে সান্ধ্যকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত

২০। ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ, *ভারতীয় রাগ- রাগিণীর ক্রমবিবর্তন* (কলকাতাঃ আশিস পাবলিকেশনস্, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৭-৫০

সময়কালকে। এই সময়ে গীত রাগগুলোকে বলা হয় গোধূলিলগ্নের বা সান্ধ্যকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। এই সময়ের রাগের বৈশিষ্ট্য হলো– তীব্র মধ্যম (ক্ষ) স্বরটির প্রয়োগ। যেমন– মারবা বা মারওয়া, পুরিয়া, ললিত ইত্যাদি।[২১]

১.২.২ পরমেল–প্রবেশক রাগ

পর অর্থ অন্য, মেল অর্থ ঠাট এবং প্রবেশ অর্থ এক স্থান থেকে অন্য কোন স্থানে গমন করা। পরমেল–প্রবেশক হলো এক মেল থেকে অন্য মেলে প্রবেশ করা। শাস্ত্রমতে, "সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঠাটের পরিবর্তন করে সময়ানুসারে ঠাটের তথা রাগে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়। তাই একটি ঠাট থেকে পরবর্তী ঠাটে প্রবেশের জন্য পরবর্তী ঠাটের ইঙ্গিতবহ যে রাগ পরিবেশন করা হয়, সেই বিশেষ রাগটিকে পরমেল- প্রবেশক রাগ বলা হয়।"[২২] যে রাগগুলো একটি মেল বা ঠাট থেকে অন্য একটি ঠাট বা মেলে প্রবেশ করে ঐ ঠাটের পরিচয় বহনকারী স্বরের প্রয়োগ করে গীত হয় তাকে পরমেল–প্রবেশক রাগ বলে। যেমনঃ জয়জয়ন্তী। খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত বেশ জনপ্রিয় একটি রাগ জয়জয়ন্তী। খাম্বাজের পরিচয় বা ইঙ্গিত বহনকারী স্বর হলো কোমল নিষাদ বা 'ণ'। এই ঠাটের অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়। জয়জয়ন্তী রাগে শুদ্ধ ও কোমল উভয় গান্ধার ব্যবহৃত হয়। উভয় গান্ধারের প্রয়োগে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ যুক্ত কাফি ঠাটাশ্রিত রাগ গাওয়ার সুযোগ করে দেয় বলে জয়জয়ন্তী রাগটিকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ঠাটে তথা রাগে প্রবেশ করা হয়। রাগের উক্ত দুই প্রকারের শ্রেণিকরণ ভারতীয় রাগসংগীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।[২৩]

রাগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাগের অঙ্গ বিশেষ অবদান রাখে। ভারতীয় রাগসংগীতে রাগের অঙ্গ দুইটি। একটি পূর্বাঙ্গ অপরটি উত্তরাঙ্গ। অঙ্গের উপর ভিত্তি করে রাগকে আলাদাভাবে সনাক্ত করার রীতিও রাগের শ্রেণিবিভাগের আওতাভুক্ত। শ্রেণিবিন্যাসের এই পর্যায়ে রাগের অঙ্গ নির্ধারণ হয় বাদীস্বরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। একটি সপ্তকের স্বরগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করে অঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। মধ্য সপ্তকের 'সা' থেকে তার সপ্তকের 'র্সা' পর্যন্ত মোট ৮টি স্বরকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হলে প্রথম ৪টি স্বর– 'সা রা গা মা' হবে পূর্বাঙ্গের স্বর এবং পরবর্তী 'পা ধা না র্সা' স্বরগুলো হবে উত্তরাঙ্গের। অর্থাৎ কোন রাগের বাদীস্বর যদি 'সা' থেকে 'মা' এর মধ্যে হয় তাহলে ঐ রাগটিকে পূর্বাঙ্গ প্রধান বা পূর্বাঙ্গ বাদী রাগ বলা হবে এবং কোন রাগের বাদীস্বর যদি 'পা' থেকে 'র্সা' এর মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে তাকে উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ বলে অভিহিত করা হবে। রাগটি যে অঙ্গের হবে সেই

২১। শম্ভুনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত
২২। মোবারক হোসেন খান, *গীতমঞ্জরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ. ৩২
২৩। মানসী মজুমদার, *প্রসঙ্গ: রাগসংগীত* (কলকাতা: আশাদীপ, ২০১৫)

অঙ্গেই রাগের স্বর-বিস্তার ও তানের কাজ অধিক হয়ে থাকে। তবে অঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংগীতগুণীদের ভিন্ন মতামতও রয়েছে। অনেকের মতে সপ্তকের 'সা' থেকে 'পা' পর্যন্ত পূর্বাঙ্গ এবং 'মা' থেকে 'র্সা' পর্যন্ত সপ্তকের উত্তরাঙ্গ। ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে কিছু রাগে মধ্যম বাদী হলেও উত্তরাঙ্গের রাগ বলে বিবেচিত হয়। আবার কিছু রাগে পঞ্চম স্বর বাদী হলেও ঐ রাগটিকে পূর্বাঙ্গের রাগ হিসাবে মানা হয়ে থাকে। ভারতীয় রাগসংগীতের অসংখ্য রাগরাগিণীর মধ্যে প্রতিটি রাগকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে রাগের শ্রেণিবিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে উপযুক্ত সময়ে সঠিক রাগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং পরিবেশন করাও সহজ হয়। যদি এমনটা (রাগের শ্রেণিবিভাগ) করা না হতো তাহলে সকালের রাগ সন্ধ্যায় গাওয়া হলে বা দুপুরের রাগ রাতে পরিবেশিত হলে রাগের সঠিক রস সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না এবং শ্রোতার মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হতো। সেক্ষেত্রে হয়তো রাগসংগীত সমাদৃত না হয়ে অবহেলিত হতো।

"প্রাচীনকালে রাগের ১০টি লক্ষণ মানা হতো যা রাগের বৈশিষ্ট্য হিসাবেও গণ্য হতো। এই লক্ষণগুলো হলো– গ্রহ, ন্যাস, অংশ, অপন্যাস, ঔড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব, মন্দ্র ও তার। মুনি ভরত এই ১০টি লক্ষণকে রাগের দশবিধি বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[২৪] এই লক্ষণগুলো কোন রাগে বিদ্যমান থাকা মানে ঐ রাগের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। রাগের প্রাচীন এই লক্ষণগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

"গ্রহ ঃ রাগের ক্ষেত্রে 'গ্রহ' একটি স্বরকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, রাগ গায়নের ক্ষেত্রে যে স্বর থেকে কোন রাগ গাওয়া আরম্ভ করা হয় ঐ স্বরকে গ্রহস্বর বলে।

অংশ ঃ একই স্বর বারবার কোন রাগে ব্যবহৃত হলে তাকে অংশস্বর বলা হয়। অংশস্বর রাগের প্রাণস্বরূপ। তাই এরূপ স্বরকে জীবস্বরও বলা হয়ে থাকে।

ন্যাস ঃ ন্যাস অর্থ বিশ্রাম বা শেষ। তাই কোন রাগের সমাপ্তি যে স্বরে ঘটে বা যে স্বরে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয় বা দাঁড়ানো হয় সেই স্বরকে ন্যাসস্বর বলে। একটি রাগে একাধিক ন্যাসস্বর থাকতে পারে। ন্যাসস্বরে রাগের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।

অপন্যাস ঃ অপন্যাস বলতে এমন স্বরকে নির্দেশ করা হয় যে স্বরে এসে রাগের একটি অংশের সমাপ্তি ঘটে।

মন্দ্র ঃ মন্দ্র অর্থ সর্বনিম্ন বা নিচু। কোন রাগের স্বর প্রয়োগে সর্বনিম্ন সীমারেখাকে মন্দ্র বলে।

তার ঃ তার অর্থ উচ্চ। তার শব্দের দ্বারা কোন রাগে স্বর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সপ্তকের সর্বোচ্চ স্বরের সীমাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

২৪। মীনাক্ষী বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

অল্পত্ব ঃ রাগ গায়নে কোন স্বরের বর্জন অথবা হালকা বা লঘু প্রয়োগ কে বুঝায়। অল্পত্ব ২ প্রকার। যথা: অনভ্যাস ও লঙ্ঘন। কোন রাগে যে স্বর অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হয় তাকে অনভ্যাস বলা হয়। অন্যদিকে যে স্বর কখনোই ব্যবহৃত হয় না তাকে বলা হয় লঙ্ঘন।

বহুত্ব ঃ বহুত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ অধিক্য বা প্রচুর্য। রাগের স্বর স্থাপনের ক্ষেত্রে বহুত্বও দুই প্রকার। একটি অভ্যাসমূলক অপরটি অলঙ্ঘনমূলক। রাগের আরোহণ ও অবরোহণে কোন স্বরের বারবার উচ্চারিত হয়ে থাকলে তাকে অভ্যাস বলা হয়। আবার কোন স্বরের প্রাধান্য না দিয়ে বা আরোহণ ও অবরোহণে একটি স্বরকে স্পর্শ করে পরবর্তী স্বরে যাওয়া বা কোন স্বর প্রায় বিলুপ্তির পথে এরূপ বুঝানোকে অলঙ্ঘন বলে।

ঔড়বত্ব ঃ রাগের আরোহী-অবরোহীতে অবশ্যই কমপক্ষে পাঁচটি করে স্বর থাকতে হবে। তা না হলে রাগের গঠনের শর্ত পূর্ণ হবে না।

ষাড়বত্ব ঃ একটি রাগের আরোহী-অবরোহীতে অবশ্যই কমপক্ষে ছয়টি করে স্বর থাকতে হবে।"[২৫]

প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রকারগণ রাগ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য রাগের উক্ত লক্ষণগুলো নির্দেশ করেছিলেন। তবে বর্তমানকালে রাগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় সংগীতের অসংখ্য রাগরাগিণীর মধ্যে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার জন্য কতগুলো নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য মানা হয়। রাগের সে বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। যেহেতু ঠাট হতে রাগের সৃষ্টি তাই প্রতিটি রাগ সৃষ্টির জন্য কোন একটি ঠাট থেকে স্বর নিতে হবে। গঠিত রাগে যে সকল স্বর প্রয়োগ করা হবে তা অবশ্যই উক্ত ঠাটের কাঠামো অনুসরণ করে চলবে। যেমন: ভৈরব, কালিংড়া, যোগিয়া, রামকেলী, আনন্দ–ভৈরব, আহির–ভৈরব, বাঙ্গাল–ভৈরব প্রভৃতি রাগগুলো ভৈরব ঠাটের অবয়ব বা কাঠামোকে মেনে চলে।

২। একটি পূর্ণাঙ্গ রাগের আরোহ-অবরোহে অবশ্যই কমপক্ষে পাঁচটি করে স্বর থাকতে হবে এবং সর্বোচ্চ সাতটি স্বর থাকবে। এর কম হলে রাগ গঠনের শর্ত পূরণ হবে না এবং রাগ হিসাবে আখ্যায়িত হবে না।

৩। একটি রাগ চিহ্নিত করার জন্য রাগে আরোহী এবং অবরোহী থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা শুধু আরোহী দ্বারা ঠাট চেনা যায়, রাগ চেনা যায় না।

৪। রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের চলন সরল এবং বক্র উভয় হতে পারে।

২৫। মোবারক হোসেন খান, *গীতমঞ্জরী*, পৃ. ৩২

৫। একটি রাগের রঞ্জকতা প্রকাশের জন্য যেসব গীতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাকে রাগসংগীত বলা হয়। যেমন– ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি।

৬। রাগের রঞ্জকতা গুণ থাকতে হবে। তা না হলে শ্রোতাবৃন্দের মনোরঞ্জন করতে ব্যর্থ হবে।

৭। রাগের প্রকৃতি অনুযায়ী এদের গায়নকাল নির্ধারিত থাকে। দিবারাত্রির নির্দিষ্ট সময়ে রাগ গায়নের নিয়ম রয়েছে।

৮। রাগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – ষড়জ বা 'সা' স্বরটি কোন রাগেই বর্জন করা যাবে না।

৯। একটি রাগের আরোহী-অবরোহীতে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঐ রাগের জাতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জাতি প্রধানত তিন প্রকার। যথা- ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ।

১০। একটি রাগের সঠিক পরিচয় প্রকাশ পাবে এরকম নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস থাকবে। রাগের এরূপ স্বরবিন্যাসকে "পকড়"[২৬] বলা হয় যা সহজেই রাগটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

১১। রাগ রচনায় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন রাগে একই সাথে মধ্যম ও পঞ্চম স্বর বর্জন করা না হয়। যদি এরূপ হয় তাহলে সে স্বরবিন্যাস রাগ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

১২। রাগের একটি বিশেষ নিয়ম হলো – কোন রাগের স্বরবিন্যাসে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত উভয় প্রকার রূপ পাশাপাশি ব্যবহৃত হবে না। যেমন– ঋ র, জ্ঞ গ, ম ক্ষ, দ ধ, ন ণ ইত্যাদি। তবে বর্তমানে অনেক সংগীতগুণী একই রাগে একটি স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ললিত রাগের কথা বলা যেতে পারে। ললিত রাগে শুদ্ধ ও তীর্ব মধ্যম একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়।

১৩। প্রতিটি রাগে একটি বিশেষ রসের অভিব্যক্তি থাকবে। যেমন – শৃঙ্গার-রস, করুণ-রস, শান্ত-রস, বীর-রস ইত্যাদি।

১৪। প্রতিটি রাগের একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতি থাকবে। একটি রাগ থেকে আরেকটি রাগের প্রকৃতি ভিন্ন হবে।

১৫। প্রতিটি রাগের একটি অঙ্গ অবশ্যই থাকবে। অঙ্গ দুই প্রকার; পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ। একটি রাগের বাদীস্বরের উপর ভিত্তি করে ঐ রাগের অঙ্গ নির্ধারণ করা হয়।

২৬। পকড় – কতগুলো রাগবাচক স্বর যার দ্বারা কোন রাগের রূপটি প্রকাশ পায়।

১৬। রাগে আলাপ থাকবে যার দ্বারা রাগরূপ প্রকাশ পাবে।

১৭। রাগে সরগম, তান, বোলতান, বাট, বিস্তার থাকবে যা রাগের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।

১৮। রাগ নির্ণয়ে বা রাগের পরিচয় বহনকারী ১০টি লক্ষণ (গ্রহ, অংশ, ন্যাস, মন্দ্র, তার, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব, ঔড়বত্ব) অবশ্যই থাকতে হবে।

১৯। রাগে বিশেষ কতগুলো স্বরের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী ও বর্জিত স্বরের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কোন রাগে যে স্বরের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি হয় তাকে বাদী স্বর বলে। বাদী স্বর অপেক্ষা যে স্বর কম ব্যবহৃত হয় তাকে সমবাদী স্বর বলে। আবার বাদী ও সমবাদী স্বর ব্যতীত অন্যান্য স্বরসমূহকে অনুবাদী এবং যে স্বরটি কোন রাগে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃত হয় না তাকে বিবাদী স্বর বলা হয়। আর যে স্বরের প্রয়োগ রাগে নিষিদ্ধ তাকে বর্জিত স্বর বলে।[২৭]

বর্তমানকালে রাগের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশে উল্লিখিত লক্ষণগুলো বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই লক্ষণগুলো মেনে রাগ পরিবেশন করা হলে রাগ গঠনের শর্তপূরণ হবে। এর ব্যতিক্রম হলে রাগ তার রঞ্জকতাগুণ হারাতে পারে এবং রাগের নিয়ম বহির্ভূত দোষে দোষী হতে পারে।

২৭। মোবারক হোসেন খান, *গীতমঞ্জরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঠুমরী গানের উৎপত্তির ইতিহাস

ঠুমরী গানের উৎপত্তির ইতিহাস

সৃষ্টির শুরু থেকে সংগীতের সাথে মানুষের একটি আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ধারণা করা হয় মানুষের কণ্ঠে ভাষা সৃষ্টির সাথে সাথে সংগীতেরও জন্ম হয়। যদিও শুরুতেই সংগীত তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেনি। আদিম যুগে মানুষ পশু-পাখিদের আওয়াজ কণ্ঠে ধারণ করতো। সংগীত সৃষ্টির পর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ আধুনিকতার ছোঁয়া অনুভব করার ফলে তাদের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হতে থাকে। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সংগীতও তার প্রাচীন রূপ পরিবর্তন করে নতুন সৃষ্টি-সম্ভারে পরিপূর্ণ হতে শুরু করে। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা যেমন কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে নতুনত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে তেমনি ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতও ক্রমবিকাশের ধারার গতিকে সচল রেখে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালে এসে পৌঁছেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতের ক্রমবিকাশের ধারাকে পাঁচটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু-সভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ, বৈদিকোত্তর যুগ, মধ্যযুগ ও বর্তমান বা আধুনিক যুগ। ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত বলতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই বুঝায়। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। উল্লিখিত ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতের ক্রমবিকাশের যুগগুলোর মধ্যে একের পর এক সংগীতের নানা বিষয় সৃষ্টিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যেমন– বৈদিকযুগের তিন স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এর উদ্ভাবন ঘটে যার মধ্যে পরবর্তী সাত স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর একের পর এক জাতি, রাগরাগিণী, তান, মূর্ছনা, অলংকার, শ্রুতি, গ্রাম, ধাতু ইত্যাদি সংগীতের নানা বিষয়ের আবিষ্কার ঘটে বিভিন্ন সময়ে।[২৮] ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অনেক ধারার মধ্যে প্রধান প্রধান চারটি ধারা হলো- ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী। মধ্যযুগে উচ্চাঙ্গের এই সংগীত ধারাগুলোর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়ে চর্চা, প্রচার ও প্রসারের একটি ভিন্নমাত্রা যোগ হয়। এই প্রধান প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে ঠুমরী একটি অন্যতম জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হয়েছে। এছাড়াও শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য ধারা যেমন- ধামার, দাদরা, সাদরা, তারানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, গজল, ভজন, চৈতী, কাজরী প্রভৃতি ধারাগুলোও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ঠুমরী গান সহজেই শ্রোতাদের মনকে আন্দোলিত করতে পারে বা আকৃষ্ট করতে পারে তার সহজ-সরল ভাব, ভাষা আর গায়নশৈলীর মাধ্যমে। ঠুমরী গানের সাথে লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর পূর্বেও ঠুমরী গানের প্রচলন ছিল বলে মতভেদ রয়েছে তবে সেই ঠুমরীর রূপটি কি ছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি। অষ্টাদশ শতকে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র পৃষ্ঠপোষকতা ও অসংখ্য ঠুমরী গানের রচনা ভারতীয়

২৮। শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: সংগীত প্রকাশন, মীরা নাথ, ২০১৫)

সংগীতে বিশেষ প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে ঠুমরী গানে। তাঁর সময়কার সংগীতজ্ঞদের দ্বারা ভারতীয় সংগীতের এই অমূল্য সৃষ্টি ঠুমরী গান সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। নবাব নির্বাসিত হয়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আসলে বাংলাতেও শুরু হয় ঠুমরী গানের চর্চা যা এখনো চলছে। ঠুমরী গানের অবস্থান বর্তমানে এমন উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে যে, অনুষ্ঠানে ঠুমরী গান না করা হলে সংগীতের অনুষ্ঠান যেন পূর্ণতা পায় না। ঠুমরী গানের কাব্যরস, সুর-বৈচিত্র্য, করুণ প্রকৃতির রাগ, গায়কের মেধা ও শ্রম, শৃঙ্গার-রস, তাল, শাস্ত্রের শিথিল নিয়ম, সহজে বোধগম্য ভাষা ঠুমরী গানকে উত্তর প্রদেশের গ্রাম্য লোকগীতি থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান শাখাগুলোর মধ্যে একটিতে পরিণত করেছে।

২.১ ঠুমরী পরিচিতি

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান চারটি ধারার (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী) মধ্যে ঠুমরী একটি অন্যতম প্রধান ধারা হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যান্য ধারার চেয়ে ঠুমরী কিছুটা লঘু প্রকৃতির ও চঞ্চল স্বভাবের কণ্ঠ সংগীত। শ্রী ইন্দু ভূষণ রায় বলেছেন– "ঠুমরী একধরনের ভাবপ্রধান গান। এই গানে রাগের বিশুদ্ধতার অপেক্ষা ভাবের মহত্ব বেশী দেওয়া হয়।"[২৯] ঠুমরীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের সংগীতগুণী ঠুমরী, ঠুংরী, ঠুংড়ী প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। ঠুমরী শৃঙ্গার রস প্রধান গীতশৈলীর নাম। এক প্রকার মনোমুগ্ধকর শৃঙ্গারিক ভাব প্রকাশ পায় ঠুমরী গানের বাণী বা কাব্যাংশে। ঠুমরী গানে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম, বিরহ, মিলন ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও বিশেষ করে হোলী খেলার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলার বিষয়টি ঠুমরী গানে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় তার *'রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "সাধারণভাবে শৃঙ্গার-রস প্রভাবিত ভাব প্রধান গানকেই ঠুম্‌রী আখ্যা দেওয়া হয়। ঠুমরীর বৈচিত্রতা একাধিক রাগের মিশ্রণ।"[৩০]

ঠুমরী গান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যান্য ধারার মতো বিশেষ একটি ধারা। তবে অনেক সংগীতগুণী ঠুমরী গানকে সরাসরি উচ্চাঙ্গের শ্রেণিভুক্ত গান হিসাবে মানতে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা ঠুমরীকে উপশাস্ত্রীয় সংগীত হিসাবে মনে করে থাকেন। ঠুমরী গান রাগের নিয়মনীতি সম্পূর্ন মেনে চলে না। অল্প কিছু সংখ্যক রাগে ঠুমরী গান গাওয়া হলেও রাগের ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে গিয়ে ঠুমরী গান তার নিজস্ব রূপ ধারণ করে স্বাধীন ভাবে। এই শৈলীর গানে রাগের সমারোহ কম হলেও বিস্তারের পরিধি সীমাহীন। রাগের কঠিন কোন নিয়মের উপস্থিতি না

২৯। ইন্দু ভূষণ রায়, *সঙ্গীত শাস্ত্র*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: প্রকাশিকা- মল্লিকা রায়, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫১
৩০। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর* (কলকাতা:সঙ্গীত প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ২৬

থাকার জন্য একজন ঠুমরী গায়কের থেকে অন্য জনের ঠুমরী গায়নপদ্ধতি আলাদা। গায়কির এই পরিবর্তনের কারণে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে পৃথক পৃথক ঠুমরী ঘরানার।

ঠুমরী গানের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হলো, কোন একটি বিশেষ রাগকে অবলম্বন করে পরিবেশনা শুরু করে ঐ রাগের সমপ্রকৃতির বিভিন্ন রাগে স্বরবিস্তারের স্বাধীনতা। যে কেউ ঠুমরী গানের বিশেষ তালিম ছাড়া এই শ্রেণির গান গাইতে পারে না বা গাইলেও ততটা মনোমুগ্ধকর হয় না। ঠুমরী গান পরিবেশনের জন্য বহুকাল চর্চা আর পরিশ্রমের দ্বারা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়। যে শিল্পী যত বেশি দক্ষ তাঁর পরিবেশিত ঠুমরীও ততই বেশি শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে সক্ষম। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– "ঠুংরী অতি ক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্র তালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার সুপারিপাট্য এমন মধুর যে, অতি শীঘ্রই লোকের চিত্ত হরণ করে।"[৩১] অনেকের মতে নৃত্য ও ঠুমরী এই শব্দ দুটি একটি অপরটির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। নর্তকীদের নাচের ঠমক (নৃত্যে প্রযুক্ত বিশেষ প্রকৃতির চলন) থেকে ঠুমরী বা ঠুংরী শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ মনে করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে সংগীতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, "অনেকেই মনে করেন ঠুংরী শব্দটি হিন্দি 'ঠমক' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। নাচের বিশেষ একটি গতিভঙ্গিকে ঠুমক বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত এই কারণেই ঠুংরী গানকে নৃত্য-সংগীতের অংশ হিসাবে অনেকেই স্বীকার করেছেন।"[৩২] ঠুমরী গান ছিল বাঈজীদের গান। তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ঠুমরীকেই প্রাধান্য দিত। তৎকালীন সময়ে বাঈজীরা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন মহলে নাচের সঙ্গে ঠুমরী গান পরিবেশন করত। সে সময়ে বাঈজীদের কণ্ঠে পরিবেশিত ঠুমরী গান সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করতে না পারলেও গানের বাণী বা কাব্যাংশের অর্থ তাদের নাচের ঠমক বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সহজে শ্রোতাদের বোঝাতে সক্ষম ছিল। ঠুমরী গানের সাথে পরিবেশিত বাঈজীদের নাচের ভঙ্গি প্রকাশকে 'ভাও' (নাচের অঙ্গভঙ্গি যার দ্বারা ঠুমরী গানের কাব্যাংশের ভাব প্রকাশ পায়) বলা হতো যা ঠুমরী গানের গায়ক-গায়িকাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য। তবে এখনকার ঠুমরী গান সম্পূর্ণ কণ্ঠ নির্ভর সংগীতশৈলী। নাচের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। বর্তমানে ঠুমরী গানের পরিবেশনায় গায়কের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও গায়কির পরিমাপক হিসাবে ভাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৩] পূর্বে ঠুমরী গান নাচের সাথে পরিবেশিত হলেও নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই গান এখন বৈঠকি সংগীত হিসেবে স্থান দখল করেছে।

৩১। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩২। প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৩৩। রেবা মুহুরী, প্রাগুক্ত

বাঈজী সমাজে যে ঠুমরী গান প্রচলিত ছিল সেই গান ছিল অনুন্নত। বিবর্তনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠুমরী গান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান গায়নরীতি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্য ধারাগুলোর থেকে শিল্পীদের কাছে ঠুমরী গান বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার একটা বিশেষ কারণ হলো, এই গানে শিল্পী নির্দ্বিধায় তার নিজস্ব ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারেন। ঠুমরী গানে ভাবের প্রাধান্য বেশি থাকায় পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা রয়েছে। "এখানেই ঠুমরী প্রাণশক্তিতে মহীয়সী। সে কারণে ঠুমরী শুধু সৌন্দর্যে নয় মাধুর্যে, লালিত্যে নয় বৈচিত্র্যে, ভাবাবেগে নয় সৌকুমার্যে মহিয়ান হয়ে আছে বর্তমান সমাজে।"[৩৪]

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের শুরু থেকে আজ অবধি অনেক বড় বড় ধ্রুপদীয়া বা খেয়ালীয়া সহজে পাওয়া গেলেও ঠুমরী গায়ক বা গায়িকা পাওয়া বেশ কঠিন। ঠুমরীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই গানের চর্চা বা পরিবেশনা বাঈজীরাই বেশি করতেন। তারা বিভিন্ন আসরে বা জনসমাগমে এই ঠুমরী গানই বেশি পরিবেশন করতেন। ঠুমরী গানের মাধ্যমে শিল্পীরা তাদের নিজস্ব ভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারত বলে এর পরিবেশনাও ছিল অনেক আনন্দদায়ক। খেয়াল বা ধ্রুপদ শৈলীর গান রাগের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিবেশিত হয়। কিন্তু, ঠুমরীতে রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় ঠুমরী পরিবেশন করা কঠিন কাজ, যেহেতু অন্য রাগের আগমন এতে ঘটে থাকে শিল্পীর সৃজনশীলতার মাধ্যমে। তবে ঠুমরী গানের পরিবেশনা শুনলে অনেকের মনে হতে পারে যে এই গান খুবই হালকা, এই গানের কোন গভীরতা পর্যন্ত নেই এবং এর গায়ন বা পরিবেশনা পদ্ধতিও বেশ সহজ। কিন্তু আসলে তা নয়। নিরলস সাধনার মাধ্যমে ঠুমরীকে আয়ত্ত করে কণ্ঠে ধারণ করতে হয়।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় *'গীতসূত্রসার'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আধাকাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গাওয়া হয় তাকে ঠুংরী বলে।"[৩৫] ঠুমরী একদিকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে আবার ঠুমরী নামে একটি তাল রয়েছে যা সাধারণত ঠুমরী গানেই ব্যবহার করা হয়। ঠুমরীকে অনেকে তাচ্ছিল্য করে হালকা ভাবে ঠুংরী বলত যার শুদ্ধ উচ্চারণ হবে ঠুমরী। পূর্বে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞরা ঠুমরীকে উচ্চাঙ্গের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। কারণ এই গান ছিল মহিলাদের তাও আবার বাঈজীরা এই গানের সাথে জড়িত ছিল। হয়তো এই কারণেই উচ্চাঙ্গ সংগীতে এর স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে ঠুমরী গান এখন উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি বিশেষ ধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যে গান ছিল এক সময় উচ্চাঙ্গের সংগীতজ্ঞদের দ্বারা অবহেলিত, সেই ঠুমরী গান এখন বড় বড় শাস্ত্রীয় সংগীতগুণী

৩৪। মোহাম্মদ শোয়েব, *ষড়জঃ সংগীত শিক্ষা সহায়িকা* (ঢাকা: সালমা প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৪৬
৩৫। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. **১৭২**

তাদের ধ্রুপদ বা খেয়াল গান পরিবেশনের পর শ্রোতার মনোরঞ্জন বৃদ্ধির জন্য পরিবেশন করে থাকেন। ঠুমরী গান ছাড়া আসর যেন পরিপূর্ণ হয় না। ঠুমরী গানে নানাপ্রকার অলংকার মিশ্রণ করে নান্দনিক রসের সঞ্চার ঘটানো সম্ভব যা খেয়াল বা ধ্রুপদের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না। তাই শ্রোতার মনোরঞ্জনে এই গানের চাহিদা গায়ক-গায়িকার কাছে অনেক বেশি এবং এই গানের জনপ্রিয়তাও শ্রোতাদের নিকট অধিক। এর কারণ একটাই, সংগীত পিপাসু মানুষের মনকে এক নিমেষে দোলা দিতে পারে এমন একটি সংগীত গায়নশৈলীর নাম ঠুমরী যা সহজে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। "অনেকের ধারণা কাজরী, চৈতী প্রভৃতি গায়নরীতির একটি রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে ঠুমরী।"[৩৬] তবে চৈতী ও কাজরী গান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও স্বমহিমায় প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু চৈতী বা কাজরী হলো প্রকৃতির বর্ণনা বিষয়ক বা ঋতুভিত্তিক গান। এদের ঠুমরীর সমগোত্রীয় সংগীতধারা বলা যেতে পারে। কারো মতে, ঠুমরী একটি বিশেষ রাগের নাম।

ঠুমরী একের পর এক সৌন্দর্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলেছে নিজেকে যদিও এই সৌন্দর্য সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন সংগীতগুণী তাঁদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। গুণী সংগীত শিল্পীদের সৃষ্ট নতুন নতুন রূপের মাধুরীতে হাজারো শ্রোতার মনকে আন্দোলিত করে চলেছে এই ঠুমরী। ঠুমরী তার ভাণ্ডার দিন দিন সমৃদ্ধ করে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর নানা রকম সমৃদ্ধশালী মনোমুগ্ধকর সংযোজন ও সংমিশ্রনের মাধ্যমে এবং বলা যায় যে, ঠুমরী গানের সম্পূর্ণতার বা সমৃদ্ধতার কোন শেষ নেই।

২.২ ঠুমরী গানের উদ্ভব

এই পৃথিবীতে যুগে যুগে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্যেকটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃতি তার প্রয়োজন বা চাহিদা মতো সবকিছু সৃষ্টি করেছে। ঠুমরী গানের জনপ্রিয়তার পূর্বে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গানের চর্চা ছিল অধিক। সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ঠুমরী গায়নরীতির যে প্রচলন হয় তার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ভারতীয় উপমহাদেশে গীত বা সংগীতের প্রচলন বহুকাল পূর্ব থেকেই ছিল। সে সকল সংগীত বা গীত কালের বিবর্তনে বিভিন্ন শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয় এবং আজও তার প্রচলন বা অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধ্রুপদ মধ্যযুগে আবিষ্কৃত এমনি একটি গীতধারা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধ্রুপদ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয় এবং কালানুক্রমে এই গীতধারা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে। ধ্রুপদ হলো শাস্ত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা পরিপূর্ণ এক গীতশৈলীর নাম। চারটি তুক বা পদ দ্বারা ধ্রুপদ গান বিভক্ত থাকে। এই চারটি তুক বা পদ হলো-স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

৩৬। প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

মধ্যযুগে ধ্রুপদের চার প্রকার বাণীর প্রচলন ছিল যা গওহর, নওহার, ডাগর ও খান্ডার বাণী নামে পরিচিত ছিল। ধ্রুপদের এই বাণী সর্বসাধারণের পক্ষে সঠিক গায়নপদ্ধতি ও শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে গাওয়া এবং এই গীতশৈলীর কাব্যরস আস্বাদন করা ছিল বেশ কঠিন ও জটিল কাজ। পরবর্তীকালে ধ্রুপদের নিয়মের জটিলতা কিছুটা পরিহার করে জনসাধারণের উপভোগ্য করে ধামার ও সাদরা রীতির গানের প্রচলন শুরু হয়। যদিও এই গীতধারা দুটি প্রায় ধ্রুপদের মতো করেই গাওয়া হতো। তবে এই শ্রেণির গান স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি তুকে বিভক্ত ছিল। বহুকাল এভাবে চলার পর সাধারণ জনগনের বা শ্রোতাদের সংগীতের স্বাদ পরিবর্তন হতে থাকে। ধ্রুপদ, ধামার ও সাদরা প্রভৃতি গীতধারা পরিপূর্ণরূপে জনতার মনের খোরাক যেন কিছুতেই মেটাতে পারছিল না। যার ফলে ধ্রুপদের গায়নরীতির জটিলতা থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা সহজ করে আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিশেষ একটি ধারার আর তা হলো খেয়াল। গায়নরীতির উপর ভিত্তি করে খেয়াল গানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একটি হলো বড় খেয়াল অর্থাৎ, বিলম্বিত লয়ের খেয়াল গান এবং অপরটি হলো ছোট খেয়াল অর্থাৎ, মধ্য বা দ্রুত লয়ের খেয়াল গান। খেয়াল গান দুই তুক বিশিষ্ট, স্থায়ী ও অন্তরা। খেয়াল গান ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি স্বতন্ত্র ধারা। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একসময় খেয়াল গানও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছিল যার ফলস্বরূপ খেয়াল গানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার প্রচলন শুরু হয়। এদের মধ্যে তারানা, ত্রিবট ও চতুরঙ্গ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গুল, নক্স, নাথ, কৌল ও কলবান প্রভৃতি নামে তৎকালীন সময়ে খেয়াল ভাঙ্গা গানের প্রচলন ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিলম্বিত ও দ্রুত বা মধ্য লয়ের খেয়াল গান ও তারানা ব্যতীত খেয়ালের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা কালের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়।

> "এদিকে জনতার চাহিদা তখন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা শুনিতে চায় ধ্রুপদের অতি গাম্ভীর্য্য ও খেয়ালের উগ্র জটিলতার বন্ধন মুক্ত এমন কোন শ্রেণীর গান যাহা হইবে যেমন সহজ, সরল ও বোধগম্য, তেমন চপল, ভাবপ্রবণ ও রসাত্মক। যুগটা ছিল আধুনিক কালের প্রথমার্দ্ধ। অর্থাৎ সে সময়ে একদিকে ইংরাজ সরকার একের পর এক ভারতের ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। অন্য দিকে বহু দেশীয় রাজা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাহাদের উপর শাসনের দায়িত্ব ভার অর্পন করিয়া, সুখ সাগরে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। সর্বত্র ফুর্ত্তির ফুলঝুরিতে পঞ্চ-মকারের রং ঝরিতেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি কোথাও কোথাও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতেরও আনাগোনা শুরু হইয়াছে। এমনই এক সংকটাপন্ন মুহূর্ত্তে যে দুইটি নব্য সঙ্গীত শ্রেণী জন্ম গ্রহণ করিল তাহাদের একটির নাম টপ্পা এবং অপরটির নাম ঠুম্‌রী।"[৩৭]

ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত তথা শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমৃদ্ধির পথ ছিল অত্যন্ত সুদীর্ঘ। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন প্রধান ধারা যেমন- ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি ধারাগুলো তাদের অবস্থান উচ্চাঙ্গ

৩৭। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন,অগ্রহায়ণ ১৪০৩), পৃ. ৩৭

সংগীতে নির্ধারণ করতে বহুকাল সময় অতিক্রম করেছে। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস, ক্রমবিকাশ, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি বিষয়ে যুগের পর যুগ অনেক সংগীতজ্ঞ অনেক গবেষণা করেছেন। যার ফলে আজ উচ্চাঙ্গের এই সব সংগীত ধারা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজলভ্য হয়েছে।

ঠুমরী গান নিয়েও বহু গুণীজন গবেষণা করেছেন তবে ঠুমরী গানের সৃষ্টির কাল ও স্থান নির্ণয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। মানিকলাল সেন শর্মা *'গীত উপক্রমণিকা'* গ্রন্থে ঠুমরী গানের সৃষ্টি বা উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "লক্ষ্ণৌ নগরে ঠুমরী গানের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ প্রথমে ঠুমরী গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামে দুইজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিন জনই ঠুমরী গায়ক ও গীত রচয়িতা ছিলেন।"[৩৮] পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস তাঁর রচিত *'ঠুমরী লহড়ী'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "ঠুমরীর জন্ম খেয়াল গান হইতে হইয়া ছিল। খেয়ালের কঠিন প্রাজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যে প্রতিক্রিয়া হইতে ইহার সূত্রপাত ঘটিয়া ছিল। অর্থাৎ ভাষার গুরুত্বকে উপেক্ষা করিয়া স্বরের ঔজ্জ্বল্য যে খেয়ালে প্রাধান্য পাইয়া থাকে, তাহাকে হ্রাস করিয়া কবিত্বের রস সৃষ্টি করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল।"[৩৯] আবার কেউ বলেছেন "খেয়ালের বিস্তার কালে বিভিন্ন প্রকার সুললিত স্বর সংযোগ এবং অলংকার ব্যবহার হতে ঠুমরী গানের উদ্ভব হয়েছে। ওয়াজেদ আলী শাহ্র পৃষ্ঠপোষকতায় ঠুমরীর সৃষ্টি ও প্রবর্তন।"[৪০]

ঠুমরী গানের প্রচলন লক্ষ্ণৌ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পূর্বেও ছিল যার ফলে ঠুমরী গানের প্রবর্তক কে ছিলেন তা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় পণ্ডিতগণের মধ্যে। লক্ষ্ণৌতে ঠুমরী গানের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নাম বলে থাকেন ঠুমরী গানের প্রবর্তক হিসাবে। আবার কেউ কেউ ওস্তাদ সাদিক আলি খাঁ সাহেবকে ঠুমরী গানের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হিসাবে অভিহিত করেছেন। *'সংগীতসার'* গ্রন্থে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী লিখেছেন যে, "ঠুংরী গানের সৃষ্টিকর্তা শোরী মিঞা।"[৪১] তবে অনেকের কাছেই এ কথা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ শোরী মিঞা কর্তৃক সৃষ্ট টপ্পা রীতির গান থেকে ঠুমরী গান অনেক ব্যতিক্রম। তবে শোরী মিঞার টপ্পার পরিধি পূর্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করে নেওয়ার কারণে তা থেকে ঠুমরী গানের উদ্ভব হয়েছে এমনটা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'গীতসূত্রসার'* গ্রন্থে বলা হয়েছে। অন্যদিকে কেউ কেউ স্বীকার করেন যে ঠুমরী গানের আবিষ্কারক হলেন গোলাম নবী। তবে উল্লিখিত এই সকল প্রবর্তক বা সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে পণ্ডিতমহলে

৩৮। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৩৯। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ১

৪০। পংকজ কান্তি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৪১। প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

মতভেদ বিদ্যমান। ঠুমরী গানের উৎপত্তির কাল যেমন অনির্দিষ্ট তেমনই এর প্রবর্তক বা সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কেও সঠিক কোন তথ্য আজ পর্যন্ত কোন সংগীতজ্ঞ প্রকাশ করেননি এবং কোন গবেষণাতেও উঠে আসেনি।

> "১৮৪৬ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস লিখিত *"সংগীত রাগকল্পদ্রুম"* গ্রন্থে সংকলিত খ্যাল-খুশাল, ইয়াস, ছবি-নায়ক, প্রেমরঙ্গ প্রমুখ রচিত ঠুমরীর নমুনা দেখে আমাদের এই ধারণাই হয় যে, নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ এবং নিয়ামৎ খাঁ সদারঙ্গের পূর্বেও ঠুমরীর অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আর একটি বড় প্রমাণ হলো 'মির্জা খাঁ' রচিত "তুহ্ফাৎ-উল্-হিন্দ" (তুহ্ফাৎ-উল-হিন্দ ১৬৭০ খ্রীঃ রচিত) গ্রন্থে স্পষ্ট লিখা আছে যে, "শ্রী" রাগের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি রাগিণীর মধ্যে ঠুমরী অন্যতম। ফকিরুল্লাহ তাঁর 'রাগ দর্পন' (১৬৬৬ খ্রীঃ) গ্রন্থে বলেছেন যে, ঠুমরীর অপর নাম বরুয়াঁ বা বারোয়াঁ। মির্জা খাঁ বলেছেন ঠুমরী রাগিণী দোয়াব (উত্তর প্রদেশের গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তি ভূখণ্ড যা অযোধ্যার রাজ্য নামে খ্যাত) অঞ্চলে বেশি প্রচলিত। অথচ আমরা জানি যে, দোয়াব অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীত গুলোর মধ্যে ঠুমরী অন্যতম। অপর গীত গুলো হচ্ছে- বারোঁয়া, কাজরী বা কাজলী, চৈতী, বিরহা, সাওনী ইত্যাদি। এখন সব শুদ্ধ দাঁড়াচ্ছে এই-
>
> ১। ঠুমরী ১৭০০ শতকেও ছিল যখন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র জন্ম হয়নি।
>
> ২। ঠুমরী রাগিণী অর্থাৎ বারোয়াঁ রাগিণী যা উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা রাজ্যের নিজস্ব বস্তু। বারোয়াঁ বা ঠুমরী রাগিণীর জন্ম লোকগীত থেকে।
>
> দোয়াব অঞ্চলের প্রায় সমস্ত লোকগীত নৃত্যসহ গাওয়া হতো। আবুল ফজল লিখিত "আইন-ই-আকবরী" (রচনাকাল ১৫৪০–১৫৯৩ খ্রীঃ) গ্রন্থে সমকালীন প্রায় সমস্ত প্রকার গীতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকলেও ঠুমরী গানের বিন্দু-বিসর্গও উল্লিখিত হয়নি। এটা প্রমাণ করে যে, ঠুমরীর জন্ম ১৭ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হয়েছিল। আবুল ফজল এও জানিয়েছেন যে, উত্তর ভারতের নাচ গান করা গোষ্ঠীদের নট, নটওয়া, কাঞ্চনী প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হতো। আমাদের বিশ্বাস এই যে, দোয়াব অঞ্চলেই (অযোধ্যার রাজ্য) নটওয়া-কাঞ্চনীরা তাদের লোকনৃত্যের (সম্ভবত নটবরী নৃত্য) সঙ্গে বাঁরোয়া রাগিণী আশ্রিত লোকগীতি গাইতো। এটাই পরবর্তীকালে ঠুমরী নামক লোকপ্রিয় গীত রূপে পরিচিত হয়। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেই নটবরী নৃত্য থেকে উদ্ভূত কত্থক নৃত্যের এক অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠে ঠুমরী। এখনো অধিকাংশ ঠুমরী কত্থক নর্তক-নর্তকীদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে।"[৪২]

ঠুমরী গান বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল অষ্টাদশ শতকে। তখনকার রাজা-বাদশাদের মনোরঞ্জনের প্রধান বিষয় হিসাবে ঠুমরী গান সমাদর লাভ করেছিল। তৎকালীন সময়ে নৃত্য ও ঠুমরী গানসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিতেন সে সময়কার প্রভাবশালী রাজা ও জমিদারেরা। সংগীতজ্ঞদের মতে, এক শ্রেণির বাঈজীরা উত্তর ভারতীয় নৃত্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে দাঁড়িয়ে এক প্রকার গান করত যাকে বলা হতো খাড়ী ঠুমরী। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি প্রসিদ্ধ গায়নরীতি হিসাবে ঐ 'খাড়ী ঠুমরীই' পরবর্তীকালে ঠুমরী গানে

৪২। শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, *মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা* (কলিকাতা: লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৪), পৃ. ১৭

রূপান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। খাড়ী ঠুমরী সম্পর্কে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন– "খাড়ী ঠুংরীকেই অনেকে ঠুমরী গানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করেন। খাড়ী ঠুংরী বলতে খাড়া হয়ে বা দাঁড়িয়ে বাঈজীরা যে গান করতো, সেই গানকে বোঝায়। এই খাড়ী ঠুংরী থেকেই পরবর্তীকালে শুধু ঠুংরী এসেছে।"[৪৩] গবেষণার মাধ্যমে ঠুমরী গানের প্রবর্তক ও উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও অনেক গবেষক ঠুমরী গানকে উত্তর প্রদেশের কিছু গ্রাম্য বা লোকগীতের বিবর্তিত রূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে ঠুমরী গানের চাহিদা বা জনপ্রিয়তা অধিক। প্রথম দিকে এই ঠুমরী গানের চর্চা তেমন না হলেও বর্তমান সময়ে এসে এর চর্চা, প্রচার ও প্রসার একটি বিশেষ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। ঠুমরী গানের উৎপত্তি সম্পর্কে সকল গবেষক বা সংগীতজ্ঞরাই তাঁদের আনুমানিক বা কাল্পনিক ধারণা থেকে এর সময় কালের উল্লেখ করেছেন যার সম্পর্কে অনেক মতভেদের উল্লেখ রয়েছে। তবে কোন গবেষক বা পণ্ডিতগণ কোথাও এই কথা উল্লেখ করেননি যে, কবে বা কোথায় এই সংগীত শৈলীর জন্ম এবং কে এই ঠুমরী গানের প্রবর্তক। এই সম্পর্কে যা কিছু জনসম্মুখে উঠে এসেছে তার সবই লোকমুখে প্রচারিত তথ্য বা আনুমানিক। বিভিন্ন সময়ে ঠুমরী গানের উদ্ভব সম্পর্কে যেসব মতভেদের উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো–

> "১। বৈদিক যুগে ঠুমরী গানের প্রথম উদ্ভব ঘটেছে। বাঈজী সম্প্রদায়ের ঠুমরী গান পরিবেশনার প্রকাশ ভঙ্গির সাথে তৎকালীন অর্থাৎ, বৈদিক যুগের পটীয়সীগন তাদের কলা প্রদর্শনকালে যে ভাব বা অঙ্গভঙ্গির উল্লেখ করতেন তার সামঞ্জস্যতা ক্ষেত্র বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগে যারা নৃত্য-গীতের পরিবেশনা বা চর্চা করতেন তাঁদের বলা হতো অপ্সরা ও কিন্নর যারা দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। ধারণা করা হয় যে, এই অপ্সরা ও কিন্নরীবৃন্দের পরিবেশিত নৃত্য-গীতাদির পরিবর্তিত রূপই ঠুমরী গান।
>
> ২। নৃত্য, গান ও অভিনয় ইত্যাদি বিষয় সমূহ এক প্রকার সংগীত পদ্ধতির প্রধান বিষয় বলে বিবেচিত হতো। প্রাচীন কালের সেই সংগীত পদ্ধতির নাম ছিল ছালিকা। সাধারণত নটী, গণস্ত্রী ও বারাঙ্গনা শ্রেণির রমণীরা সে সময় এই ছালিকা বা ছলিকা সংগীত পদ্ধতির চর্চা ও পরিবেশনা করতেন। স্বীয় পূত্র প্রদ্যুমনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছালিকা সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করেছেন বলে জানা যায় এবং মালবিকার দ্বারা পরিবেশিত ছালিকার সুন্দর বর্ণনা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যায়। কালক্রমে ছালিকা শৈলীর নৃত্যগীতের রূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে ঠুমরী গান ছালিকা বা ছলিকা নৃত্যগীতেরই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দেশী রূপ বলে অনেক সংগীতগুণী মনে করে থাকেন। তবে ছালিকাই ঠুমরী গানের আদিরূপ কি না সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য কেউ উল্লেখ করেননি।

[৪৩] প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক–শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ২২২

৩। রাজা মানসিংহ তোমর ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজত্ব ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে। শোনা যায় যে, রাজা মান অসাবধানতা বশত একদিন রাগ ভৈরবী গাইবার সময় উক্ত রাগে একটি বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করে ফেলেনে এবং সেই স্বরটির উপস্থিতিতে রাগের বিস্তার চমৎকার ভাবে তাঁর মনে দোলা দেয়। তিনি পরবর্তীতে আরও কয়েকটি অনিয়মিত স্বর ভৈরবী রাগে প্রয়োগ করেন। রাজা মান অবাক হয়ে যান যখন তাঁর প্রয়োগকৃত স্বরের প্রভাবে ভৈরবী রাগের সৌন্দর্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। জানা যায় যে, এই রকম অনিয়মিত স্বরের প্রয়োগে 'দৈবৎ ভৈরবী' রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তিনি মুগ্ধ হয়ে নিজের নামের সাথে মিল রেখে এর নামকরণ করেন 'তোমরী'। ধারণা করা হয় যে, কালক্রমে ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে এই তোমরীই পরবর্তী কালের ঠুমরী নাম ধারণ করেছে।

৪। বৈষ্ণব মতানুসারে পঞ্চদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে বৃন্দাবনের বল্লভাচার্য এবং বাঙলার শ্রীচৈতন্যদেব ভজন ও কীর্তন গীত প্রচার করেছিলেন যা গাওয়া হতো ঈশ্বরের প্রার্থনার উদ্দেশ্যে। উক্ত ভজন ও কীর্তনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা বিষয়ক বিভিন্ন পদাবলীর উল্লেখ থাকত। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কাহিনী সে সকল পদাবলীতে বর্ণিত হতো। বৈষ্ণব ভক্তরা তাদের ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হয়ে ভক্তি ভরে মাধুর্যমণ্ডিত করে নৃত্যের সাথে সেই সব পদাবলী গাইতেন বা পরিবেশন করতেন। রাসধারী ও রাসনৃত্য ইত্যাদি নৃত্যগীতের প্রচলন এখন ব্রজভূম তথা সারা উত্তর ভারতে প্রচলিত রয়েছে। উক্ত ভজন ও কীর্তন থেকেই পরবর্তীতে ঠুমরীর উদ্ভব হয়েছে এবং বিশেষভাবে বারাণসীতে গীত্ ও প্রচারিত হয়েছে।

৫। প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রেম-বিরহ, পাওয়া না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মিলন, বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানারকম রসালাপ ফুটে উঠে এরকম একপ্রকার লোকগীতের প্রচলন ছিল অতীতকালে যা নৃত্যের সাথে গাওয়া হতো। এই লোকগীতি যারা গাইতেন এবং যারা এর সাথে নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাঁদের কণ্ঠস্বর তেমন সুললিত ছিল না। তবে তাঁদের অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গি এবং সুন্দর পদক্ষেপ গানের লয়ের সাথে মিশে এক অপরূপ সুন্দর নৃত্যগীতের উপস্থাপন করত। নৃত্যের ভাবাত্মক অংশকে প্রভাবশালী করা ছিল উক্ত গীতের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য। এই লোকগীত খুবই সহজ, সরল ও সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় রচিত হতো। এই লোকগীত গাওয়ার উপযুক্ত বিশেষ সময় ছিল বিভিন্ন গ্রাম্য উৎসবের সময়। যেমন- বসন্ত উৎসব, হোরী, বর্ষার শুরুতে, শরতের শস্য কাটা ইত্যাদি উৎসবকে কেন্দ্র করে এই লোকগীত গাওয়া হতো এবং এর সাথে নৃত্য পরিবেশিত হতো। এই গীতের পরিবেশনায় শুধু যে গায়কই নাচবে বা নর্তকই গান গাইবে এরকম কোন বিশেষ নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে কেউ দুই দিকেই পারদর্শী হলে একসাথে পরিবেশন করতো। অনেক সময় দেখা যায় অন্য কেউ গান গাইছে আর নর্তক নৃত্য পরিবেশন করছে। উক্ত লোকগীতে কালক্রমে যখন ভাষার পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং এর সুরে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই এই প্রাচীন লোকগীতি ঠুমরী নামে নিজের আত্মপ্রকাশ শুরু করে। নৃত্যগীতের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'ঠুমক'। যার অর্থ হলো সুন্দর পদক্ষেপ। প্রথম পর্যায়ে গীতের সাথে নৃত্যের আত্মিক সম্পর্ক থাকায় ঠুমক থেকে ঠুমরীর সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক সংগীতজ্ঞ মনে করেন। সুন্দর পদক্ষেপ আর চটুল গীতের মিশ্রণে গাওয়া হতো উক্ত প্রাচীন লোকগীত বিশেষ, যার পরিবর্তিত রূপ হলো ঠুমরী।

৬। ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমনের ফলে অষ্টাদশ শতকে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দিন দিন কমতে শুরু করে এবং সংগীত বড় বড় রাজা-মহারাজাদের দরবার হতে মুক্ত হয়ে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য দ্বারা প্রতিপালিত হতে শুরু করেছিল। তাই ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে সংকটময় সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে অষ্টাদশ শতকের সংগীতকে। সে সময় বহু রাজ্য মোগলদের থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করে এবং অন্যদিকে অনেক রাজ্য ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এরূপ অবস্থায় অনেকে যেমন নির্ভয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন তেমনি আবার অনেকে ভোগ-বিলাসীতায় নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন অনবরত। মদ, নৃত্য-গীত, দাবা-পাশা ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে যখন রাজা-বাদশারা বিলাসস্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন অন্ধকারের দিকে, ঠিক তখনি এক প্রকার রসালো নৃত্যগীতের উদ্ভব ঘটেছিল যার নাম ঠুমরী। খেয়াল গান তখন তাদের মনের খোঁড়াক মেটাতে অক্ষম ছিল। কারণ এই গান গম্ভীর প্রকৃতির ও নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা বাঁধা আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তখন খেয়াল গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করা হতো না। তাই তাদের প্রয়োজন ছিল শ্রুতিমধুর, রসালো মনোরঞ্জনকারী এমন এক প্রকার সংগীতশৈলীর যার মধ্যে গীত ও নৃত্য উভয় পরিবেশিত হয়। তাদের এই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এক বিশেষ সংগীত শৈলীর জন্ম হয় যা রাজা-বাদশাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ প্রদর্শন করে আর সেই সংগীতশৈলীর নাম ঠুমরী যা তৎকালীন সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উক্ত কারণে হয়তো অষ্টাদশ শতকে ঠুমরী গানের উদ্ভব হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন।

৭। ঠুমরী গানের উদ্ভাবক হিসাবে অনেকে গোলাম রসুলের পুত্র গোলাম নবীর কথা উল্লেখ করে থাকেন। গোলাম নবী শোরী মিঞা নামেও পরিচিত ছিলেন। পিতা গোলাম রসুলের নিকট তিনি খেয়াল গানের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শোরী মিঞার কণ্ঠ ছিল শ্রুতিমধুর, কোমল ও লঘু প্রকৃতির যা খেয়াল গান গাওয়ার জন্য উপযোগী ছিল না। সে সময় দ্রুত লয়ে নানা জটিল ও কঠিন তানের সাথে খেয়াল গান গাওয়া হতো। যার কারণে খেয়াল পরিবেশনায় ওস্তাদি বা কলাগত ভাব প্রকাশিত হলেও ভাষার ভাবগত রূপটি কখনো প্রকাশ হতো না। খেয়াল গানের এই জটিলতা শোরী মিঞা মেনে নিতে না পেরে দ্রুতলয়ের খেয়াল গানের জটিল-কঠিন তান ও স্বরের বক্রতা বাদ দিয়ে ভাষাগত ভাবের প্রাধান্য দিয়ে ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে এক অভিনব সংগীত শৈলীর সৃষ্টি করেছিলেন যার নাম ঠুমরী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিল। জানা যায় যে, টপ্পা রীতির উদ্ভাবনও শোরী মিঞা করেছিলেন।"[৪৪]

অনেক সংগীতগুণী বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়ে ঠুমরীর উদ্ভাবক ও উদ্ভবের সময় নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে সকল মতামতের উপরে মতভেদ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ঠুমরী শৈলীর গান যে সময় যার দ্বারা-ই উদ্ভাবিত হয়ে থাকুক না কেন এর চলার পথ পূর্বে সহজ ছিল না এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে গ্রহণযোগ্যতা ও জনসাধারণে এর জনপ্রিয়তা অর্জনে সময় লেগেছে বহুকাল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঠুমরী গান অধিক প্রচার, প্রসার ও সংগীত শৈলীর স্বীকৃতি অর্জন করে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

৪৪। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০২), পৃ. ৩-৫

তৃতীয় অধ্যায়

ঠুমরী গানের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান

ঠুমরী গানের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান

সংগীত মানুষের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। সমগ্র পৃথিবীতে সংগীতের যে বিকাশ ঘটেছে তার জয়যাত্রা আজও বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত তথা রাগসংগীত অতি প্রাচীন এবং এর চর্চাও অধিক। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচীন এই গীতরীতি থেকে উৎপত্তি ঘটেছে অভিনব পদ্ধতির বিভিন্ন গীতধারার। ঠুমরীও এমনই একটি সংগীত ধারা যা উদ্ভবের পর ভারতীয় সংগীত তথা রাগসংগীতে নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটেছিল। ঠুমরী তার অভিনব গায়নশৈলীর মাধ্যমে যুগে যুগে হাজারো শ্রোতার মনকে আকর্ষিত করেছিল। বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রেখে ঠুমরী তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিল রাজদরবার থেকে শুরু করে জনসাধারণের মাঝে।

৩.১ ঠুমরীর ক্রমবিকাশ

ঠুমরী গানের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বেশ কিছু ধাপ পর্যায়ক্রমে পার করে ঠুমরী গান তার বর্তমান অবস্থায় উন্নিত হয়েছে। ঠুমরী গানের উৎপত্তির পর ধীরে ধীরে এই ধাপগুলো ঠুমরী গানকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছে। কালভেদে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত নৃত্য, খেয়াল ও ভাবপ্রধান এই তিনটি ধাপে ঠুমরী গানের বিকাশ ঘটেছে।

খেয়াল গান থেকে ঠুমরী গানের জন্ম - এই ধারণাটি অনেক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কারণ খেয়াল কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্যতাপূর্ণ সংগীত শৈলী যাতে স্বরের প্রাধান্য অধিক ও ভাষার গৌণ। অন্যদিকে, স্বরের প্রাধান্য কমিয়ে গানের ভাষার উপর জোড় দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করাই ছিল ঠুমরীর মূল উদ্দেশ্য। ঠুমরী গানকে পৃথক একটি সংগীত ধারা হিসাবে পরিচিত করার জন্য সংগীতজ্ঞরা অনেক প্রকার উপায়, সাধনা ও ধ্বনির তারতম্য ঘটিয়েছেন বহুকাল সময় ধরে। যার ফলে ঠুমরী গানে খেয়ালের গুরুগম্ভীর ভাব, বিস্তারের আধিক্যতা কমিয়ে সহজ ভাষা ও ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, যা শ্রোতাদের কাছে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক সংগীত ধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানকালে ঠুমরী গানের যে রূপ লক্ষ্য করা যায় তা বিকাশ লাভ করেছে বহুমুখী প্রচার-প্রসার অর্থাৎ, বিভিন্ন শিল্পী, সংগীত ঘরানার বিশেষভাবে চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে।

সময়কাল অনুযায়ী শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঠুমরী গানের বিকাশ ধারাকে নৃত্য-প্রধান, খেয়াল-প্রধান ও ভাব-প্রধান এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৩.১.১ নৃত্য প্রধান ঠুমরী

উৎপত্তির প্রথম ভাগে ঠুমরী গান নৃত্যগীত হিসাবে অতি পরিচিত ছিল। সেকালে নৃত্যের সাথে ঠুমরী গান গাওয়া হতো যাতে গানের কাব্যরস ও ভাব সহজে শ্রোতারা উপলব্ধি করতে পারে। তাই বলা যায় যে, ঠুমরী গান ও নৃত্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঠুমরী গান বিকাশের এই পর্যায়ে ঠুমরী পরিবেশনকালে নৃত্যের দ্বারা বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, চোখের ঈশারা ও মুখ ব্যাদান ইত্যাদির ব্যবহার করা হতো। যার উদ্দেশ্য ছিল মূল গানের ভাব, কাব্যের ভাষা ও রস শ্রোতাদের নিকট সহজবোধ্য করে তোলা। এই সময় ঠুমরী গানে সহজ প্রকৃতির রাগগুলো ব্যবহৃত হতো এবং তালের ক্ষেত্রে ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি সহজ-সরল তালের ব্যবহার হতো। যার ফলে গায়ক ও নর্তক উভয়েই গানের প্রকৃত ভাব শ্রোতাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে।

> "ঠুমরী গানগুলির কবিতা ছন্দযুক্ত এবং বন্দিশ নানান লয়যুক্ত বিভাজনের উপর রচিত হইত। নর্ত্তকেরা সেই সকল গীতের অনুসারে নাচিতেন। কখনো একই ব্যক্তি এক সাথে গাহিতেন ও নাচিতেন অথবা কখনো একই ব্যক্তি একবার গাহিতেন ও পরক্ষণে নাচিতেন। এবং এই ভাবেই পর্যায়ক্রমে গান ও নাচ চলিত। আবার কখনো একজন গাহিতেন এবং অপর জন সেই গানকে অনুসরণ করিয়া নাচিতেন। দেখা যায়, এই ছিল ঠুমরীর প্রাথমিক বিকাশের স্বরূপ। আর সেই জন্যই উহাকে নৃত্য ঠুমরী বা নৃত্য প্রধান ঠুমরী বলা হইত।"[৪৫]

নৃত্য প্রধান ঠুমরী গানের পর এই গানের বিকাশে এক নতুন রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং ঠুমরী গান ধুন জাতীয় একপ্রকার সংগীতের রূপ গ্রহণ করেছিল। এই প্রকার ঠুমরীতে কোন প্রকার বাক্য বা স্বর গঠনের চর্চা সেই সময় করা হতো না। ঠুমরীর এই রূপ বিকাশের সময় এতে নৃত্য সংযোজন না করে এর বন্দিশ বা গানের কথার উপর জোর দিয়ে পরিবেশিত হতো। নৃত্য প্রধান ঠুমরীতে গানের ভাব-ভাষা ফুটিয়ে তুলতে নর্তক যেরূপ শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতেন, সেইরূপ কিছু ইশারা-ইঙ্গিত প্রয়োগ করে এই প্রকার ধুন জাতীয় ঠুমরী গান পরিবেশিত হতো। এই প্রকার ঠুমরী গানে লক্ষ্ণৌর সুবিখ্যাত নৃত্যবিদ বিন্দাদীন ও কালিকাদীন খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি এই জাতীয় অনেক ঠুমরী গান রচনা করেছিলেন। এছাড়াও ললন পিয়া ও অন্যান্য ঠুমরী রচয়িতার অনেক ঠুমরীতে এই প্রকার ঢঙের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৩.১.২ খেয়াল প্রধান ঠুমরী

ঠুমরী গান প্রথম অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করে উন্নতি সাধন করে চলেছে এবং এই গানের সাথে কিছু বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা শুরু হতে থাকে। ঠুমরী গান বিকাশের এই পর্যায়ে প্রথম অবস্থার মতোই সহজ সরল

৪৫। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ২

রাগ ও তালের ব্যবহার লক্ষণীয় এবং এই সময় ঠুমরী গান উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে কিছুটা খেয়াল গানের রূপ ধারণ করতে থাকে। সেই সময় ঠুমরী গানের প্রধান তাল হিসাবে ত্রিতালকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। খেয়াল প্রধান ঠুমরী গানে ঠুমরীর বিকাশের প্রাথমিক রূপ থেকে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে সেই সময়কার ঠুমরীতে নৃত্য প্রদর্শন না হওয়া এমনকি গায়ন কালে কোন প্রকার ইশারা-ইঙ্গিতও প্রদর্শন করা হতো না। বিকাশের এই পর্যায়ে এসে ঠুমরী গানের সাথে নতুন মাত্রার যোগ হয়েছিল এবং তা ছিল ঠুমরী গানে খেয়ালের মতো ছোট তান ও গিটকিরি ইত্যাদির প্রয়োগ। নৃত্য প্রধান ঠুমরীর গায়নপদ্ধতি পরিবর্তন করে খেয়াল প্রধান বা খেয়াল ভঙ্গিম ঠুমরীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঠুমরী গান পরিবেশন কালে এই গান দ্রুত খেয়াল গানের মতোই মনে হতো। খেয়ালী ঠুমরীর কাব্যভাব সাধারণত ভাষার উপযুক্ত বিশেষ রাগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। খেয়াল অঙ্গের ঠুমরী গানে কথার প্রাধান্য অধিক ছিল এবং গানের বাণীর সাথে উপযুক্ত রাগের ব্যবহার ঘটিয়ে এই ধারার ঠুমরী গানের প্রকাশ করা হতো। এই ঠুমরীর গায়নশৈলী দ্রুত লয়ের খেয়াল গানের মতো হলেও এতে খেয়ালের মত কঠিন তান, লয়কারি ও কোন প্রকার বোল বানাও এর প্রয়োগ হতো না। উক্ত প্রকারের ঠুমরী গানই খেয়ালী ঠুমরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অনেক সংগীতজ্ঞ ঠুমরী গানের এই ধারাকে ঠুমরীর বিকাশের ২য় পর্যায় বা ধাপ হিসেবে মনে করে থাকেন। খেয়ালী ঠুমরী গান ভারতের মহারাষ্ট্রের গায়ক-গায়িকার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ঠুমরী গানের উৎপত্তির সময়কাল ও প্রবর্তকের মতো এই ধারার ঠুমরী গানের স্রষ্টা সম্পর্কেও অনেক মতভেদ রয়েছে।

> "গুলাম নবী শোরী অথবা সাদিক আলী খাঁ কিংবা অপর কেহ, যিনিই এই প্রকারের ঠুমরী রচনা করিয়া ছিলেন, তিনি যে খেয়াল গানের একজন বিশিষ্ট মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও উহা নৃত্যের দ্বারা পূরণ করা চলিত, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া উহাকে কেবল মাত্র গানের উপযুক্ত করিয়াই সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।"[৪৬]

৩.১.৩ ভাবপ্রধান ঠুমরী

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে বর্তমান কালে যে ঠুমরী গানের চর্চা হয়ে থাকে তা মূলত পূর্বের নৃত্য প্রধান ও খেয়ালী ঠুমরী থেকে পৃথক। এই ঠুমরী শুধুমাত্র রাগপ্রধান বা বিশেষ কোন রাগে এর কাব্যিক রস প্রকাশ করে না। ভাষা ও ভাব প্রধান এই ধারার ঠুমরী গান মূলত বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস তাঁর রচিত 'ঠুমরী লহড়ী' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, "ঠুমরী গানে যখন বোল ও কাব্য ভাব প্রকাশের কলাকারিতা (Technic) স্থান পাইল, তখন তাহা ঠুমরী গানের তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাকে ভাবুক ঠুমরী

৪৬। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ৩

অথবা ভাব প্রধান ঠুমরী নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।"[৪৭] ভাবপ্রধান ঠুমরী গানের অস্তিত্ব বা স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য ছোট তান, খটকা, মুর্কী ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। স্বরের উচ্চতা ও মন্দ্রতা এবং গানের বাণীর রসভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করার নিমিত্তে উক্ত প্রকার ঠুমরীতে ব্যবহৃত রাগের সাথে ঐ রাগের সমপ্রকৃতির রাগের বা ভিন্ন কোন রাগের ছায়া প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ভাব প্রধান ঠুমরী গানের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিকশিত করার জন্য এই চালের ঠুমরী গান বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। এই ঠুমরীতে যৎ, আদ্ধা, দীপচন্দী প্রভৃতি তাল অধিক পরিলক্ষিত হয়।

ভাব প্রধান ঠুমরী গানের সৃষ্টিকাল ও স্রষ্টার সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সংগীতগুণীদের মতানুসারে এই ধারার ঠুমরী গান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উদ্ভব হয়েছিল। ভাব প্রধান বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গানের সাথে তৎকালীন সময়ের ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ এবং গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেবের ঘনিষ্ঠতা এতই দৃঢ় ছিল যে, অনেকেই এই দুই সংগীতজ্ঞকে এই ধারার ঠুমরী গানের উদ্ভাবক ও প্রচারক বলে মনে করতেন। কারণ উক্ত দুইজন সংগীতগুণী সেইসময় এই বিলম্বিত ধারার ঠুমরী গানকে অধিক জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রদর্শিত ঢং বা বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেই বর্তমান কালে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলায় বিশেষভাবে বিলম্বিত লয়ের ভাব প্রধান ঠুমরীর চর্চা হয়ে থাকে। ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ ও গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব তাঁদের ঠুমরী গায়নপদ্ধতিতে কোন প্রকার ক্রম বা বিধির অনুসরণ করতেন না। অর্থৎ, খেয়াল গানে যেমন রাগের চলন অনুযায়ী স্বর-বিস্তারে একটি স্বরের পর অন্য একটি স্বরের প্রয়োগ করা হয়, তেমনি তাঁরা কোন প্রকার ধারাবাহিকতা ঠুমরী গান গায়নে বিস্তারের সময় ব্যবহার করতেন না। তবে এই দুইজন সংগীতগুণী তাঁদের গায়কির যে ঢং প্রকাশ করেছেন তা সহজেই গানের ভাষার ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল যা ঠুমরী গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ড. অঞ্জলি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে, "গণপৎ রাও লক্ষ্ণৌতে এসে সেই সময়ের ঠুমরী সম্রাট ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ এর নিকট ঠুমরী গানের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র দরবারে প্রথম বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গান প্রচলন করেন।"[৪৮]

তৎকালীন সময়ে ঠুমরী গান শাস্ত্রীয় সংগীতের আওতাভুক্ত ছিল না। শুধু মাত্র লঘু অর্থাৎ, ধুন জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচিত হতো, যা ঐ সময়ে ঠুমরী গায়ক নিজের ভাব বা মনোবৃত্তি অনুযায়ী গাইতেন। তাই ঠুমরী গানকে

৪৭। তদেব

৪৮। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকথা*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২১

অনিয়মিত বা নিয়ম-নীতি বহির্ভূত গায়নশৈলী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তী সময়ে যখন দেশ স্বাধীন হয় অর্থাৎ, ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তার পরপরই ঠুমরী গান তাঁর বিকাশের মর্যাদা পায়। বিভিন্ন গুণীজনের প্রচেষ্টার দ্বারা ঠুমরী গানের গায়নপদ্ধতি বা কলাকারিতায় শাস্ত্রীয় বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে যখন ঠুমরী গানে ক্রমবদ্ধ স্বর-বিস্তার প্রয়োগ শুরু হয়, তারপর থেকে অসংখ্য সংগীত পিপাসু ঠুমরী গানের চর্চা শুরু করেন এবং রেডিও, টিভি, রেকর্ড, ফিল্ম ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যম-গণমাধ্যমে ঠুমরী গান সম্মানের সাথে পরিবেশিত হতে থাকে। অনেকে ঠুমরী গানের এই পরিবর্তিত অবস্থাকে ঠুমরী গানের বৈজ্ঞানিক অবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩.২ ঠুমরীর ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান

নৃত্য, খেয়াল ও ভাব এই প্রধান তিন স্তরের দ্বারা ঠুমরী গান প্রাকঃকাল থেকে বিকাশের যাত্রা শুরু করে বর্তমান কালে এসে পৌঁছেছে। এইসব স্তরে বিভিন্ন সংগীতজ্ঞ বিভিন্ন কালক্রমে তাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঠুমরী গানের অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্থান হিসাবে শাস্ত্রীয় সংগীতে নিজের জায়গা করতে সক্ষম হয়েছে। ঠুমরী গানের ক্রমবিবর্তনে তৎকালীন সময়ের সংগীতগুণীদের অবদান অসীম। তাই ঠুমরীর ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন শিল্পীর অবদান ও সংগীত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

ঠুমরী গানের শুরু থেকে উন্নতির সুউচ্চ পর্যায়ে স্থান করে নেওয়ার জন্য যে সংগীতজ্ঞগণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্, বিন্দাদীন মহারাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, মীর্জা সাহেব, গণপৎ রাও, উজীর খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, গহরজান, কৃষ্ণভামিনী, আব্দুল করিম খাঁ, মৌজুদ্দিন খাঁ, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, সাদিক আলী খাঁ, বড়ী মোতি বাঈ, বড়ী মালকাজান, আগ্রাওয়ালী মালকাজান, ফৈয়াজ খাঁ, অমিয় নাথ সান্যাল, ইন্দুবালা, কিরণময়ী, শান্তি বাঈ, কালে খাঁ, জমিরউদ্দিন খাঁ, বড়ে গোলাম আলী খাঁ, দবীর খাঁ, হীরাবাঈ বড়দেকর, যামিনীনাথ গাংগুলী, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, তারাপদ চক্রবর্তী, মুনাব্বর আলী খাঁ, বেগম আখতার, রসুলন বাঈ, নয়না দেবী, ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহেড়ী, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, শোভা গুর্তু, গিরিজা দেবী, রেবা মুহুরী, রীতা গাংগুলী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দে, পারভিন সুলতানা, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ (১৮২২-১৮৮৭)

উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ১৮২২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। দোয়াব অঞ্চল বলতে সেই সময় গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বা অযোদ্ধার রাজ্যকে বোঝানো হতো। ঠুমরীর সঙ্গে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁর সংগীত জীবন অতিবাহিত করেন নাচ, গান, বাদ্য ইত্যাদির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায়। "ওয়াজিদ আলীর পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই হিন্দুস্থানি মার্গসংগীত, যন্ত্রসংগীত, কত্থক, রাসনৃত্য অওধের (অযোদ্ধার) নবাব সুজাউদ্দৌলার আমল থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা পেতে আরম্ভ করেছিল।"[৪৯] নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ছিলেন বহুমুখী সংগীত প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে কত্থক নৃত্যশিল্পী, সেতারী এবং সংগীত রচয়িতা। গুরু দূর্গাপ্রসাদের নিকট হতে নবাব কত্থক নৃত্যের তালিম নিয়েছিলেন। প্রখ্যাত সেতারী কুতুবউদ্দৌলার কাছ থেকে সেতার বাদনে তালিম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ঠুমরী গান আজও মানুষের মনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁর দরবারে অন্যান্য ধারার সংগীতের সাথে ঠুমরীকে সর্বপ্রথম স্থান দেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। তিনি নিজেও ঠুমরী গানের চর্চা শুরু করেন এবং সেই সাথে অসংখ্য ঠুমরী গানও রচনা করেছিলেন যার মধ্যে একটি বিখ্যাত ঠুমরী হচ্ছে- "যাব ছোড় চালে লক্ষ্ণৌ নগরী"। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নবাবকে নির্বাসন দেওয়ার পরে লক্ষ্ণৌ ছেঁড়ে কলকাতার গঙ্গা তীরবর্তী মেটিয়াবুরুজে যাওয়ার সময় তিনি এই ঠুমরী গান রচনা করেছিলেন। নবাব তাঁর দরবারে ঠুমরীকে স্থান করে দেওয়ার পর তাঁর দরবারের কাওয়ালদের কাছে এই লঘু প্রকৃতির গানের প্রাধান্য দেখা যায়। নানা রাগরাগিণীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ক্রমশ খেয়ালী ঠুমরীর প্রচলন শুরু হয় লক্ষ্ণৌ দরবারে। অন্যদিকে নবাবের দরবারে বহু পাঞ্জাবী খেয়ালীয়াদের আগমন ঘটে যাদের প্রত্যেকেই আবার টপ্পার চর্চা করতেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পাঞ্জাবী খেয়াল গায়কগণ টপ্পার ভাব যুক্ত করে নতুন এক ঠুমরী গানের উদ্ভাবন করে সামগ্র উত্তর ভারতে বিভিন্ন দরবারে এর প্রচার শুরু করেন। এই নতুন ধারার ঠুমরী গান টপ্পা ভঙ্গিম ঠুমরী হিসাবে সকলের নিকট পরিচিতি লাভ করেছিল যার চর্চা শুরু হয়েছিল লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে। এই ধারার ঠুমরী গান অনেকের নিকট টপ্পার ভিন্ন প্রকার হিসাবেও পরিচিত ছিল। নবাব নিজেও ঠুমরী গানের চর্চা করতেন। তিনি তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে একধরনের ঠুমরীর ব্যবহার করতেন যা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন। আর ঠুমরী গানের সেই ধারাটি "কহন ঠুমরী" নামে সকলের কাছে সমাদ্রিত হয়েছিল।

৪৯। তদেব, পৃ. ১২

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ কলকাতার ঠুমরী চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ যখন নির্বাসিত হয়ে মেটিয়াবুরুজে এসে নতুন করে দরবার চালনা শুরু করেন তখন সেখানে লক্ষ্ণৌ দরবারের সংগীতজ্ঞরাও স্থান পান। ফলে সেই দরবারে লক্ষ্ণৌচালের ঠুমরী রীতির অনুশীলন, প্রচার, প্রসার বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে এবং কলকাতায় ঠুমরী গানের চর্চা বিস্তার লাভ করে। ওয়াজেদ আলী শাহ্ কলকাতায় আসার পূর্বেও এখানে ঠুমরী গানের প্রচলন ছিল। কিন্তু, তা শুধু সংগীতানুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই কালে কাশী ও লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজীরা কলকাতায় এসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠুমরী পরিবেশন করতেন। কিন্তু, স্থায়ী ভাবে ঠুমরী গানের চর্চা বা প্রচার-প্রসার কলকাতায় ছিল না। বাঈজীরা যে ঠুমরী গান পরিবেশন করতো সেগুলো "খাড়ী ঠুমরী" অথবা, আসরের ঠুমরী গানের আওতাভুক্ত ছিল। তবে বাঈজীরা এর মধ্যে ঠিক কোন ধারার ঠুমরী গান পরিবেশন করতেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন তথ্য জানা নেই। "ওয়াজিদ আলীর কলকাতায় আগমনের পূর্ববর্তী আমলের বাঈজীরা আসরের ঠুমরী গান না গেয়ে থাকলে, নবাবকেই এদেশে ঠুমরী গানের আদি প্রবর্তক বলা যায়। কারণ তিনিই স্বয়ং উৎকৃষ্ট ঠুমরী গান রচয়িতা ছিলেন এবং তাঁর রচিত কোন কোন ঠুমরী সংগীত জগতে অমর হয়ে আছে। যেমন–'বাবুল মোরা নৈহার ছুট যায়'।"[৫০] ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ঠুমরী গানের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর দরবারের সংগীতজ্ঞরা কলকাতায় ও সমগ্র উত্তর ভারতে এই ধারা চলমান রাখেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে গায়ক- গোলাম হোসেন খাঁ, পীর খাঁ, আলীবক্স খাঁ, তাজ খাঁ, এনায়েত খাঁ, ফজল ইমাম, হায়দার খাঁ, আহম্মদ খাঁ, এনায়েত হোসেন খাঁ প্রমুখ এবং তবলচী নিসার আলী খাঁ, পাখোয়াজী গোলাম মহম্মদ, খাজাবক্স হোসেন খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নবাব তাঁর মেটিয়াবুরুজ দরবার পরিচালনা করেছিলেন দীর্ঘ ৩০ বছর। আর এই সময়কালে তিনি বহু গুণী সংগীতজ্ঞদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর দরবারে। ফলে কলকাতার সংগীতাঙ্গন অধিকতর লাভবান হয়েছিল। "নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি ৬৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আখতার' ছদ্মনামে তিনি বই লিখতেন। 'হুজন-ই-আখতার' গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী।"[৫১]

ওয়াজেদ আলী শাহ্ ও কদর পিয়া (গণপৎ রাও) লক্ষ্ণৌ ঘরানা গঠন করেন। বহু শিষ্য এই ঘরনার গায়নরীতি অনুসরণ করলেও প্রত্যক্ষভাবে প্যারা সাহেব ভিন্ন আর কারো নাম পাওয়া যায় না বলে ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্তী তাঁর ঠুমরী গানের ইতিকথা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ রচিত ঠুমরী গানগুলোর মধ্যে– বাবুল মোরা নৈহার ছুট যায়, নীর ভরণ ক্যায়সে যাউ, যব ছোর চলে লক্ষ্ণৌ নগরী ইত্যাদি বিখ্যাত গানগুলো আজও সংগীত সমাজে সুপরিচিত। বিশেষ ভাবে ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, কাফি, দেশ প্রভৃতি রাগগুলো দ্বারা তাঁর রচিত

৫০। তদেব, পৃ. ১৩

৫১। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১৭৬

ঠুমরী গান বেশি গাওয়া হতো। অন্যদিকে তালের ক্ষেত্রে দীপচন্দী, যৎ, কাহারবা, দাদরা প্রভৃতি তাল সহযোগে নবাবের রচিত ঠুমরী গান গাওয়া হতো। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের আমলে ঠুমরী গানের পাশাপাশি গজল ও টপ্পা শ্রেণির গানেরও বিশেষ প্রচলন বা চর্চা ছিল।

বিন্দাদীন মহারাজ (১৮৩০-১৯১৬)

সংগীত জগতে ঠুমরী গানের একজন স্বনামধন্য কৃর্তিমান সংগীতজ্ঞ হলেন বিন্দাদীন মহারাজ। বিন্দাদীন মহারাজ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে তাঁর পিতা দুর্গাপ্রসাদ বসবাস করতেন। লক্ষ্ণৌ কত্থক নৃত্য ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্দদীন মহারাজের বংশধর পণ্ডিত ঈশ্বরী প্রসাদ মিশ্র। বিন্দাদীন মহারাজের কাকা ছিলেন ঠাকুরপ্রসাদজী, যিনি লক্ষ্ণৌর কত্থকনৃত্য ঘরানার প্রবর্তক। বিন্দাদীন ভ্রাতৃদ্বয় কত্থকনৃত্যে ভারত জুড়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের তিন পুত্রের প্রকৃত নাম হলো- কালিকাপ্রসাদ, বৃন্দাবনপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ভৈঁরো প্রসাদ। বিন্দাদীন তাঁর পিতা দুর্গাপ্রসাদ ও কাকা ঠাকুর প্রসাদের নিকট হতে সংগীতের শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৯ বছর বয়স থেকে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। তিনি একাধারে ৩বছর প্রতিদিন ১২ ঘন্টা করে শুধু "তিগ ধা ধিগ ধিগ" অক্ষর গুলোর সঠিক আওয়াজের অনুশীলন করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২বছর, সে সময়ে ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষ্ণৌর রাজ দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন বিন্দাদীন নবাবের দরবারে উপস্থিত হন এবং সেই সময়ে নবাবের দরবারে নিযুক্ত লক্ষ্ণৌর পাখোয়াজ সম্রাট কুড়াও সিং এর সামনে কাকা ঠাকুর প্রসাদের নির্দেশে পাখোয়াজ বাজিয়ে উপস্থিত সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁর পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান ভ্রাতৃপুত্র আচ্ছান মহারাজকে শিক্ষা দেন। দাদরা, ঠুমরী, গজল, কাওয়ালী, কত্থক, বন্দিশ ইত্যাদি সংগীতের ধারাগুলোর অন্যতম পিঠস্থান ছিল লক্ষ্ণৌ। বিন্দাদীন তাঁর সংগীতের জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে লক্ষ্ণৌ চলে আসেন যা নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের রাজ্য হিসাবে অতি পরিচিত ছিল এবং যেখানে ঠুমরী গানের চর্চার পরিধি ছিল সুবিশাল। মহারাজ বিন্দাদীন যেমন নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিলেন অনুরূপ ভাবে ঠুমরী গানেও তাঁর দক্ষতার কমতি ছিল না। "তিনি তাঁর সংগীত জীবনে প্রায় ১৫০০ ঠুমরী গানের রচনা করেছিলেন।"[৫২] তাঁর রচিত ঠুমরী গানের কাব্যভাব নৃত্যের মাধ্যমে সহজ ভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের রাজত্বকালে ১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়াতে তিনি পিতা দুর্গাপ্রসাদের সাথে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি যান নেপালে এবং সেখান থেকে ভুপালে আসেন। তাঁর প্রতিভার কদর ছিলো

৫২। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকথা*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা:মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬

উভয় স্থানে। "তবে তিনি আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কলকাতার বিখ্যাত গহরজান এবং পাটনার বিখ্যাত জোহরাবাঈ ছিলেন অন্যতমা।"[৫৩] তিনি তাঁর সংগীত জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৯১৮ সালে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মীর্জা সাহেব (১৮৫১-১৯১১)

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পঞ্চম পুত্র আসমান খাঁর সন্তান্দের মধ্যে সর্বকনিষ্ট মীর্জা সাহেব ১৮৫১ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম খুরসেদ মীর্জা। ১৮৫৬ সালে নবাব ওয়াজেদ আলী লক্ষ্ণৌ হতে নির্বাসিত হয়ে কলকাতার গঙ্গা তীরবর্তী মেটিয়াবুরুজে আশ্রয় নিলে মীর্জা সাহেবও সেখানেই পিতা মাতার সাথে চলে আসেন।

পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের পর মীর্জা সাহেব আসরের হারমোনিয়াম শিল্পী হিসাবে তাঁর সংগীত জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটান। মীর্জা সাহেব তাঁর জীবনের ১০ বছর সময় অতিবাহিত করেন জেলেটোলা নামক স্থানে। সে সময় ওস্তাদ বাদল খাঁ এবং জান বাঈয়ের পুত্র খাদেম হোসেন মীর্জা সাহেবের পাশের ঘরেই থাকতেন। মীর্জা সাহেব লক্ষ্ণৌর গণপৎ রাও এঁর মা চন্দ্রভাগা বাঈয়ের নিকট হারমোনিয়াম শিক্ষা গ্রহণ করেন। চন্দ্রভাগা বাঈয়ের সুপুত্র গণপৎ রাও হারমোনিয়াম বাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তিনি যখন কলকাতায় আসতেন তখন মীর্জা সাহেব তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আসরে ঠুমরী অঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতেন।

মীর্জা সাহেব যে শুধু হারমোনিয়াম বাজাতেন তা নয়, সুগায়কও ছিলেন। তিনি ধামার ও হোরী গানের তালিম নিয়েছিলেন উজীর খাঁর কাছে। এছাড়াও ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরীসহ নানা ধরনের গানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আসরে গান গাওয়ার চেয়ে একক পরিবেশনায় বা সঙ্গতে ঠুমরী গানই বেশী বাজাতেন। ঠুমরীর কারুকার্য, মিষ্টত্ব, শৃঙ্গার-রস, বোল-বানাও ইত্যাদি তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল ঠুমরী গানের প্রতি। শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য ধারার চেয়ে ঠুমরী গানের বিভিন্ন চালের মধ্যে বোল-বানাও ঠুমরী গান মীর্জা সাহেবের অধিক পছন্দ ছিল এবং এই চালের ঠুমরীর চর্চা মীর্জা সাহেব বেশী করতেন। গান গাওয়ার চেয়ে হারমোনিয়াম বাজানো তাঁর নিকট প্রিয় ছিল। তাই হয়তো তাঁর বাজনা এত প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর ছিল।

ঠুমরী গানের সুরকে হারমোনিয়ামের দ্বারা প্রকাশ করাকে কেন্দ্র করেই মীর্জা সাহেবের সংগীত জীবন সুসম্পূর্ণ হয়েছিল। ঠুমরী গানের কোমল মায়াবী সুরের মূর্ছনা যেন সর্বক্ষণ তাঁকে ছায়ার মতো আঁকড়ে ধরে রাখে। যেন

৫৩। তদেব, পৃ. ১৬

দরদভরা কথা বলে তাঁর সাথে। মীর্জা সাহেব যখন হারমোনিয়ামে ঠুমরী গান বাজাতে শুরু করতেন তখন ঠুমরী গানে সুরের যে দরদ এবং ভাব তা যেন মীর্জা সাহেবের আঙ্গুলের স্পর্শে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

মীর্জা সাহেব তাঁর সংগীত জীবনে বহু আসরে সংগীত পরিবেশন করেছেন একক বাদন অথবা সংগতকারী হিসাবে। তাঁর সংগীত জীবনে তিনি ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ এবং বিশেষ করে ঠুমরী গানের প্রচার ও প্রসারে যাদের অবদান রয়েছে তাঁদের সাথে সঙ্গত করেছেন। গিরিজাশংকর, মৌজুদ্দিন, আগ্রাওয়ালী মালকাজান প্রমুখ বিখ্যাত ঠুমরী গানের শিল্পীর সাথে মীর্জা সাহেব হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন। এছাড়াও কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি নাট্যমন্দির মঞ্চে একক হারমোনিয়াম বাজিয়ে ছিলেন যেখানে তৎকালীন সময়ের ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। "একবার মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিতে ১৯৩২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর আসর বসেছিল সেখানে গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর গান ও আবেদ হোসেনের তবলা এবং মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়াম বাদন হয়েছিল। সেকালের সংগীত সমাজে এই ভাবে সুপরিচিত ছিলেন মীর্জা সাহেব।"[৫৪]

মীর্জা সাহেব তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন বোল-বানাও রীতির ঠুমরী গানে হারমোনিয়াম বাদনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ৬০বছর বয়সে মীর্জা সাহেব তাঁতিবাগানে মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি তাঁতিবাগানে কাটিয়েছিলেন।

গণপৎ রাও (১৮৫২-১৯২০)

গণপৎ রাও ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সংগীত জগতে তিনি ভাইয়া সাহেব নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজা জিয়াজি রাওয়ের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম চন্দ্রভাগা বাঈ। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ বাসিনী সংগীতজ্ঞ। জিয়াজি রাওয়ের দুই পুত্রের মধ্যে গণপৎ রাও ছিলেন কনিষ্ট এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাইয়া বলবন্ত রাও গোয়ালিয়রের রেভিনিউ মিনিস্টার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বীণকার ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ ছিলেন গণপৎ রাওয়ের প্রথম সংগীত শিক্ষক। বাল্যকালে গণপৎ রাও তাঁর নিকট হতে কণ্ঠসংগীত ও বীণাবাদন শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি কিরাণা ঘরানার ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ এবং ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ প্রমুখের নিকট হতে সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ এবং ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ দুজনেই গোয়ালিয়র ঘরানার প্রখ্যাত ওস্তাদ হদ্দু খাঁর শিষ্য ছিলেন। গণপৎ

৫৪। তদেব, পৃ. ২০

রাও ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে বেশ পারদর্শী ছিলেন। সেসময়ে গোয়ালিয়রের রাজসভায় বিখ্যাত ওস্তাদগণের আগমন ছিল। এইসকল সংগীতজ্ঞদের সান্নিধ্যে এসে তিনি খেয়াল ও ধ্রুপদের শিক্ষা খুব যত্নসহকারে অর্জন করতে পেরেছিলেন। গণপৎ রাওয়ের ধ্রুপদের ভাণ্ডার ছিল অনেক সমৃদ্ধ। তাঁর ভাণ্ডারে অনেক পুরাতন ধ্রুপদ ছিল যা তাঁর সমসাময়িক সংগীতজ্ঞদের নিকট ছিল না বা তাঁরা গাইতেনও না। ভাইয়া সাহেবের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল ঠুমরী গান গায়ন ও বাদনে। ঠুমরী গানের অতি সূক্ষ্ম কলাকৃতি গণপৎ রাও সুনিপুণভাবে হারমোনিয়ামে প্রদর্শন করতেন। বিশ্বে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে হারমোনিয়াম যন্ত্রটির আবিষ্কার হয়। পরবর্তীকালে ফ্রান্স থেকে ভারতবর্ষে হারমোনিয়াম আমদানি করা শুরু হয়। যার নাম ছিল 'বুশী ফ্লুট'। কালের বিবর্তনে হারমোনিয়ামের গঠন প্রণালীতে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে, ফলে বর্তমানে "বুশী ফ্লুট" হারমোনিয়ামের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ভাইয়া সাহেব হারমোনিয়াম নামক বাদ্যযন্ত্রটির সাথে প্রথম পরিচিত হন কলকাতায় এসে। ধীরে ধীরে তিনি হারমোনিয়ামের বাদনশৈলীতে এতোটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁর কণ্ঠসংগীতের সকল অর্জন তিনি হারমোনিয়ামের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি হারমোনিয়াম নামক বাদ্যযন্ত্রটিকে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ঠুমরী গানের অন্যতম সহকারী বাদ্যরূপে।

গণপৎ রাও গোয়ালিয়র ছাড়ার পর দাতিয়ায় যান এবং বেশ কিছু বছর অতিবাহিত করেন। ভাইয়া সাহেব গোয়ালিয়র ত্যাগ করার পরে মৃত্যুর আগপর্যন্ত আর কখনো গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন নি। গণপৎ রাও একজন গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি অন্য গুণীকেও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। গোয়ালিয়রের রাজসভায় প্রায়শই বিভিন্ন জলসার আয়োজন করা হত। সেখানে গণপৎ রাওসহ আরও অনেক সংগীতজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করতেন।

> "গোয়ালিয়র থাকাকালীন সময় একটি জলসায় হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে একটি কঠিন তানকর্তব তুলেছিলেন কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ না করতে পেরে বললেন– যদি কেহ আমার এ তানকর্তব শ্রবণে তৎক্ষণাৎ আমার নকল করিয়া শুনাইতে পারেন তাহা হইলে এই জলসায় আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব এবং গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এক হাজার টাকা দিব।"[৫৫]

উক্ত সভায় অন্যান্য বহু গুণী সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হদ্দু খাঁর জামাতা এনায়েৎ হোসেন খাঁ। এক পর্যায়ে যখন কেউ গণপৎ রাওয়ের প্রস্তাবে সাহস করলেন না তখন ভাইয়া সাহেবের সেই কঠিন তানকর্তব তিনি অনুরূপ ভাবে করে দেখান। অতঃপর সকলের উপস্থিতিতে গণপৎ রাও তাঁর কথা মতো এনায়েৎ হোসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং এক হাজার টাকা ইনাম দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবকে ওস্তাদ হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন।

৫৫। তদেব, পৃ. ২১

দাতিয়ায় বেশ কয়েক বছর কাটানোর পর গণপৎ রাও লক্ষ্ণৌ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন লক্ষ্ণৌ আসেন তখন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র দরবারের সভাগায়ক ছিলেন লক্ষ্ণৌর ঠুমরী সম্রাট খ্যাত ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ। নবাব ওয়াজেদ আলীকে যখন ইংরেজরা বন্দী করে এবং বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে নির্বাসিত করে তখন নবাবের সাথে ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁও কলকাতার মেটিয়াবুরুজে গমন করেন। ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ পরবর্তীকালে কলকাতা ছেড়ে পুনরায় লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসলে গণপৎ রাও তাঁর নিকট সংগীতের তালিম নেন। একবার নবাব ঠাকুর আলী এবং তাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ হোসেন গণপৎ রাওয়ের সাথে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তবে তাঁরা (গুরু-শিষ্য) দুজনেই পরাজিত হন এবং ভাইয়া সাহেবের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাটনা থাকাকালীন সময়ে ভারত বিখ্যাত গায়িকা জোহরা বাঈ তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। গণপৎ রাওয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে ঠুমরী গানের ক্রমবিকাশে অন্যতম অবদানকারী মৌজুদ্দিন খাঁও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও গণপৎ রাওয়ের কাছে ধ্রুপদ ও ঠুমরী গানের তালিম গ্রহণ করেন জগৎ বিখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর পিতা ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ। তিনি ইন্দোর ঘরানার বশির খাঁ এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীকেও ঠুমরী গানের শিক্ষা দান করেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ ভাইয়া সাহেবের প্রভাবে জনসম্মুখে ঠুমরী গান পরিবেশন শুরু করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন– শ্যামলাল ক্ষেত্রী, বসির খাঁ, জঙ্গী খাঁ, সোহনী সিং, ইরসাদ, গফুর খাঁ, নূরজাহান বাঈ প্রমুখ।

ঠুমরীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গণপৎ রাও সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, বীণা, হারমোনিয়াম প্রভৃতির চর্চা ও পরিবেশনের পাশাপাশি তিনি অনেক ঠুমরী গানের রচনা করেছিলেন যা ঠুমরী গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। গণপৎ রাও রচিত অনেক ঠুমরী গান বর্তমান সময়ের শিল্পীরা গেয়ে থাকেন। "তাঁর গানের ভনিতা 'সুঘর পিয়া'। যত ঠুমরী এবং তেতালা "সুঘর পিয়া" ভনিতা যুক্ত আজকাল দেখতে পাওয়া যায় তার সবই গণপৎ রাও এর রচিত।"[৫৬] রামপুরের নবাব হামেদ আলী খাঁর সাথে গণপৎ রাও কলকাতা থেকে রামপুরে আসেন। তখন রামপুরে ভাইয়া সাহেবকে কেন্দ্র করে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত মজলিস বসতো। তৎকালীন সময়ের ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এবং ঠুমরী গানে অসামান্য অবদানকারী পণ্ডিত গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব ১৯২০ সালে ঢোলপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ১বছর সময় তিনি ঢোলপুরে অতিবাহিত করেছিলেন।

৫৬। তদেব, পৃ. ২২

ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ

মৌজুদ্দিন খাঁ ছিলেন বোল বানাও ঠুমরী গানের একজন অন্যতম বিরল প্রতিভার অধিকারী। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ১৮৮২ সালে তাঁর জন্ম হয় হিমাচল প্রদেশের নাহন নামক স্থানে এবং ১৯২৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। "আবার কারো মতে তিনি আনুমানিক ১৮৭৮-১৮৭৯ সালে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮-২৯ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন।"[৫৭] মৌজুদ্দিনের পিতার নাম গোলাম হোসেন ও মাতার নাম জেবুন্নেসা। মৌজুদ্দিন খাঁর বাবা গোলাম হোসেন ও কাকা রহমত হোসেন ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী। তাঁর জননী জেবুন্নেসা ছিলেন পাতিয়ালা ঘরানার সুলাহ খানের মেয়ে। গোলাম হোসেনের দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের মধ্যে মৌজুদ্দিন ছিলেন সবার বড়। পিতা গোলাম হোসেন ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক।

মৌজুদ্দিন খাঁর পরিবারের সংগীতমুখর পরিবেশ বাল্যকাল থেকেই মৌজুদ্দিন খাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সংগীতের প্রতি। সেই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় তাঁর সংগীত শিক্ষা। সংগীত চর্চার হাতেখড়ি শুরু হয় পিতার নিকট হতে। পিতা গোলাম হোসেন শুরু থেকেই মৌজুদ্দিনকে উচ্চতরের গায়ক তৈরি করার জন্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সংগীতের তালিম দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে মৌজুদ্দিন পরিবারে বহু সংগীত গায়কের আনাগোনা ছিল বলে গায়িকা না হওয়া সত্বেও মৌজুদ্দিন খাঁর মায়েরও অনেক বন্দিশ ও সংগীত জ্ঞান তৈরি হয়েছিল। সংগীত শিক্ষায় অগ্রসর হতে থাকা মৌজুদ্দিন খাঁর বয়স যখন ১৪ কি ১৫ তখনই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তবে মায়ের তৎপরতায় মৌজুদ্দিন খাঁর সংগীত শিক্ষা অব্যাহত ছিল। মায়ের এই প্রচেষ্টার ফলেই মৌজুদ্দিন খাঁ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসাবে বিবেচিত হন।

তৎকালীন সময়ে বারাণসী, রাগসংগীতের এক মহাপীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীতগুণীর সমাগম হতো। যার কারণে বহু দিকপাল সংগীতজ্ঞের নিকট হতে মৌজুদ্দিন খাঁ সংগীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। মৌজুদ্দিন খাঁ, গণপৎ রাও ছাড়াও বড়ে দুন্নি খাঁ, হদ্দু খাঁর পুত্র খেয়াল গায়ক রহমত খাঁ প্রমুখ সংগীতজ্ঞের নিকট তালিম নেন। ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ তাঁর জীবনে উচ্চস্তরের সংগীত শিক্ষা লাভ করেন গনপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) এরঁ নিকট। ডঃ অঞ্জলি চক্রবর্তী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে –

> "একদিন বিকালবেলা কাশীর গঙ্গার ধারে বসে মৌজুদ্দিন মনের আনন্দে 'অব হারি নদীয়া, পান খায়ে মুখ লাল কিয়ো', এই ঠুমরীটি গাইছিলেন এমন সময় গনপৎ রাও এরঁ এক প্রিয় শিষ্য শ্যমলাল ক্ষেত্রী তখন কাছেই কোথাও ছিলেন। তিনি গান শুনে মৌজুদ্দিনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কাছে গিয়ে আলাপ করেন। তাঁর তরুণ বয়স দেখে গুরুজী গনপৎ রাও এর কাছে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন। নব নব শিক্ষায় অভিজ্ঞতায় তাঁর সংগীত জীবনের পুষ্পিত পর্যায় আরম্ভ হল। আচার্য

৫৭। তদেব, পৃ. ৩৩

ভাইয়া সাহেবের (গনপৎ রাও) বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঠুমরীতে। অবশ্য ধ্রুপদ-খেয়ালেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি আসরে আসরে ঠুমরী অঙ্গে বাজাতেন হারমোনিয়াম। লচাও ঠুমরীর প্রবর্তক রূপে কথিত আছেন ভাইয়া সাহেব। মৌজুদ্দিনও তাঁর প্রভাবে ঠুমরী গায়ক হিসাবেই বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।"[৫৮]

সংগীত জগতে মৌজুদ্দিন খাঁ যখন নবাগত সংগীত শিল্পী হিসাবে বিবেচিত, তখন বারাণসীর প্রকৃতিতে সংগীত বিরাজমান ছিল। দিনের পর দিন বিধিবদ্ধ চর্চার মাধ্যমে কিশোর মৌজুদ্দিনের সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে খেয়াল, ঠুমরী প্রভৃতির মতো মনোরঞ্জনকারী রসালো সুরধ্বনি। অভাবনীয় সমৃদ্ধি আর অতিশয় মিষ্টতায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর সুললিত মধুর কণ্ঠে ধরা দিতে থাকে ঠুমরী গান এবং খেয়ালের তান বিস্তার ।

পরবর্তীকালে গনপৎ রাও, শ্যামলাল ক্ষেত্রী এবং মৌজুদ্দিন খাঁ কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কুড়ি বছর বয়সী মৌজুদ্দিন পণ্ডিত গনপৎ রাও এঁর সান্নিধ্যে এসে উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্পর্কে অধিক জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে গনপৎ রাও কলকাতার সংগীত সমাজকে উপহার দেন এক অকল্পনীয় সংগীত প্রতিভার অধিকারী উদীয়মান শিল্পী মৌজুদ্দিন খাঁকে। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র ও প্রতিভার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় কলকাতা। তৎকালীন সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে কলকাতা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন স্থান ছিল না যেখানে ঠুমরী গানের চর্চা, প্রচার, প্রসার ও মূল্যায়ন হতো। ঠুমরী গুণীদের যথাযথ সম্মানপূর্বক সমাদরের অন্যতম স্থান ছিল কলকাতা। সম্ভবত সে জন্যই মৌজুদ্দিন খাঁ কলকাতাতেই অধিক সময় অতবাহিত করতেন।

"মৌজুদ্দিনের গান আর গনপৎ রাও এর হারমোনিয়াম বাদন কলকাতার আসরে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। কথিত আছে যে, মৌজুদ্দিন যখন গান করতে বসতেন তখন ওঁর উপর মুসিকের সৈয়দ ভর করত। মুসিক অর্থ সংগীত, সৈয়দ বলতে কল্যাণকামী ব্যক্তির আত্মা বুঝতে হবে। মৌজুদ্দিনের বহু গান মানুষের মনে গাথা আছে। তাঁর মুখে 'কহি মধুর মুরলী ধুন বাজি রে', 'শ্যাম তেরে নয়না হো রঙ্গিলে', 'ইঠলাতি আতি নাচক লচক', 'মুরলী ওয়ালে শ্যাম', 'ও হর দিখলায়া যা বাঁকে সমলিয়া', এ কয়টি ঢিমা তালের ঠুমরী গানের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, তার জোর তখন আর কারুর কাছে শোনা যায় নি।"[৫৯]

মৌজুদ্দিন খাঁ ঠুমরী-খেয়াল গানের তুলনায় গজল ও দাদরা গান কম গাইতেন। তারঁ সুমধুর কণ্ঠস্বর, দূর্লভ স্বরমাধুর্য ও রসসৃষ্টির দ্বারা আসর মাত করার শক্তির জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে তাঁর কয়েকটি গান রেকর্ড হয়েছিল। যার মধ্যে– রঙ দেখ জিয়া ললচায় (ভৈরবী ঠুমরী), পিয়ার মোরি আখিয়া রাজা হমসে না বোলো (খাম্বাজ দাদরা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫৮। তদেব, পৃ. ৩৪
৫৯। তদেব, পৃ. ৩৬

তিনি তাঁর সংগীত কর্মজীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছেন কলকাতায় যেখানে তাঁর সংগীতের পেশাগত জীবনের সূচনা হয়েছিল। বড়বাজার, বৌবাজার, জোড়াসাঁকোর দমদমের বিভিন্ন বাগান বাড়ির সংগীত আসরে মৌজুদ্দিনের গান দীর্ঘকাল সংগীত সমাজের অঙ্গরূপে সমাদৃত ছিল। বারাণসীতে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী থাকতেন বলে মাঝে মাঝে তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। এছাড়া কলকাতায় তাঁর এক জীবনসঙ্গিনী বাস করতেন। তাদের এক পুত্র সন্তান ছিল যার বয়স ৭ বছর থাকা কালীন মৌজুদ্দিন খাঁ মৃত্যুবরণ করেন।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী (১৮৬৫-১৯২৮)

কলকাতার সংগীত সমাজে প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও সংগীতানুরাগী হিসেবে সুপরিচিত মিষ্টভাষী শ্যামলাল ক্ষেত্রী ১৮৬৫ সালে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ঈশ্বর বন্দনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে ছিলেন। সংগীত চর্চা এবং ঈশ্বরের উপাসনা করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। শ্যামলাল ক্ষেত্রী কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন আনুমানিক ১৮৭৪ সাল থেকে। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি সংগীতের চর্চা চলমান রাখেন। শ্যামলালের সংগীত শিক্ষার সূচনা ঘটে মথুরায় অবস্থানকালে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গণেশীলাল চৌবের নিকট হতে সেতার শিক্ষার মাধ্যমে। তবে পরবর্তীকালে তিনি গোয়ালিয়রের গণপৎ রাও সাহেবের কাছে ঠুমরী অঙ্গের হারমোনিয়াম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংগীত সমাজে সুনাম অর্জন করেন।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী নিজে যেমন সংগীত সাধনায় মগ্ন ছিলেন তেমনি অনেক সংগীত পিপাসুকে সংগীত শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন যাঁরা পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, শেঠ দুলিচাঁদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সাথে যখন দুলিচাঁদ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন দুলিচাঁদবাবু সংগীত শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার দরুণ তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় সব সংগীতজ্ঞদের দুলিচাঁদের বাড়িতে নিযুক্ত করেছিলেন শ্যামলাল ক্ষেত্রী। তাঁদের মধ্যে আলিয়াফত্তু, মিঞাজান, কালে খাঁ, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, ফৈয়াজ খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবকেও দুলিচাঁদবাবুর বাগান বাড়িতে নিযুক্ত করেছিলেন শ্যামলাল। এর ফলে বহু গুণীশিল্পী ওস্তাদ বাদল খাঁর নিকট তালিম গ্রহণ করেন। এছাড়াও শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৌজুদ্দিন খাঁ এবং গিরিজাশংকর চক্রবর্তীকে ঠুমরী গানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণপৎ রাও সাহেবের কাছে নিয়ে আসেন এবং নিজ বাড়িতে রেখে সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানকালে এরকম সংগীত অনুরাগীর সন্ধান পাওয়া বেশ কঠিন।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী প্রসিদ্ধ ছিলেন হারমোনিয়ামে বিভিন্ন রাগরাগিণীর পাল্টা বাজানোতে। তাঁর এই প্রতিভার কারণে তৎকালীন সংগীতাঙ্গনের প্রসিদ্ধ গায়িকা গহরজান, আগ্রাওয়ালী মালকাজান প্রভৃতি সংগীতগুণী শ্যামলাল ক্ষেত্রীর নিকট হারমোনিয়াম বাদন শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং সংগীতের অন্যান্য ধারার চর্চা করতেন। গুণী এই সংগীতজ্ঞ ১৯২৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬০]

গহরজান (১৮৭৩-১৯৩০)

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে নারী-কণ্ঠে ঠুমরী গানের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা গহরজানের জন্ম হয় ১৮৭৩ সালে, ব্রিটিশ ভারতের কাশীতে এক জার্মান পরিবারে। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম ইলীন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড। তাঁর মা পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হয়ে এডেলাইন ভিক্টোরিয়া থেকে মালকাজান নাম ধারণ করেন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সভায় গায়িকা হিসাবে মালকাজান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের কাছেই গহরজানের সংগীতের তালিম শুরু হয় এবং মাত্র ১০ বছর বয়সে মায়ের সাথে কাশী থেকে কলকাতায় আসেন। গহরজান তাঁর মায়ের কাছ থেকে হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মারাঠি, ইংরেজি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এর ফলে পরবর্তীতে তিনি এসব ভাষার গান সহজেই আয়ত্ত করতে পারতেন। গহরজান রামপুরের ওস্তাদ উজীর খাঁ এবং প্যারা খাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলে তিনি খেয়াল, হোরী, ঠুমরী, দাদরা প্রভৃতি গানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। তবে তিনি তাঁর সংগীত জীবনে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেন ঠুমরী গানের শিল্পী হিসাবে। ঠুমরী গায়িকা হিসাবে তিনি যে স্থানে নিজেকে উন্নিত করেছিলেন, আজ অবধি কেউ তা অধিগ্রহণ করতে পারেনি বলে কথিত আছে। ঠুমরী গান ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গান, নিধুবাবুর টপ্পা, কীর্তন, বিদ্যাসুন্দরের পালা তাঁর কণ্ঠে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

গহরজান কলকাতার গভর্নরের প্রাসাদ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজা-মহারাজার দরবারকে সুরের মায়াজালে অলংকৃত করে বিদেশেও সংগীত পরিবেশন করেছেন। এমদাদ খাঁ এবং গৌরিশঙ্কর মিশ্র তাঁর সহকারী সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। তৎকালীন সময়ে কোন আসরে সংগীত পরিবেশনের জন্য গহরজানের পারিশ্রমিক ছিল ১৫০০ টাকা যা বাঈজীকুলে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। ১৯১৩ সালে কলের গানের প্রথম যুগে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর ৪০টি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেখানে তিনি প্রত্যেকটি গানের শেষে স্বকণ্ঠে বলেছেন, "মাই নেম ইজ গহরজান"।

৬০। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকতা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)

জীবনের অধিকাংশ সময় আভিজাত্যে অতিবাহিত হলেও শেষ বেলায় এসে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় গুণী এই শিল্পীকে। নিজের সর্বস্ব হারিয়ে তাঁকে গ্রামোফোন কোম্পানির মাসোহারা এবং নিখিল বঙ্গ সংগীত বিশেষজ্ঞ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও জহর দত্তের মতো ভক্তবৃন্দের সহায়তায় জীবনের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। জীবনের কঠিন সময় চলাকালীন মহীয়সী এই নারী কলকাতা ত্যাগ করে মহীশুরে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি মাসিক মাত্র দুই হাজার টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণরাজ ওয়ারিয়ারের দরবারের সভা গায়িকার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৬১] ১৯৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণভামিনী (১৮৭০-১৯২২)

খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা গানের প্রসিদ্ধা গায়িকা কৃষ্ণভামিনী ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে গায়িকা এবং নর্তকী হিসাবে তৎকালীন সংগীত সমাজে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কত্থক নৃত্যে তাঁর দখল ছিল অতুলনীয়। তবে গায়িকা হিসাবেই কৃষ্ণভামিনী অধিক জনপ্রিয় ছিলেন। মজলিসে চাহিদা মতো খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, কাজরী, চৈতী, লাউনী ইত্যাদি সব রকমের গান পরিবেশনের সক্ষমতাই তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল গানের একজন বিখ্যাত গায়িকা। তৎকালীন সময়ের গুণী এই সংগীত শিল্পী বেনারস ঘরানার ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র এবং হরিদাস মিশ্রের নিকট সংগীত শিক্ষালাভ করেন। এঁদের মধ্যে হরিদাস মিশ্র ছিল লছমীপ্রসাদ মিশ্রের ছেলে। এছাড়া কালীশঙ্কর মিশ্রের কাছেও কৃষ্ণভামিনী দীর্ঘকাল তালিম নিয়েছিলেন। তবলা, হারমোনিয়াম ও কর্ণেট বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কালীশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে আসরে সারেঙ্গী বাজাতেন আর তিনি দাপটের সাথে খেয়াল, ঠুমরী ও টপ্পা গান গাইতেন।

"বাংলা গানের প্রতি তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। তিনি ২৭টি বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ডের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে। তৎকালে ৩ মিনিটে গাওয়া তাঁর বহু গানের রেকর্ড রয়েছে। তাঁর গানের রেকর্ড সংখ্যা ৪৭টি, যার মধ্যে অধিকাংশই টপ্‌খেয়াল অঙ্গের গান।"[৬২] তখনকার দিনে ৪৭টি গানের রেকর্ড তাঁর জনপ্রিয়তার মাত্রাকে নির্দেশ করে বলে ধারণা করা যায়। উত্তর বঙ্গের রংপুরের এক জমিদার মহাশয় কৃষ্ণভামিনীর জীবনসঙ্গী হিসাবে কথিত রয়েছে। কলকাতায় এসে তিনি কৃষ্ণভামিনীর কাছে আসতেন। তাঁদের এই সম্পর্ক ছিল আমৃত্যু পর্যন্ত। ১৯২২ সাল নাগাদ গুণী এই শিল্পী দেহত্যাগ করেন।

৬১। ড. বিদ্যুৎশিখা মুখোপাধ্যায়, *সঙ্গীতকোষ* (বাসনগাছি : নীলশিখা প্রকাশনী, ২০১৫)

৬২। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকতা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯

ওস্তাদ উজীর খাঁ (১৮৬০-১৯২৭)

ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ উজীর খাঁ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতের রামপুরে এক বিখ্যাত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াজীর খাঁ নামেও পরিচিত। ঊনবিংশ শতকে উত্তর ভারতের ধ্রুপদীয়া ও বীণকারদের মধ্যে ওস্তাদ উজীর খাঁ ছিলেন অন্যতম। ওয়াজীর খাঁর পিতা আমীর খাঁ ছিলেন পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মিয়াঁ তানসেনের বংশধর। আমীর খাঁও একজন উচ্চ মর্যাদার ধ্রুপদীয়া ও বীণকার ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি রামপুরের নবাব কল্‌বে আলী খাঁর দরবারের সভাগায়ক ছিলেন। উজীর খাঁ সংগীতে হাতেখড়ি গ্রহণ করেন পিতার নিকট। উজীর খাঁর মা ছিলেন তানসেনের পুত্র বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সভাবাদক রবাবী কাসেম আলী খাঁর ভাগ্নী। বংশপরম্পরায় সংগীত থাকার ফলে তিনি অল্প বয়সেই বীণাবাদন, ধ্রুপদ গায়ন ও রবাব বাদনে পারদর্শী হয়ে উঠেন তাঁর মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা। আমীর খাঁ মৃত্যুর পূর্বে উজীর খাঁর সকল দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শিষ্য হায়দার আলী খাঁয়ের উপর। গুরুর ইচ্ছায় হায়দার আলী খাঁ গুরু প্রদত্ত সকল শিক্ষা উজীর খাঁকে প্রদান করেন এবং পিতা ইউসুফ আলী খাঁ কর্তৃক জমিদারি প্রাপ্ত হয়ে 'বিলসী' গমনকালে উজীর খাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। নবাব হায়দার আলীর তত্ত্বাবধানে ২৬ বছর বয়সে ওস্তাদ উজীর খাঁ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ওস্তাদ উজীর খাঁ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, নাট্যকার ও চিত্রশিল্পী হিসাবে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। যদিও সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি সুপরিচিত। তিনি অবসর সময়ে সংগীতশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন পুরাণাদি এবং আরবি, ফার্সী ও কিছু ইংরেজি ভাষার চর্চা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি হায়দার আলীর অনুমতি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বের হয়ে কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ নিসার আলী খাঁর নিকট ধ্রুপদ ও রবাব বাদ্যযন্ত্রের যথাযথ শিক্ষা লাভ করেন। নিসার আলীর মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন ইন্দোর দরবারে অবস্থান করার পর নিজামের শহর হায়দ্রাবাদে আসেন এবং সেখান থেকে কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সংগীতগুরু কাশেম আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে 'বঙ্গীয় সংগীত চক্র'-তে তাঁর পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন থাকার পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজের তৎকালীন নবাব তারাপ্রসাদ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি গুণীজন তাঁর সংগীতের ভক্ত হয়ে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ওস্তাদ উজীর খাঁর উপস্থিতিতে কলকাতার সংগীতমহল আলোকিত হয়ে ওঠে। কলকাতায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের কারণে তিনি বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন।

কলকাতায় বেশ কিছু বছর অবস্থানের পর তিনি রামপুরে চলে আসেন। তিনি রামপুরের তৎকালীন নবাব হামিদ আলী খাঁর গুরু হিসেবে নিযুক্ত হন। ওস্তাদ উজীর খাঁ নবাবকে প্রথমে বীণাবাদন এবং পরে হোরী ও ধ্রুপদ শিক্ষাদান করেন। নবাব গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁর দরবারের উপযুক্ত স্থান এবং বেশ কিছু অঞ্চলের জমিদারি দিয়েছিলেন। ওস্তাদ উজীর খাঁ তাঁর সংগীত জীবনে বহু শিষ্য তৈরি করেছেন যারা সংগীত জগতে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের মধ্যে পাঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্র বাবু, সেতার ও সুরবাহার বাদক নাসির আলী, বীণকার মুহম্মদ হুসেন, সংগীতশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, সেতার বাদক আব্দুল রহীম, হাফিজ আলী খাঁ ও সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৩]

উজীর খাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র নজীর খাঁর মৃত্যুতে তিনি খুবই মর্মাহত হন। এর প্রায় তিন বছর পর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রামপুরে ওস্তাদ উজীর খাঁ পরলোক গমন করেন। উপযুক্ত শিষ্য রূপে হাফিজ আলী খাঁ ও আলাউদ্দিন খাঁ তাঁদের প্রতিভাবলে এবং পুত্র সগীর খাঁ ও পৌত্র দবীর খাঁ ওস্তাদ উজীর খাঁর বংশধর রূপে তারঁ নামকে স্মরণীয় করে তুলেছিলেন।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮)

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সংগীত সাধক গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৮৮৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর। তাঁর পিতা ভবানী কিশোর চক্রবর্তী ছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। শিশুকাল থেকেই গিরিজাবাবু কলাবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একাধারে গায়ক, অভিনেতা এবং চিত্রশিল্পী হিসাবে সুপরিচিত। কলাবিদ্যায় অধিক আগ্রহের কারণে ইংরেজি স্কুল ছেড়ে তিনি কলকাতা গভঃ আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে প্রায় ৮বছর অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর অঙ্কিত জলরঙের ছবি ও তৈলচিত্র তৎকালীন বিভিন্ন রাজা-মহারাজার ঘরের শোভাবর্ধন করেছিল। তিনি সংগীতের পাশাপাশি অভিনয় শিল্পী ও চিত্রকর হিসাবেও অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অসামান্য সংগীত প্রতিভার জন্য তিনি পরিচিত ও সমাদৃত হয়েছেন অধিক। গিরিজাশংকর বহরমপুরেই সংগীতের তালিমপ্রাপ্ত হন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট হতে। ধ্রুপদ-ধামারে পারদর্শিতার জন্য তিনি রাধিকাপ্রসাদের নিকট অনেক প্রিয় হয়ে উঠেন। এছাড়াও তিনি দিল্লীর তানসেন বংশীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলী ও ওস্তাদ উজীর খাঁর কাছে হোরি ধ্রুপদ, ওস্তাদ মজফফ্‌র খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল গানের তালিম গ্রহণ করেন। জীবনের

৬৩। ড. বিদ্যুৎ শিখা মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত

দীর্ঘ সময় তিনি ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল প্রভৃতি ধারার সংগীতের জটিল তত্ত্ব এবং নানাবিধ রাগ, তাল, বোলতানের বিশুদ্ধ চর্চা করেছেন। তবে গিরিজাবাবু বিশেষভাবে পরিচিত ও সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ ঠুমরী গায়ক হিসাবে। কলকাতায় থাকাকালীন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সাথে গিরিজাশংকরের পরিচয় হয় এবং কিংবদন্তী ঠুমরী গায়ক হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ পান। শ্যামলাল ক্ষেত্রী তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন গণপৎ রাও সাহেবের সাথে। গিরিজাশংকর ভাইয়া সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শ্যামলাল ক্ষেত্রীর ১০১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতেই ঠুমরী গানের তালিম শুরু করেন। এই সময় মৌজুদ্দিন খাঁর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং মৌজুদ্দিনের সহায়তায় ঠুমরী গানে প্রসিদ্ধ হন।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর শিষ্যের মধ্যে এ.কানন, আরতি দাস, বিনোদ কিশোর রায় চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, পান্নালাল ঘোষ, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, যামিনী গাঙ্গুলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়িতেই ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৫শে এপ্রিল তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি একদিকে যেমন সংগঠক, সমালোচক তেমনি সংগীত শিক্ষক ও সুগায়কও ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসারে গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য।[৬৪]

ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ

ঠুমরী গানের এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব। পিতৃসূত্রে পাঞ্জাবী হলেও তাঁর কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে যে কেউ ধরেই নিবে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি। ছোটবেলা থেকেই কলকাতায় বসবাসের কারণে তাঁর এই পরিবর্তন। পিতা বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক মসিদ খাঁ আম্বালাওয়ালে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে সপরিবারে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁর জন্ম হয়।

বড় ভাই গোলাম জানের নিকট ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁর সংগীতের হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে পিতার নিকট ধ্রুপদ এবং ওস্তাদ বাদল খাঁর নিকট খেয়াল গানের তালিম গ্রহণ করেন। তিনি ঠুমরী গানের তালিম গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ঠুমরী গায়িকা গহরজানের নিকট এবং পরবর্তীকালে ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁর নিকট। ঠুমরী গানের শিল্পী হিসেবেই তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভারতীয় সংগীত জগতে। ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁর

৬৪। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকতা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)

ঠুমরী ও দাদরা শৈলীর গায়কির প্রভাব ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁর গায়কিতেও অধিক লক্ষণীয়। তাঁর ঠুমরী গানের ভাণ্ডার ছিল বেশ সমৃদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ জমীরউদ্দিন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ সম্পর্কে বলেছেন যে, "জমীরউদ্দিন খান সাহেব ছিলেন খানদানী গাইয়ে। তিনি ঠুম্‌রীসম্রাট। ওস্তাদ মৈজুদ্দীন খানের পর তাঁর মত ঠুম্‌রী গাইয়ে আর কেউ ছিল না।"[৬৫] কর্মজীবনে তিনি এইচ.এম.ভি. কোম্পানীর সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম গানের মাঝে বিরতি দিয়ে যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ শুরু করেন। যা ইন্টারলিওড নামে পরিচিত হয়েছে এবং সংগীতকে করেছে বৈচিত্র্যময়। অসাধারণ প্রতিভাবান এই শিল্পী ১৯৩২ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬]

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ (১৯০৩-১৯৬৮)

ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতে যিনি চির অমর হয়ে আছেন তিনি হলেন বিখ্যাত পাতিয়ালা-কাসুর ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব। লাহোরের এক সংগীত পরিবারে ১৯০৩ সালে খাঁ সাহেবের জন্ম হয়। পরিবারে তাঁর পিতা আলী বক্স এবং কাকা কালে খাঁ সংগীত চর্চা করতেন। সংগীতের তালিম গ্রহণের ক্ষেত্রে কাকা কালে খাঁ ছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর প্রথম ও শেষ গুরু। প্রথম জীবনে অর্থ উপার্জনের জন্য সারেঙ্গী বাজাতেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন সংগীত চর্চা করে। তিন সপ্তকেই সাবলীলভাবে স্বর চালনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর গায়কিতে তান, সরগম, বোলতান, লয়কারি প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সবরঙ্গ' ছদ্মনামে তিনি বন্দিশ রচনা করতেন এবং নিজেই পরিবেশন করতেন। ভরপুর হরকতের প্রয়োগে ঠুমরী, দাদরা পরিবেশনকালে তিনি শ্রোতাদের চমকে দিতেন। কণ্ঠের উপর তাঁর এতই দখল ছিল যে, গান গাওয়ার সময় তিনি যা ইচ্ছা তাই প্রয়োগ করতে পারতেন। তিনি যে সকল ঠুমরী গান গাইতেন তার অধিকাংশই পাঞ্জাবী ঠুমরী। তিনি শ্রোতার মনোরঞ্জনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাদের চাহিদা মতো হালকা চালের গান পরিবেশন করে তিনি সবসময় আসর মাতিয়ে রাখতেন। তাঁর বিখ্যাত ঠুমরী গানগুলোর মধ্যে – কা কারু সাজনী আয়ে না বালাম, আজা বালম পরদেশি, সাইয়া বলো তানেক মোসে, প্রেম মগন জীয়রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬৫। তদেব, পৃ. ৫৫

৬৬। https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%81

তিনি তাঁর জীবনে বহু শিষ্য তৈরি করেছেন যাঁরা পরবর্তীকালে সংগীত জগতে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে পুত্র মুনাব্বর আলী খাঁ, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবাদপ্রতীম এই শিল্পী শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত হন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৮ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেগম আখতার (১৯১৪-১৯৭৪)

বেগম আখতারের জন্ম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার ভারতকুণ্ড শহরে। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংগীত জগতের একজন স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ। তাঁর প্রকৃত নাম আখতারি বাঈ ফৈজাবাদী। বেগম আখতারের পিতার নাম ছিল আসগর হুসেন যিনি পেশায় ছিলেন একজন উকিল। মায়ের নাম মুসতারি। বাল্য বয়সেই বেগম আখতারের পিতা তাঁকে এবং তাঁর বোনকে পরিত্যাগ করেন। তাই শৈশবকাল থেকেই তাঁকে জীবিকা নির্বাহের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। সংগীতের প্রতি অধিক আগ্রহের জন্য মা মুসতারি, তরুণী বেগম আখতারকে সাথে নিয়ে চলে আসেন কলকাতায় উপযুক্ত গুরুর খোঁজে। পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ মহম্মদ খানের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলে বেগম আখতার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি কিরাণা ঘরানার বরকৎ খাঁ, ওয়াহিদ খাঁ এবং পাতিয়ালা ঘরানার বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ করেছেন।

বেগম আখতার প্রথম জনসম্মুখে তাঁর সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি দাদরা, কাজরী, লোকগীতি ইত্যাদি গাইতেন। কিন্তু তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ঠুমরী, গজল এবং রাগ প্রধান বাংলা গানের মাধ্যমে। 'কোয়েলিয়া মত কর পুকার' ঠুমরী গানের মাধ্যমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষে। তাঁর গানের আবেদন ছিল ভিন্নরকম। একান্তই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি। প্রথাগত সংগীত শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই সংগীতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে ঠুমরী, দাদরা, গজল, কাজরী ইত্যাদি গানের মাধ্যমে হাজারো শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিলেন গুণী এই শিল্পী। ৬০ ও ৭০ এর দশকে মেগাফোনের অসংখ্য রেকর্ড এবং বিভিন্ন আসরে সংগীত পরিবেশন করে তিনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। জীবনসঙ্গী হিসেবে তাঁর জীবনে অগমন ঘটে লক্ষ্ণৌর নবাব বংশের পুত্র ইস্তিয়াক সাহেবের। তারপর থেকেই অখতারি বাঈ থেকে বেগম আখতার নামকরণ হয়। স্বামীর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সকল বাধা অতিক্রম করে সংগীত জগতে ফিরে এসেছিলেন। বহু ঠুমরী, গজল, দাদরা ও রাগপ্রধান বাংলা গান তিনি রেকর্ড করেছিলেন। অগণিত বাঙালিকে তিনি উপহার দিয়েছেন– ফিরায়ে দিও না মোরে শূন্য হাতে, কোয়েলিয়া গান থামা এবার, চুপি চুপি

চলে না গিয়ে, জোছনা করেছে আড়ি, ফিরে কেন এলে না প্রভৃতি বিখ্যাত গান। কিরাণা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্যা হয়েও তিনি কখনো আসরে খেয়াল গান পরিবেশন করেননি। তাঁর ঠুমরী গানের পদবিস্তার ও গজলের আলফাজ শুনলেই বোঝা যায় খেয়াল গানে তাঁর পারদর্শিতা কতখানি।

বেগম আখতার শুধু গায়িকাই ছিলেন না, বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে– কিং ফর অ্যা ডে (১৯৩৩), মুমতাজ বেগম (১৯৩৪), জাওয়ানিকা নেশা, আমিনা, রূপকুমার (১৯৩৫), নসিব কা চক্কার (১৯৩৬), আনারবালা (১৯৪০), রোটী (১৯৪২), জলসাঘর (১৯৫২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী', ১৯৭২ সালে 'সংগীত নাটক আকাদেমি', এবং ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' পুরস্কারে সম্মানিত হন। গজল গানে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মল্লিকা–ই–গজল' (গজল সম্রাজ্ঞী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৬৭] গুণী এই গায়িকা ১৯৭৪ সালে এলাহাবাদে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শোভা গুর্তু (১৯২৫-২০০৪)

১৯২৫ সালে কর্ণাটকের বেলগাঁওয়ে ঠুমরী গানের প্রতিভাবান শিল্পী শোভা গুর্তু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মেনকাবাঈ শিরোদকর তৎকালে কত্থক নৃত্যশিল্পী হিসেবে বেশ সমাদৃত। বড় বড় সব গায়ক-বাদকদের আনাগোনায় বাড়িতে সব সময় একটি সংগীতমুখর পরিবেশ বিরাজমান থাকতো। তাই ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আগ্রহ অধিক ছিল। তাঁর মায়ের গুরু ছিলেন শ্যামলাল ক্ষেত্রী এবং জয়পুরের বিহারীলাল। শৈশবেই মায়ের সাথে কোলাপুরে চলে অসেন শোভা গুর্তু। সেখানে মম্মন খাঁ মেনকাবাঈকে ঠুমরী গানের তালিম দেন। এছাড়াও জয়পুর ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব, তাঁর পুত্র ভুর্জি খাঁ ও ভাইপো নত্থন খাঁর নিকট মেনকাবাঈ সংগীতের তালিম নেন।

মা মেনকাবাঈয়ের নিকট শোভা গুর্তুর গানের হাতেখড়ি হয়। মম্মন খাঁর নিকট ঠুমরী, দাদরা গানের তালিম নেন শোভা গুর্তু। বলা যায়, লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিতটা মম্মন খাঁ সাহেবই পাকা করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও শোভা গুর্তু রাগরাগিণী ও খেয়াল গান শিখেছেন নত্থন খাঁর কাছে। তাঁর গানে জয়পুর আত্রৌলি ঘরানার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধারার গান করলেও তাঁর আত্মতৃপ্তি মিলতো ঠুমরী গানের পরিবেশনায়। তাঁর ঠুমরী গান গাওয়ার বৈশিষ্ট্য হলো বরহত করে স্থায়ীতে ফিরে আসা যা খুব সহজ কাজ নয়। লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত গায়নে তাঁর

৬৭। ড. বিদ্যুৎ শিখা মুখোপাধ্যায়, *সঙ্গীতকোষ* (কলকাতা: নীলশিখা প্রকাশনী, ২০১৫)

কল্পনাশক্তি ছিল প্রখর। শোভাজী পূরব বা পূর্বী অঙ্গের গায়কি অনুসরণ করতেন এবং তাতে নানা স্টাইলের মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠুমরী গান পরিবেশন করতেন। তিনি তাঁর সাবলীল কণ্ঠ ও গায়কির মাধুর্য ছড়িয়েছেন ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই। তিনি ঠুমরী, দাদরা, হোরি, কাজরী, ঝুলা, নাট্যগীত, ভজনের পাশাপাশি প্রচুর গজল গেয়েছেন। তাঁর গজল গানে বেগম আখতারের প্রভাব ছিল অধিক। শোভা গুর্তু তাঁর সংগীত জীবনে অনেক শিষ্য তৈরি করেছিলেন। ঠুমরী গানের এই গুণী শিল্পী ২০০৪ সালে দেহত্যাগ করেন।[৬৮]

গিরিজা দেবী (১৯২৯-২০১৭)

ঠুমরী গানের সমৃদ্ধিতে যুগে যুগে যে সকল সংগীতজ্ঞ আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে গিরিজা দেবী অন্যতম। ১৯২৯ সালে বারাণসীতে গিরিজা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামদাসের উৎসাহে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে গিরিজা দেবীর সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর প্রথম গুরু পণ্ডিত সরযূপ্রসাদ মিশ্র। কণ্ঠ তৈরির জন্য প্রথমে অলংকার, তান ইত্যাদির তালিম দেন এবং এরপর খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা গানের তালিম দিয়েছেন দশ বছর। সরযূপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন বেনারস ও সেনিয়া উভয় ঘরানার ভিজ্ঞ পণ্ডিত। তাই গিরিজা দেবীর গানে এই ঘরানা দুটির পরিপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সরযূপ্রসাদের মৃত্যুর পর গিরিজা দেবী পণ্ডিত শ্রীচন্দ্র মিশ্রের নিকট সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। শ্রীচন্দ্র মিশ্রের কাছে তিনি ধ্রুপদ, ধামার, তারানা, টপ্পাসহ সাদরা, ছন্দ, প্রবন্ধ, গুলনক্স ইত্যাদি বহু পুরোনো গান শিখেছেন।

গুণী এই শিল্পী কখনো স্কুলে যাননি। সংগীত চর্চার পাশাপাশি বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়ালেখা করেছেন। পরবর্তীতে প্রাইভেট বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বেনারসী ঘরানার ঠুমরী গাওয়ার প্রবণতা ছিল অধিক। তাঁর গাওয়া 'রস কী ভরী তোরী ন্যয়না' খুবই জনপ্রিয় একটি ঠুমরী গান। বেনারস ঘরানার ঠুমরী গানে ভাবের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঠুমরী গান ছাড়াও গিরিজা দেবীর কণ্ঠে দাদরা, চৈতী, কাজরী, হোলী প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির গান অধিক শুনতে পাওয়া যায়।

মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৯৫১ সালে গিরিজা দেবী প্রথম আসরে সংগীত পরিবেশন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ডি.ভি. পলুস্কর, বিনায়ক রাও পটবর্ধন প্রমুখ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীবৃন্দ। গিরিজা দেবী সেখানে খেয়াল ও ঠুমরী গান পরিবেশন করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব

৬৮। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকতা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)

মিউজিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সংগীত পরিবেশন করেছেন।[৬৯] সংগীতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি "ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী (১৯৭২), পদ্মভূষণ (১৯৮৯) ও পদ্মবিভূষণ (২০১৬) সম্মাননা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২০১২ সালে সংগীত মহাসম্মান ও ২০১৫ সালে বঙ্গবিভূষণ সম্মাননায় ভূষিত হন।"[৭০] এত সম্মাননা পাওয়া সত্ত্বেও সংগীতের এই মহারথী বলেন শ্রোতাবৃন্দের ভালবাসাই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ পাওয়া। তিনি ২০১৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবাদপ্রতীম এক সংগীতজ্ঞের জন্ম হয়। তাঁর নাম অজয় চক্রবর্তী। কলকাতার শ্যামনগরে ১৯৫৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। অজয় চক্রবর্তীর সংগীত শিক্ষার সূচনা হয় পিতা অজিত চক্রবর্তীর কাছে। প্রতিভাবান এই শিল্পী মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে পালা গান পরিবেশন শুরু করেন এবং তৎকালীন পালাসম্রাট ব্রজেন দে কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি পান্নালাল সামন্তের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। পরবর্তীতে প্রায় দশ বছর খেয়াল ও ঠুমরী গানের তালিম গ্রহণ করেন নৈহাটীর কানাইদাস বৈরাগীর নিকট। সংগীত শিক্ষায় অগ্রগতি দেখে কানাইদাস বৈরাগী তাঁকে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে হস্তান্তর করেন। দুই বছর পূর্ণ হতে না হতেই জ্ঞানবাবু আমেরিকায় চলে যান এবং অজয় চক্রবর্তীর সংগীত শিক্ষার ভার দিয়ে যান ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর পুত্র ওস্তাদ মুনাব্বর আলী খাঁর উপর। মুনাব্বর আলী খাঁর কাছেই অজয় চক্রবর্তী নাড়া বাঁধেন এবং তাঁর সংগীত শিক্ষা অব্যাহত রাখেন।

সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষায়ও সফলতা অর্জন করেন। খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা, ভজন ও রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পী হিসেবে তিনি সমগ্র ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গায়কি পাতিয়ালা ঘরানার। তিনি যে ঠুমরী গানগুলো গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তার মধ্যে – ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর বিখ্যাত ঠুমরী– আয়ে না বালাম, অন মিলো সাজনা উল্লেখযোগ্য। রাগপ্রধান গানের ক্ষেত্রে – পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ গীতিকার ও সুরকারের গান গেয়ে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি বহু সিনেমায় গান করেছেন। তাঁর গাওয়া বাংলা গানের মধ্যে, সবাই আমরা তোমার বাগানে, শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়, কারে বা জানাই বল, পিয়া

৬৯। ডঃ অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকতা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)
৭০। https://bn.wikipedia.org/wiki/

ভোল অভিমান, রাঙালে যারে এ ফাগুনে, পোহালো পোহালো নিশি, আমি সুরে সুরে ওগো তোমায় ছুয়ে যাই, গুঞ্জন মঞ্জির পায়, যে আকাশে ঝরে বাদল, ভোর হলো বিভাবরী ইত্যাদি গানগুলো উল্লেখয়োগ্য।

গুণী এই শিল্পী বর্তমানে সংগীত রিসার্চ একাডেমির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। এর পাশাপাশি তিনি 'শ্রুতিনন্দন' নামে একটি সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সঠিক পদ্ধতিতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

চতুর্থ অধ্যায়

ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী

ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী

উত্তর ভারতীয় লোকনৃত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মূলত বাঈজীরা ঠুমরী গানের প্রচার শুরু করেন। বাঈজীদের দ্বারা এই গান অধিক পরিবেশিত হতো বলে ঠুমরী নিম্নমানের উচ্চাঙ্গ বহির্ভূত গান হিসেবে বিবেচিত হতো। এই গানের কোন বিশেষ গায়নরীতি, ঘরানা অথবা কাঠামো ছিলনা। ঠুমরী গান তার এই দুরহ অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে কালের পরিক্রমায় এবং স্থান করে নিয়েছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে। রাজদরবারের সংগীতজ্ঞদের নজরে পড়ে ঠুমরী গানের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে ব্যাপক হারে। সৃষ্টি হয়েছে এই গানের একটি নিজস্ব গায়নরীতির। স্থান অনুযায়ী ঠুমরী গানের চর্চার ধরন ভিন্ন হওয়ার কারণে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ঘরানা। ঠুমরী গানের বিখ্যাত ঘরানাগুলোর মধ্যে লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, বেনারস, কলকাতা কেন্দ্রীক বাংলা ঘরানা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার ঘরানা ভেদে ঠুমরী গানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর দ্বারা কোন ঠুমরী গান কোন ঘরানা দ্বারা প্রভাবিত বা কোন ঘরানার সাথে সম্পর্কিত তা বুঝতে সহজ হয়। সূচনালগ্নে ঠুমরী গানকে প্রধান ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল পাঞ্জাবী ঠুমরী রীতি অন্যটি পূর্বী ঠুমরী রীতি। প্রধান এই দুটি ঠুমরী গানের রীতি হতে পরবর্তীকালে আরও অনেক বিভাজন হয় ঠুমরী গানে। প্রতিটি রীতির ঠুমরী গানে প্রকাশ পেয়েছে নতুন নতুন সব বৈশিষ্ট্যের। ঠুমরীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রভাবিত করেছে তার গায়নশৈলীকে। ঠুমরী গানের গায়নশৈলীর বিভিন্ন উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ বা ব্যবহার ঠুমরীর জনপ্রিয়তা অর্জনে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে।

৪.১ ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণিবিভাগ মূলত নির্দিষ্ট কোন কিছুর জাতি, ভাষা, অঞ্চল, গঠনপ্রণালী, আচার-আচরণ, চলন, জীবন ধারা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। যদি সংগীতের কথা ভাবা হয় তাহলে এর প্রধান তিনটি ভাগ রয়েছে। যথাঃ- গীত, বাদ্য ও নৃত্য। আবার এই প্রতিটি ভাগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। গীতের একটি প্রকার হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান প্রকার হলো "ঠুমরী গান"। ঠুমরী গানের প্রকারভেদ নির্দিষ্ট কোন একটি পর্যায়ে করা যায় না। উৎপত্তিগত ভাবে, অঞ্চলভেদে এবং গায়নশৈলীর উপর ভিত্তি করে ঠুমরী গানের শ্রেণিভেদ করা যায়। কালক্রমে অনেক সংগীতগুণী ঠুমরীর এই প্রকারভেদ বা শ্রেণিভেদের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

বিভিন্ন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণের মতানুসারে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পূর্বে ঠুমরী গানের ৩টি প্রকার ছিল। সেগুলো হলো– সরল ঠুমরী (লোকগীতের পর্যায়ভুক্ত), খাড়ী ঠুমরী (নটবরী লোকনৃত্যে প্রযোজ্য) এবং ঘনাক্ষরী ঠুমরী (ঘণ সন্নিবিষ্ট শব্দ সম্ভারে রচিত পদ)। সেই যুগে অর্থাৎ, ওয়াজেদ আলী শাহের পূর্বকালে ভজন প্রকৃতির গানে এক প্রকার সরল ঠুমরীর প্রচলন দেখা যেত এবং আজও তা প্রচলিত রয়েছে। ওয়াজেদ আলী শাহ্ রচিত "যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী" একটি সরল ঠুমরীর উদাহরণ। সরল ঠুমরী সম্ভবত নাচের সাথে ব্যবহৃত হতো না। অত্যন্ত নাগরিক বা অভিজাত নাচের সঙ্গে খাড়ী ঠুমরী এবং ঘনাক্ষরী ঠুমরী গাওয়া হতো।[৭১] এর পরবর্তী সময়ে ঠুমরী গান নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল যার ফলস্বরূপ ঠুমরী গানের দুটি মুখ্য শাখা বা প্রকার সেই সময়কার সংগীত তথা ওস্তাদ মহলে স্বীকৃত হয়েছিল। একটি ছিল পছঁওয়া ঠুমরী বা পশ্চিমা শৈলী ঠুমরী এবং অপরটি পূর্বীয়া ঠুমরী। ঠুমরী গানের এই শ্রেণিবিভাগ নিচে ছক আকারে তুলে ধরা হলো–

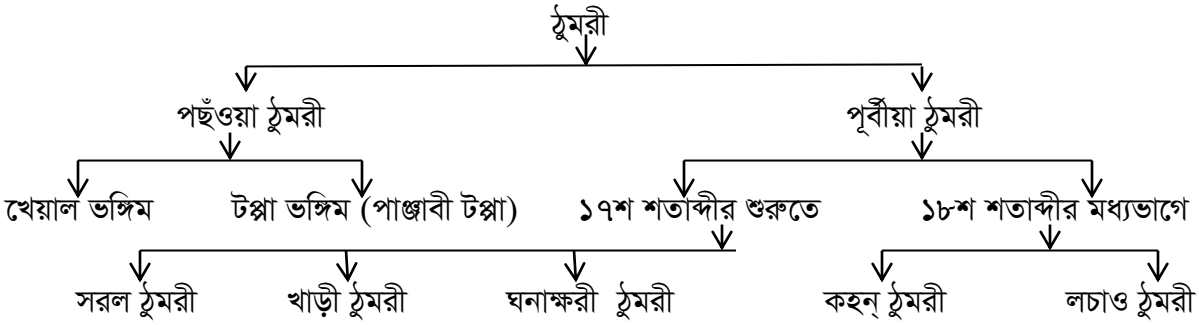

উক্ত ছক অনুযায়ী নিম্নে ঠুমরী গানের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো–

পছঁওয়া বা পশ্চিমা শৈলীর ঠুমরী গান সাধারণত ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে বেশি প্রচলিত ছিল বলে এটি পাঞ্জাবী ঠুমরী নামে অধিক পরিচিত। "টপ্পার সুর প্রভাবিত ঠুমরীকে পাঞ্জাবী ঠুমরী বলে।"[৭২] অন্য দিকে পূর্বীয়া শৈলীর ঠুমরী গান লক্ষ্ণৌ, বারাণসী বা বেনারস, কলকাতায় অধিক চর্চা ও বিকাশ লাভ করেছে। "পাঞ্জাবী ঠুমরী লক্ষ্ণৌ ঠুমরীর মতই, কিন্তু এতে গ্রাম্যগীতের বিশিষ্ট কতক-গুলি অলঙ্কার প্রয়োগ দেখা যায়।"[৭৩]

নবাব ওয়াজেদ আলীর পূর্বেও যে সকল ঠুমরী গানের অস্তিত্ব ছিল সেগুলোর সময়কাল ছিল ১৭০০ শতকের শুরুতে। সে সময়ের প্রচলিত ঠুমরী গানগুলো পূর্বীয়া শ্রেণির ঠুমরী গানের আওতাভুক্ত ছিল। সরল, খাড়ী ও

৭১। ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা, প:ব: রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৪)
৭২। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর* (কলকাতা: সঙ্গীত প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ২৬
৭৩। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১৭৪

ঘনাক্ষরী ঠুমরী ঐ সময়ের ঠুমরী হিসাবে পরিচিত। তবে সে সময়ের ঠুমরী গানগুলো ছিল লঘু প্রকৃতির। কোন প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা বা ওস্তাদ মহল ঐ শ্রেণির গানকে বিশেষ মূল্যায়ন করতেন না।

৪.১.১ খাড়ী ঠুমরী

নৃত্যের সাথে ঠুমরীর একটি সম্পর্ক আছে একথা অনেকেরই ধারণা। তাঁদের মতে নাচের 'ঠমক' থেকেই ঠুমরী শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। সূচনালগ্নে সমগ্র উত্তর ভারতের বিশেষ এক শ্রেণির বাঈজীরা এক প্রকার গান করতেন যা পরবর্তীকালে ঠুমরী গান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। তারা সেই গান নৃত্য সহযোগে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করতেন বলে এই শ্রেণির গানকে খাড়ী ঠুমরী বলা হয়। সংগীতজ্ঞদের মতে, ঐ খাড়ী ঠুমরী-ই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান কালের ঠুমরী গানের রূপলাভ করেছে এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি বিশেষ ধারায় বা গায়নরীতিতে সুপরিচিতি ও মর্যাদা লাভ করেছে। তবে খাড়ী ঠুমরীর যুগে যে সকল বাঈজী বা মহিলারা এই গান করতেন তাদের সংগীতের কোন জ্ঞান বা তাল, লয়, সুর, স্বর, ছন্দ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা ছিল না। তারা শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের বিনিময়ে এই গান করতেন এবং বিভিন্ন শারীরিক অসঙ্গতিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন পূর্বক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন। খাড়ী ঠুমরীর সাথে যে নৃত্য প্রদর্শন করা হতো তা 'নটবরী নৃত্য' হিসাবে পরিচিত ছিল। এই নটবরী নৃত্য ছিল উত্তর ভারতের লোকনৃত্যের পর্যায়ভুক্ত।[৭৪]

৪.১.২ সরল ঠুমরী

সরল ঠুমরী সম্পর্কে তেমন কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সরল ঠুমরী যে উত্তর ভারতের লোকগীত বিশেষ, সে কথা অনেক সংগীতগুণীর ধারণা। সংগীত শাস্ত্রীগণের মতে, সেই যুগে অর্থাৎ ১৭শ শতকে সরল ঠুমরীর প্রচলন দেখা যেত ভজন প্রকৃতির গানের মধ্যে। আজও তার প্রচলন আছে বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রকার ঠুমরী গানে মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ, দুখ-কষ্টের কথা বেশি বর্ণিত হতো। তবে নৃত্যের সাথে সরল ঠুমরী গাওয়ার প্রচলন ছিল না।

৪.১.৩ ঘনাক্ষরী ঠুমরী

ঘন সন্নিবিষ্ট শব্দ সম্ভারে রচিত পদকে ঘনাক্ষরী ঠুমরী বলে। অত্যন্ত নাগরিক বা অভিজাত শ্রেণির নাচের সাথে গাওয়া হতো বলে এই গান ঘনাক্ষরী ঠুমরী গান হিসাবে পরিচিত। ঘনাক্ষরী ঠুমরী, খাড়ী ঠুমরী এবং অষ্টাদশ শতকের কহন্ ও লচাও ঠুমরী অপেক্ষা প্রাচীন। এই ধারার ঠুমরী গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে গানের কথার পরিমান বেশি এবং লোকসুরাশ্রিত মনোরঞ্জক সরল সুরের উপস্থিতি। এই ধরনের ঠুমরীর অপর নাম ছিল 'বরুয়াঁ'

৭৪। ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: প: ব: রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৪)

বা 'বারোয়াঁ'। সাধারণত চতুর্মাত্রিক তাল ছন্দে (কাহারবা, কাওয়ালী, ত্রিতাল ইত্যাদি) এই গান গাওয়া হতো। এই ধারার ঠুমরী গানের প্রচলনও ১৭শ শতকের শুরুর দিকে হয়েছিল।

৪.১.৪ লচাও ঠুমরী

"ঠুমরী গানের একটি প্রকার লচাও ঠুমরী। 'লচনা' শব্দ থেকে লচাও শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। লচনা শব্দটি হিন্দি শব্দ যার অর্থ বিনম্র বা নমিত বা বিনয়ী হওয়া। লচাও ঠুমরীতে নায়িকার আত্ন-নিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট হয়। সেই কারণে এই গানের গতি খুব ধীর। লচাও ঠুমরীতে মীড়ের কাজ বেশি।"[৭৫] এই প্রকারের বিলম্বিত বা ধীর লয়ের ঠুমরী গান আদ্ধা কাওয়ালী, যৎ, দীপচন্দী ইত্যাদি তালে গাওয়া হতো। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারের খেয়াল গায়ক ওস্তাদ সাদিক আলী কাওয়াল, বিলম্বিত বা ধীর লয়ের খেয়াল গানকে অনুসরণ করে এই লচাও ঠুমরী গানের সৃষ্টি করেন। তবে এই শ্রেণির ঠুমরী গানের লয় বিলম্বিত প্রকৃতির হলেও অলংকার প্রয়োগ ও সুর প্রক্ষেপনের ক্ষেত্রে এতে ধুন বা লোক সুরের অধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। সঙ্গত কারণে ঠুমরী গানের উক্ত প্রকারকে পূর্বীয়া ঠুমরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লচাও ঠুমরীই বিলম্বিত চালের বোল-বানাও ঠুমরী। এই ঠুমরীর গায়নশৈলীতে বিশেষ ভাবব্যঞ্জক শব্দকে অলংকার সহযোগে বিভিন্ন ভঙ্গিতে মনোমুগ্ধকর ভাবে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। যদিও লচাও ঠুমরীর জন্ম লক্ষ্ণৌর দরবারে তবে আধুনিক কালের অতি বিলম্বিত লচাও ঠুমরী কিরানা ঘরানার দান বলে সংগীতজ্ঞরা মনে করেন। পরবর্তী সময়ে গণপৎ রাও ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা বাংলায় এই চালের ঠুমরীর জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৪.১.৫ কহন্ ঠুমরী

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ যেমন ঠুমরী গানের পৃষ্ঠপোষকতা করে সংগীত ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তেমনি ভাবে অসংখ্য ঠুমরী গান রচনা করেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণির ঠুমরী গান রচনা করেছেন। তবে "কহন্" ঠুমরী নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে এই শৈলীর ঠুমরী গানের ব্যবহার করতেন। গীতিনাট্যের সুরেলা সংলাপ হিসাবে নবাব তাঁর রচিত কহন্ ঠুমরীর প্রয়োগ করতেন।[৭৬]

৭৫। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১৭৪

৭৬। ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা (২য়)* (কলিকাতা, প:ব: রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৪)

এছাড়াও ঠুমরী গানকে শাস্ত্রীয় গায়নপদ্ধতি এবং সাধারণ গায়নরীতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ওস্তাদ মহলের ঠুমরী ও বাঈজীদের ঠুমরীকে পৃথক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে "ওস্তাদি বা ক্ল্যাসিকাল ঠুংরীকে বলা হয় 'বড়ী ঠুংরী' এবং বাঈজীদের ঠুংরীকে বলা হয় 'ছোটি ঠুংরী'।"[৭৭]

৪.১.৬ খেয়াল ভঙ্গিম ঠুমরী

এই প্রকার ঠুমরী গানের জন্ম হয় নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে। ১৭০০ শতকের লঘু প্রকৃতির অবহেলিত গীতকে (ঠুমরী) নবাব তাঁর দরবারে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছিলেন। সেই সময় নবাবের দরবারে থাকা প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক বা কাওয়ালদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই ঠুমরী গান। পরবর্তীকালে এই গানে নানা প্রকার রাগরাগিণীর মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন খেয়াল ভঙ্গিম ঠুমরী গানের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ঠুমরী গানের সাথে ছোট তান, গিটকিরি ইত্যাদির ব্যবহার হতো। তবে এতে পূর্বের (১৭০০ শতকের) ঠুমরী গানের মতো নৃত্য প্রদর্শন করা হতো না।

৪.১.৭ টপ্পা ভঙ্গিম ঠুমরী

লক্ষ্ণৌ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবার ছিল সমগ্র ভারতের গুণীশিল্পী, সংগীতজ্ঞদের মিলন মেলা। নবাবের দরবারে অন্যান্য অঞ্চলের খেয়াল গায়কদের মতো পাঞ্জাবী খেয়াল গায়কগণের বিশেষ আনাগোনা ছিল। আর পাঞ্জাবী খেয়ালীয়ারা সকলেই টপ্পা গান গাইতেন। নবাব যখন তাঁর দরবারে ঠুমরী গানের স্থান দিলেন তখন এই পাঞ্জাবী খেয়াল গায়কগণ নতুন এক ঠুমরী রীতির সৃষ্টি করলেন। তাঁরা টপ্পার ঢঙে এই প্রকার ঠুমরী গান গাইতেন। তাই নতুন এই রীতি টপ্পা ভঙ্গিম ঠুমরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পাঞ্জাবী খেয়াল গায়কগণ এই শৈলীর ঠুমরী গান সৃষ্টি করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন দরবারে প্রচার করতে শুরু করেন। তবে এই ঠুমরী গান বড়ে গোলাম আলী খাঁর ঠুমরী গান নয়। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঞ্জাবী ঠুমরী গান। অনেকে আবার এই শৈলীর ঠুমরীকে টপ্পা গানের একটি প্রকার মনে করেন। তাই সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪ খ্রীঃ) তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে বলেছেন, "ঠুম্‌রীর জন্ম টপ্পা থেকেই।"[৭৮]

কালানুপাতিক শ্রেণিভেদ করা ছাড়াও গায়নশৈলীর উপর ভিত্তি করে ঠুমরী গানকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ- দ্রুত ও বিলম্বিত ঠুমরী।

৭৭। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৭৮। শ্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার, ভাগ-১৪* (কলিকাতা, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৭৫), পৃ. ১০৪

৪.১.৮ বিলম্বিত ঠুমরী

এই প্রকার ঠুমরী গান বিলম্বিত লয়ের খেয়াল গানের মতো করে গাওয়া হয়ে থাকে বলে একে বিলম্বিত ঠুমরী বলা হয়। একটি বিশেষ রাগে রচিত এবং বিলম্বিত লয়ের একটি তাল সহযোগে বড় খেয়ালের মতো করে গাওয়ার কারণে অনেকেই একে "বড় ঠুমরী " বলেও অভিহিত করে থাকেন। এই প্রকার ঠুমরী গানে তাল হিসেবে যৎ, দীপচন্দী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি তালগুলো বিলম্বিত লয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বিলম্বিত ঠুমরীতে খেয়ালের মতো ২টি অংশ বা তুক থাকে। যথাঃ- স্থায়ী ও অন্তরা, যার একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। ঠুমরী গান যেহেতু ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি বিশেষ ধারা সেহেতু ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির অন্যান্য ধারার গানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঠুমরী গানেও স্থায়ী বা মুখরা কে মুখ্য এবং অন্তরাকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সংগীত শাস্ত্রীগণের মতানুসারে ঠুমরী গায়নকলার উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত ঠুমরীকে মোট ০৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ- ১) ছেড়, ২) বিস্তার, ৩) ফুটকর, ৪) উঠান।

ছেড়

ছেড় ঠুমরী গানের গায়নশৈলীর একটি প্রধান অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ছেড় শব্দটির বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। যেমনঃ- বিরক্ত, তামাসা এবং আরম্ভ বা শুরু করা। তবে ঠুমরী গানের ক্ষেত্রে এই ছেড় শব্দটি আরম্ভ বা শুরু করাকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা ঠুমরী গানের সূচনার প্রকাশ করে। ঠুমরী গানের এই অংশে শিল্পী যে রাগের উপর গানটি পরিবেশন করবেন সেই রাগের সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। কোন কোন সময় আলাপ না করে অনেক শিল্পী রাগের পকড়, চলন, আওচার ইত্যাদি স্বরবিন্যাস সংক্ষেপে করে মূল গান শুরু করেন। এইসব স্বরবিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য হলো শিল্পী যে রাগটি পরিবেশন করবেন তার রূপটি সহজে যাতে শ্রোতা অনুধাবন করতে পারেন। এরূপ স্বরবিন্যাস শ্রোতাদের ঠুমরী গানের রূপ বা এর কাব্যভাব সহজে বুঝতে সাহায্য করে। ঠুমরী গান গাইবার পূর্বে শিল্পী প্রথমে খোলা গলায় 'সা' স্বরটি সুরে সাধেন। তারপরে আলাপ বা স্বরবিন্যাস করেন। তবে শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য ধারার গানে যেমন– ধ্রুপদ, খেয়ালের মতো ঠুমরী গানের আলাপে নোম, তোম বা প্রতিটি স্বর গাম্ভীর্যের সাথে গাওয়া হয় না। ধ্রুপদ থেকে খেয়ালের আলাপ হালকা এবং খেয়াল থেকে ঠুমরী গানের আলাপ আরও হালকা বা চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ঠুমরী গানের ছেড় অংশে আলাপ বা স্বর বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট তালের প্রয়োগ না হলেও গৌণভাবে একটা লয়ের উপর ভিত্তি করে আলাপ করা হয়।

বিস্তার

স্বরের ব্যাপকতার অর্থে ঠুমরী গানে বিস্তারের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বিস্তার ঠুমরী গানের দ্বিতীয় অংশ হিসেবে বিবেচিত। এর অর্থ বর্ধিত করা। গানের ভাষা বা বাণীর শব্দের উপর ভিত্তি করে ঠুমরী গানে ব্যবহৃত রাগের স্বর বিস্তার করা হয়। ঠুমরী গায়নের এই অংশে বিচরণ করার জন্য গায়ক-গায়িকা প্রথমে গানের স্থায়ী পদ গেয়ে থাকেন এবং এরপর স্থায়ী অংশের কিছু সংখ্যক শব্দ নিয়ে রাগের স্বরবিন্যাসের আদলে বিস্তার করে থাকেন। একে বোল বিস্তার বলা হয়। বিস্তারে নতুন স্বর সমন্বয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং স্বরের পুনরাবৃত্তিতে আধিক্য কম পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক বিস্তারে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বোল ও স্বর সমূহের পারস্পরিক সংমিশ্রণের পাশাপাশি ছোট ছোট তান ও মুর্কীর প্রয়োগের মাধ্যমে গানের পদে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়াও বিস্তারে অন্য রাগের রাগবাচক স্বর প্রয়োগের সাথে ধ্বনির বিশেষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধ্বনির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ, আহ্বান-পরিত্যাগ, ভালবাসা-তিরস্কার, বিরক্তি-সোহাগ ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষণীয়। "সেই সঙ্গে কণ্ঠ স্বরের আওয়াজ ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষীণ বা তীব্র, সরল বা বক্র, বেগে বা শ্লথে প্রয়োজন অনুসারে নিঃস্বরিত হইতে থাকে।"[৭৯] বিস্তারের সময় ঠুমরী গানে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট তালটি তবলা বাদক নির্ধারিত লয়ে বাজিয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে অধিক বাদনকৌশলের প্রয়োগ না করে সঙ্গতকারী শুধুমাত্র মূল ঠেকাই বাজিয়ে থাকেন। ঠুমরী গানের এই অংশে স্বর-বিস্তার বা বোল-বিস্তার, রাগের অনিয়মিত স্বরের ব্যবহার, অন্য রাগের রাগবাচক স্বরের প্রয়োগ, তাল, কণ্ঠ, ধ্বনি ইত্যাদি যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা গায়ন পদ্ধতির ভাবময় চিত্র শ্রোতাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়।

ফুটকর

ঠুমরী গানকে রকমারী করে তোলার জন্য যে পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় তা ফুটকর নামে পরিচিত। ঠুমরী গানের ফুটকর অংশটি এর গায়নশৈলীর দ্বিতীয় ধাপ বিস্তারের মতোই হয়ে থাকে। তবে বিস্তার অংশে স্বর-বিস্তার বা বোল-বিস্তারের প্রক্রিয়া এই অংশে ব্যবহার না করে অন্তরার দিকে অগ্রসর করা হয়। অর্থাৎ, বিস্তার অংশে যে স্বর ও বোল বিস্তারের ধারাবাহিকতা মেনে চলা হতো ফুটকর অংশে তা না করে গায়ক তার ইচ্ছা মতো স্বর ও বোল বিস্তারের প্রয়োগ করে থাকেন। তবে নতুন নতুন কিছু বোল তৈরির পাশাপাশি পূর্বের ব্যবহৃত কিছু বোল-বাণী যা স্থায়ী অংশের বিস্তারে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর প্রয়োগও হয়ে থাকে। ঠুমরী গানে ফুটকর শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে বিচিত্রতা প্রকাশার্থে। "ফুটকর শব্দের অর্থ- বিকশিত বা রকমারী করা। কেউ কেউ ইহাকে বহলা বে বলিয়া

৭৯। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১

থাকেন, যাহার অর্থ প্রবাহিত হওয়া।"[৮০] স্থায়ীর বোল বিস্তারের পর অন্তরার বিস্তার করা হয়। ঠুমরী গায়ক-গায়িকাগণ শ্রোতাদের আকর্ষিত করার জন্য অন্তরার বিস্তারের সময় ছোট তানের প্রয়োগ করেন।

> "এই অংশে যেসব তান করা হয় সেগুলো সাধারণত আকার-তান, বোল-তান, গিটকারী-তান, সপাট-তান ও জমজমা-তান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লঘু, মধুর ও বিশেষ প্রভাব যুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে গিটকারী তান বা টপ্পা তানই অধিকতর করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো তার-ষড়জ অথবা অন্য কোন স্বরের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থাকা হয়, যাহাকে পুকার অথবা 'রোশনী দিখলানা' বলা হয়। আবার এই অবস্থার মধ্যে কিছু লয়কারি, অর্থাৎ আড়, কুয়াড় প্রভৃতি ছন্দে ছোট ছোট (এক আবর্তের মধ্যে) কিছু তান-বাট-বোল ইত্যাদি করা হইয়া থাকে।"[৮১]

ঠুমরী গান পরিবেশনের এই পর্যায়ে এসে সঙ্গতকারী তবলায় নির্দিষ্ট তালের ঠেকা বাজিয়ে থাকেন এবং মাঝে মধ্যে বাদনশৈলীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু বোল-পরণ ইত্যাদির প্রয়োগ করে থাকেন। তবে ভাব প্রকাশের সুবিধার্থে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন গায়ক তালের লয় কিছুটা বৃদ্ধি করে থাকেন। এই ফুটকর পর্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব কার্যসম্পাদিত হয় তার সবই মূলত ঠুমরী গানকে আকর্ষণীয়, বিস্তৃত ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। এই অংশে ঠুমরী গানের অন্তরার পর্ব শেষ হয়। এই পর্যায়ে দু-একবার অন্তরা গাওয়ার পর ঠুমরী গায়ন পদ্ধতির চতুর্থ ধাপ যা উঠান নামে পরিচিত তা শুরু করা হয়।

উঠান

উঠান হচ্ছে ঠুমরী গানের অন্তিম পর্ব। এই অংশ গাওয়া শেষে ঠুমরী গানের সমাপ্তি ঘটে। উঠান শব্দটি সাধারণত তালের গতি বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। "এর অর্থ উত্তোলন বা উঠানো। কেহ কেহ ইহাকে মাতন বলিয়া থাকেন।"[৮২] ঠুমরী গানের অন্তরা বা ফুটকর অংশ গাওয়ার সাথে সাথেই গায়নপদ্ধতির এই অন্তিম ধাপ– উঠান শুরু হয়ে যায়। এই পর্যায়ে এসে নির্ধারিত তালের পরিবর্তন ঘটে এবং লয়েরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্তরা গাওয়া শেষে গায়ক স্থায়ীতে ফিরে আসেন এবং এরপর ত্রিতাল বাজানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ঠুমরী গান রচনার সময় এতে যে তালই নির্ধারণ করা হোক না কেন, উঠান পর্বে এসে এর পরিবর্তন ঘটবে এবং লয় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে তালের লয় সাধারণত দুগুণ হয়ে থাকে। ঠুমরী গানে নির্ধারিত তালটি পরিবর্তিত হওয়ার আগে ত্রিতালে এক আবর্তন বাজানো হয় এবং পরে কাহারবা তাল দুই গুণ লয়ে বাজে। ঠুমরী গানকে অধিকতর মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য এই সময় তালের মূল ঠেকার বাইরেও নানা ধরনের পেশকার, লগ্‌গী, লড়ি, ছেপ্‌কা ইত্যাদি

৮০। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১
৮১। তদেব, পৃ. ১২
৮২। তদেব, পৃ. ১২

বাজানো হয়। উঠান অংশের চলার পথ যেভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, গায়ক তার দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের জন্য স্বরের বিভিন্ন রকম উঠানামার দ্বারা স্থায়ীর কিছু বোল-বাণী গেয়ে থাকেন। এই সময় যেহেতু তাল দুগুণ লয়ে বাজে, তাই গায়কও সমলয়ে বন্দিশের কিছু মুখ্য অংশ লঘু ছন্দে পরিবেশন করেন যা শ্রোতাদের মধ্যে উদ্দীপনার নতুন মাত্রা যোগ করে। ঠুমরী গায়ক এই অংশে এসে মাঝে মধ্যে স্থায়ীর বোল-বাণী নানা রকম ঢঙ্গে পরিবেশন করে অন্তরার কিছু বিশেষ অংশ গাওয়ার সাথে কিছু ছোট ছোট তানও পরিবেশন করেন, যা সম্পূর্ণ ঠুমরী গায়কের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে এসব কিছুই ঠুমরী গানকে শ্রোতাদের কাছে অধিক আকর্ষিত, মাধুর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে পরিবেশনকালে গায়কের ভাব এবং ভাও এর উপর ভিত্তি করে ঠুমরী গানের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। যেসকল ঠুমরী গায়ক-গায়িকার ভাও যত বেশি তার ঠুমরী গান তত বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

> "কখনো কখনো উঠান পর্বে ঠুমরী গানের বাণীগুলি (কথা) একলয়ে গাওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তবলা তাহার দ্বিগুণ লয়ে বাজিতে থাকে। অর্থাৎ গান যদি বিলম্বিত লয়ে হয় তো তবলা মধ্যলয়ে অথবা গান যদি মধ্যলয়ে হয় তো তবলা দ্রুত লয়ে চলিতে থাকে। আবার অনেক সময় বিলম্বিত অথবা মধ্য যে কোন লয়েই গানটি গাওয়া হোক না কেন, তবলা কিন্তু দ্রুত লয়েতেই বাজানো হইতে থাকে। তবে এই সময় তবলাতে সাধারণত কাহারবা তাল নানান লঘু ছন্দাত্মক বোলে বাজানো হইয়া থাকে। যেহেতু ঠুমরীর এই অংশটি দ্রুত লয়েতে গাওয়া হইয়া থাকে, সেই হেতু অনেকে ইহাকে দু'গুণ বা দুন বলিয়াও অবস্থিত করিয়া থাকেন।"[৮৩]

ঠুমরী গান পরিবেশনের সমাপ্তি এই উঠান অংশের পর পরই হয়ে থাকে। তবে গায়ক ও বাদকের দক্ষতাপূর্ণ মনোমুগ্ধকর গায়ন ও বাদনশৈলী পরিবেশনের পর স্থায়ীর বোল পুনরায় গাওয়া হয় এবং তেহাই যোগে সমে এসে ঠুমরী গানের সমাপ্তি ঘটে।

৪.১.৯ দ্রুত ঠুমরী

সাধারণত বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গান অপেক্ষা কিছুটা লয় বাড়িয়ে অর্থাৎ, মধ্য বা দ্রুত লয়ে যে ঠুমরী গায়নের প্রচলন রয়েছে তাই দ্রুত ঠুমরী হিসাবে পরিচিত। দ্রুত ঠুমরী গান গাওয়ার ধরন অনেকটা ছোট খেয়াল বা মধ্য লয়ের খেয়াল গানের অনুরূপ। সঙ্গতকারণে এই চালের ঠুমরী গান ছোট ঠুমরী বলে অনেকের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, বিলম্বিত ঠুমরী গানের অনুরূপ এই চালের গানেরও দুইটি অংশ থাকে। যথাঃ- স্থায়ী ও অন্তরা। যদিও গানের প্রতিটি পদ বা তুকই সমান গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলোর মতো এখানেও স্থায়ী অংশকে মুখ্য এবং অন্তরা অংশকে গৌণ হিসেবে মানা হয়। দ্রুত লয়ের

৮৩। তদেব, পৃ. ১৩

ঠুমরী গান দ্রুত ঠুমরী হিসাবে পরিচয় বহন করলেও তালের গতি তারানার মতো অতিদ্রুত করে গাওয়া হয় না। অতিদ্রুত লয়ের কারণে গানের বাণীর কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই অঙ্গের ঠুমরী গানগুলো একটি নির্দিষ্ট রাগে রচিত হয়ে থাকে। তালের ক্ষেত্রে সাধারণত মধ্য বা দ্রুত লয়ের একটি তালে এই গান নিবদ্ধ হয়ে থাকে। ছোট ঠুমরী বা দ্রুত ঠুমরী গানে অধিকাংশ সময় আদ্ধা, ত্রিতাল, ঠুমরী, সেতারখানি ও কাহারবা প্রভৃতি তালগুলো ব্যবহৃত হয়। দ্রুত লয়ের ঠুমরী গান কিছুটা পার্থক্য ছাড়া অধিকাংশই বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গানের মতো। ঠুমরী পরিবেশন শৈলীর দৃষ্টিতে দ্রুত ঠুমরী গানও বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গানের মতো ৪টি (ছেড়, বিস্তার, ফুটকর, উঠান) অংশকে প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে সামান্য কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এই শ্রেণির ঠুমরী গানের স্থায়ী গাওয়ার পূর্বে গানটি যে রাগে রচিত তার পরিচয় শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে উক্ত রাগের পকড় ও চলন নির্ভর সামান্য আলাপ গাওয়া হয়। অন্যদিকে বিস্তার পর্বে স্বর বা রাগের বিস্তার প্রাধান্য পায় কবিতার শব্দাংশের সাথে। এখানে বোল-বানাও সামান্য করা হয় এবং কাব্য ভাবের প্রাধন্য বেশি থাকে। এই পর্বে ঠুমরী গান সরল রীতিতে ছোট খেয়ালের মতো করে গাওয়া হয়। অন্তরায় প্রবেশের পর ঠুমরী গানে নানাবিধ তান, বাট ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয় যা ফুটকর নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে তালের লয় বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। তানের ক্ষেত্রে বোলতানের প্রাধান্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। এরপর দ্রুত ঠুমরী গানের অন্তিম পর্বে এসে তালের লয় প্রায় তারানার মতো দ্রুত হয়ে যায়। উক্ত গতিতে গানের স্থায়ী-অন্তরার বাক্যাংশ নানাবিধ তান সহযোগে গীত হতে থাকে। তবলা ও গান সমান গতিতে চলে এবং সঙ্গতকারী বিভিন্ন প্রকার টুকরা, রেলা বাদনের দ্বারা ঠুমরী গানকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এভাবে কিছুক্ষণ পরিবেশনার পর তেহাই দিয়ে এই শ্রেণির ঠুমরী গানের সমাপ্তি ঘটানো হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার বহির্ভূত পদ্ধতিতেও ঠুমরী গান পরিবেশিত হতে পারে, যার প্রধান কারণ বিভিন্ন ঘরানার নিজস্ব গায়ন বা পরিবেশন নির্দেশনা বা শিল্পীর নান্দনিক অভিরুচি। এইজন্য একই গান একাধিক গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

৪.২ ঠুমরী গানের বৈশিষ্ট্য

জগতে প্রত্যেক সৃষ্টিরই কিছুনা কিছু ব্যতিক্রমধর্মী গুণাগুণ থাকে। আর সেই জন্যই তাকে অনেকের মাঝে চিহ্নিত বা স্বতন্ত্র হিসাবে পরিচিত করা যায়। সংগীতের ধারাগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে একটি আরেকটিকে পৃথক করে তোলে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে ঠুমরী অন্যতম। নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে ঠুমরী– ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ইত্যাদি থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখে। বৈশিষ্ট্য বলতে এখানে ঠুমরী গান সম্পর্কিত

বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। যে সকল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ঠুমরী গান পরিবেশিত হয় সে বিষয়গুলোই ঠুমরী গানে বৈশিষ্ট্য হিসাবে রূপ লাভ করে। শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী একটির সাথে অপরটি নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন– শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয় গায়কির ধরন, পরিবেশনের বিষয়বস্তু, ঘরানা, ভাষা, অঞ্চল, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। আবার অনুরূপভাবে বৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলীও শ্রেণীবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। এর ব্যতিক্রম হবেনা এরকম নয়, বিশেষ কারণে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে পারে। ঠুমরী গান যেহেতু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান চারটি ধারার মধ্যে একটি অন্যতম ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেহেতু অপর তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত চারিত্রিক পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। এর ফলে প্রতিটি ধারার স্বতন্ত্রতা বা স্বকীয়তা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাবে। এই আলোচনাটি ধারাগুলোর গঠনরীতি, আচরণ, চলার ধরন, গায়নপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনাও বলা যেতে পারে।

তুলনামূলক আলোচনা বলতে সাধারণত দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে কি কি সমতা ও ভিন্নতা রয়েছে তা খুঁজে বের করা। আর এই বিষয়বস্তু গুলো যদি একই ধারার বা সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় হয় তাহলে স্বাদৃশ্য ও বৈস্বাদৃশ্য খুঁজে পেতে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না। ঠুমরী গান একটি উচ্চাঙ্গের সংগীত ধারা তাই এর সমজাতীয় সংগীত ধারাগুলোর বৈশিষ্ট্য বা ঠুমরীর সাথে কতখানি সমতা বা ভিন্নতা রয়েছে তা জানা থাকলে পরিবেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হবে। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধারায় ভাগ করা হলে সবার আগে আসে ধ্রুপদ, তারপর খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ইত্যাদি। এই আলোচনায় উক্ত বিষয়গুলোর নিজস্ব প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, কাঠামো কি রকম তা উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

৪.২.১ ধ্রুপদ

ভারতীয় সংগীতের এক ঐতিহ্যবাহী সংগীতশৈলীর নাম ধ্রুপদ। প্রাচীন সালগসূড় নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল ধ্রুবপদ গান আর সেই গান থেকেই ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছিল। সালগসূড় প্রবন্ধের সময়কাল ছিল খ্রীঃ ১২০০-১৪০০ পর্যন্ত। সেই সময় সকল প্রকার রচনা বা গীতপ্রবন্ধ যা রাগ ও তালে নিবদ্ধ ছিল সেগুলোকে পদগান বলা হতো। তৎকালীন সময়ে সালগসূড় প্রবন্ধ ধ্রুবপদ গান নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। ড. উৎপলা গোস্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী– "বর্তমানের ধ্রুপদ সালগসূড়ের অর্ন্তগত ধ্রুবগীতির পরিবর্তিত রূপ। পদ বলতে সমগ্র গানটিকে (চারটি ভাগ– স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ) বোঝাতো তাই ধ্রুবপদ কথাটি প্রথমে আসে এবং পরবর্তীকালে সংক্ষেপিত হয়ে ধ্রুপদ নামকরণ হয়।"[৮৪] গোয়ালিয়রে ধ্রুবপদকে বৃজ ভাষায় (গোয়ালিয়র থেকে মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত অঞ্চলকে

৮৪। প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক–শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ৫৫

বৃজভূমি বলা হয় আর সেখানকার ভাষাকে বৃজভাষা বলে) ধুরপদ বা ধ্রুপদ বলে আখ্যায়িত করা হতো। ধ্রুপদের উৎপত্তি হয়েছে 'ধুরপদ' শব্দ থেকে এমনটাই অনেকের ধারণা। আবার ধ্রুপদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, এক প্রকার গীতের প্রচলন সুপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তৎকালীন সময়ে সে গীত 'ধুর্গান' নামে পরিচিত ছিল। এই ধুর্গানের পরিবর্তিত রূপই হলো ধ্রপদ। ধ্রুপদ শব্দের অর্থ সত্য বাণী। যে সংগীত রীতিতে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তাই ধ্রুপদ। ধ্রুপদ সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রী পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস বলেছেন– "ধ্রুপদ হলো সংগীতের এক সমাহিত মূর্তি যা ধীরপদী, গম্ভীর, ধ্যান-স্তিমিত, অচঞ্চল ও অন্তর্মুখী সম্পদে পরিপূর্ণ। ধ্রুপদ একটি বিশালাকৃতির সৌধ স্বরূপ, যার অন্তঃপুর হতে বহু প্রকারের গীতশৈলীর জন্ম হয়েছে।"[৮৫] ধ্রুপদের মতো গম্ভীর ভাবযুক্ত সংগীত ধারা আর দ্বিতীয়টি নেই। এই ধারার সংগীতকে পুরুষবাচক সংগীত ধারা বলেও অবিহিত করা হয়। ধ্রুপদের বিষয়বস্তুতে ঈশ্বর বন্দনা, রাজা বাদশার গুণ-কীর্তন, যুদ্ধের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠে। এছাড়াও মাঝে মধ্যে নর-নারীর প্রেম বৈচিত্র্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এই গানের বাণীতে। ধ্রুপদ গানে বীর, শান্ত, গম্ভীর ও ভক্তি বা আদি রসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। হিন্দি, ব্রজবুলি, উর্দূ ও সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য রয়েছে ধ্রুপদের বাণীতে। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী রয়েছে। গওহার, নওহার, ডাগর ও খান্ডার এই চার প্রকার বাণীর মধ্যে যে কোন এক প্রকারের বাণী অনুসরণ করে ধ্রুপদ গান গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। ধ্রুপদে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি তুক থাকে। বিলম্বিত লয়ে অধিকাংশ সময়ে ধ্রুপদ গান পরিবেশিত হয়। রাগ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রায় সকল রাগেই ধ্রুপদ গান গাওয়া হয়। ধ্রুপদের সাথে তাল যন্ত্র হিসাবে আনদ্ধ বাদ্য পাখোয়াজ ব্যবহার করা হয়। এতে ব্যবহৃত তালগুলো বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে থাকে। হালকা প্রকৃতির কোন তাল ধ্রুপদের সাথে প্রয়োগ করার প্রচলন নেই। ধ্রুপদের সাথে যে সকল তাল প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো– চৌতাল, আড়া চৌতাল, আদিতাল, পট-তাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, সুরফাঁক তাল বা সুলতাল ইত্যাদি। এছাড়াও ধামার, তেওড়া ও ঝাঁপতালের ব্যবহারও মাঝে মধ্যে ধ্রুপদ গানে শুনতে পাওয়া যায়। ধ্রুপদের প্রতিটি তুকে সংশ্লিষ্ট রাগের রাগরূপ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। এর চলার প্রকৃতি গম্ভীর। ধ্রুপদের আলাপ হয় দীর্ঘ এবং আলাপের প্রায় ৬-৭ টি অঙ্গ দেখানো হয়। আলাপে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন ধরনের লয় দেখানো হয়। আলাপ শেষে মূল বন্দিশ গাওয়া হয় এবং বন্দিশের মাঝে 'উপজ' (ধ্রুপদের বিস্তারকে উপজ বলে) গাওয়া হয়। বন্দিশের শেষে দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চৌগুণ লয়ে লয়কারি দেখানো হয়। ধ্রুপদে কখনো তান গাওয়া হয় না।

৮৫। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২

রাজা মানসিংহ তোমর সংকলিত 'মান কুতুহল' গ্রন্থ থেকে ধ্রুপদের নিয়ম সম্বন্ধে যা জানা যায় তা মোটামুটিভাবে এইরকম –

"১। ধ্রুপদের ভাষা হবে শুদ্ধ গোয়ালিয়রী বৃজ ভাষা বা খড়ি বলী। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্রুপদকে মার্গগীত বলা হবে।

২। ধ্রুপদের চারটি তুক থাকবে। স্থায়ী, অন্তর / অন্তরা, ভোগ/ সঞ্চারী ও আভোগ। তবে দুই তুকেরও ধ্রুপদ ছিল- তিউট ও ফুলবন্দ। এগুলো ছিল প্রকৃতির বর্ণনা বিষয়ক।

৩। ধ্রুপদের বিষয়বস্তু হবে নায়ক প্রশংসা, প্রকৃতির বর্ণনা, দেব মহিমা বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার ভেদ, রাজার গুণ কথন ইত্যাদি।

৪। সকল প্রচলিত রাগেই ধ্রুপদ গাওয়া হবে।

৫। ধ্রুপদে প্রযোজ্য তালগুলি হবে– প্রসিদ্ধ-একতালী (বর্তমান চৌতাল), ঝম্প তাল বা ঝাঁপতাল, সূলতাল বা সুরফাঁক তাল, তীব্রা/গীতাঙ্গী/ তেওড়া ইত্যাদি।

৬। ধ্রুপদের গাইবার ভঙ্গি থাকে যাকে বাণ/ বাণী বলা হয়। চারটি প্রধান বাণী এক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যথা– গওহর, ডাগর, খান্ডার ও নওহার। তবে বর্তমানে সব মিলেমিশে এক প্রকার বাণী প্রচলিত হয়েছে, যাকে মিশ্রবাণ বা মিশ্রবাণী বলা হয়।"[৮৬]

৪.২.২ খেয়াল

'খেয়াল' শব্দটি পারসিক ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ কল্পনা। কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অলংকার প্রয়োগ করে গায়ক বা শিল্পী খেয়াল গান পরিবেশন করে থাকেন। খেয়ালের চরিত্র সম্পর্কে পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস বলেছেন–

"খেয়াল হইল ধনীর ঘরের শিক্ষিত, ধীমান ও স্বাবলম্বী মানী ছেলে। তাই সে দুরন্ত, দুর্বার ও প্রণোচ্ছল। তারুণ্যের তরলতা যেন তাহার ধর্ম। সে কখনো সুরের পাখনা মেলিয়া অসীম আকাশে উড়িয়া চলে, কখনো পাখনার তান ঝাপটে তাহার দাপট দেখা যায়। সে কখনো চঞ্চল আবার কখনো স্থির, কিন্তু ধীর নয়। তাহার মূর্ত্তি ধ্রুপদের ন্যায় গম্ভীর, শান্ত ও সমাহিত নয়। অথচ রাগ রূপকে স্বীকার করিয়া স্বকীয় লক্ষ্যে পৌছাইতে নানান ছন্দে রস সৃষ্টি করিতে থাকে।"[৮৭]

খেয়ালের দুটি প্রকার রয়েছে– বড় খেয়াল (বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়) ও ছোট খেয়াল (দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়)। আমীর খসরুর কল্পনা প্রসূত গান হলো খেয়াল। আমীর খসরু ছোট খেয়ালের জনক আর জৌনপুরের শাসন কর্তা সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী বিলম্বিত চালের খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। "প্রাচীন প্রবন্ধের অনুকরণে সৃষ্ট এক প্রকার গীত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফী কব্বাল মুসলমান গায়কদের সহায়তায় আমীর খসরুর দ্বারা প্রবর্তিত এবং

৮৬। আকলিমা ইসলাম কুহেলী, প্রচলিত সংগ্রহ– শ্রেণি পাঠদান থেকে

৮৭। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২

প্রচারিত হয়েছিল।"[৮৮] উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খেয়াল গান ধ্রুপদের আগে সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বজনস্বীকৃত মতামত হলো ধ্রুপদের অনেক পরে খেয়াল গানের উদ্ভব হয়েছিল। খেয়াল গানের রচনায় প্রার্থনা, নায়ক প্রশংসা, প্রেম-বিরহের কাহিনী ও প্রকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণির ভাব খেয়াল গানে বিদ্যমান। এই গানের বাণীতে হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, ব্রজবুলি ইত্যাদি ভাষার প্রাধান্য রয়েছে। খেয়াল গানে ধ্রুপদের মতো কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলা হয় না।

খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। খেয়ালের অবয়ব ধ্রুপদের মতো গম্ভীর নয়। খেয়াল চঞ্চল প্রকৃতির গান।

২। এটি দুই তুক(স্থায়ী ও অন্তরা) বিশিষ্ট শৃঙ্গার রসাত্মক গীতশৈলী।

৩। প্রচলিত প্রায় সকল রাগেই খেয়াল গাওয়া হয়। এই গীতশৈলীতে রাগের নিয়মকানুন ও শুদ্ধতা যথাযথ পালন করা হয়।

৪। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় খেয়াল গান রচনার প্রচলন রয়েছে।

৫। রাগের সময় মেনে খেয়াল পরিবেশিত হয়। বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের পর ছোট বা দ্রুত খেয়াল গাওয়া হয়।

৬। সচরাচর খেয়ালে যে সকল তাল প্রয়োগ হয় তার মধ্যে ত্রিতাল, একতাল, ঝুমরা, ঝাঁপতাল, তিলওয়াড়া, আড়াচৌতাল উল্লেখযোগ্য।

৭। খেয়াল গানের প্রারম্ভে রাগের স্বরসমষ্টি অবলম্বনে আলাপ গাওয়া হয় যা রাগরূপ প্রকাশ করে। পরে মূল গানের স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়া হয়। বড় খেয়ালে স্থায়ী ও অন্তরা উভয় অংশে বিস্তার গাওয়া হয়।

৮। অন্তরার শেষে মধ্য ও দ্রুত লয়ে বিভিন্ন রকম তান-বোলতান করা হয়। বিলম্বিত খেয়ালে চৌগুণ ও আটগুণ লয়ে তান করার রীতি রয়েছে।

৯। খেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্পর্শ বা কণ্ স্বরের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এছাড়াও এই গানে মুর্কী, গমক, সরগম, মীড়, গিটকিরি, লয়কারি ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

৪.২.৩ টপ্পা

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান চারটি ধারার মধ্যে টপ্পার স্থান তৃতীয়। উত্তর ভারতে প্রচলিত লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে পাঞ্জাবী টপ্পা ছিল জনপ্রিয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল থেকে সংক্ষেপতর গানই হচ্ছে টপ্পা যা পাঞ্জাবের উট চালকদের গান। টপ্পার আদি অর্থ লম্ফ বা লাফ। এটি ক্ষুদ্রাকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক প্রেমগীত। টপ্পা দুই তুক বিশিষ্ট

৮৮। কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সংগীতের অবক্ষয়* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ২১

গান যাতে ঠুমরীর মত স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুটি ভাগই কেবল থাকে। টপ্পা সাধারণত পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত হয়ে থাকে। খেয়াল গান যেসব রাগে গীত হয় সে সমস্ত রাগে টপ্পা গান রচিত হয় না। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে শুধু ভৈরবী, চিতাগৌরী, কালেংড়া, দেশ ও সিন্ধু এই কয়েকটি রাগেই টপ্পা গাওয়া হতো। পরবর্তীকালে এর সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির কারণে কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ এই কয়েকটি আধুনিক রাগ টপ্পায় ব্যবহার শুরু হয়। এর গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকা। টপ্পা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গানের উপযোগী নয়। "অনেকের ধারণা যে আদিরস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে। কিন্তু তা ঠিক নয়। গানের একটি পৃথক রীতির নাম টপ্পা। এর গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকা হবার দরুণ এটা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গানের উপযোগী নয়। তবে ব্রহ্ম সংগীত টপ্পার সুরে রচিত হয়েছে।"[৮৯] টপ্পায় ছোট ছোট দ্রুত গতির তান করা হয়ে থাকে। অবরোহ গতির এই দ্রুত লয়ের তানকে জমজমা তান (পশ্চিম পাঞ্জাব, আফগানিস্তান ও উত্তর রাজস্থান অঞ্চলের লোকগীতে প্রয়োগকৃত দ্রুত গতির সংক্ষিপ্ত তান) বলে। পাঞ্জাবী বা হিন্দি টপ্পার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল এই জমজমা তান। ড. বিমল রায় বলেছেন– "খেয়ালের ন্যায় গানের কয়েকটি শব্দের সামান্য বিস্তার দেখাইয়া কথার তান দিয়া গানের মুখে আসা টপ্পার একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তানটি টপ্পার প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে।"[৯০] টপ্পার বিষয়বস্তু হলো মানব-মানবীর প্রেম-বিরহের কাহিনী। "টপ্পা গানের রচনায় মাঝে মধ্যে কাল্পনিক বিষয় বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই গানে পৌরুষেয় ভাবের আধিক্য দেখা যায়। যেন কোন পুরুষ তার প্রিয় নারীর উদ্দেশ্যে নিজের মনের অব্যক্ত কথা গুলো ব্যক্ত করছে।"[৯১] অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে খেয়াল গানের নানা অলংকার প্রযুক্ত হয়ে টপ্পাশৈলীর ৪টি প্রকার সৃষ্ট হয়। যেগুলো টপ্পার বাণ বা বাণী হিসাবে পরিচিত। টপ্পার ৪টি বাণী– খড়্ডাদার টপ্পা, ফন্দাদার টপ্পা, লড়িদার টপ্পা, গুথাওদার টপ্পা। খেয়াল গায়কদের নজরে আসার পর টপ্পা গানের বিস্তারে খেয়াল গানের প্রধান অলংকার ফিকরাবন্দ ব্যবহৃত হতে শুরু করে। টপ্পা মধ্য ও দ্রুত লয়ের গান। প্রাচীনকালে ৫টি গীতের (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী, সাধারণী ও বেসরা) প্রচলন ছিল। অনেকের মতে, প্রচীন 'বেসরা' নামক গীত থেকে টপ্পা গানের সৃষ্টি হয়েছে। ঠুমরীতে ব্যবহার্য্য রাগগুলোই টপ্পাতে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে *'গীতসূত্রসার'* গ্রন্থে কিছুটা এরকম উল্লেখ আছে, "যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আধাকাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গাওয়া হয় তাকে ঠুংরী বলে।"[৯২] অর্থাৎ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, টপ্পা ও ঠুমরী গানে প্রয়োগকৃত রাগরাগিণী একই এবং টপ্পা রীতির গান ঠুমরীর অনেক আগে এসেছে। *'রাগ-দর্পন'* গ্রন্থে ফকিরুল্লাহ পাঞ্জাবের ক্ষুদ্রাকৃতির এই প্রেমগীতকে

৮৯। প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক–শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ২১৩
৯০। স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯), পৃ. ২৭৩
৯১। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ১৩
৯২। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১৭২

ডপা বলেছেন। টপ্পা, ঠুমরীর থেকে প্রাচীন হলেও ঠুমরী গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে টপ্পা গানের প্রচলন ক্রমশ কমে আসে।

টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। টপ্পা খেয়ালের ন্যায় দুই তুক বিশিষ্ট গায়নরীতি।

২। এর গতি দ্রুত এবং প্রকৃতি হালকা।

৩। ভৈরবী, দেশ, সিন্ধু, খাম্বাজ, কালেংড়া প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়। এছাড়াও কাফি, ঝিঝিট, বারোঁয়া, পিলু ইত্যাদি আধুনিক রাগেও টপ্পা গাওয়া হয়ে থাকে।

৪। যৎ, পাঞ্জবী, আদ্ধা, মধ্যমান, রূপক, টপ্পা, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে টপ্পা গান গাওয়ার রীতি রয়েছে।

৫। টপ্পায় গিটকিরি, জমজমা, মুর্কী, খ্টকা ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৬। খেয়ালের ন্যায় দ্রুত ও সপাট তান টপ্পায় প্রয়োগের নিয়ম নেই। তবে গানের বাণীর সাথে স্বর মিলিয়ে গমক তানের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৭। এই গানের শুরুতে আলাপ গাওয়া হয় না, গানের স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়ার পরে অলংকারযুক্ত বিস্তার প্রয়োগের রীতি রয়েছে।

৮। টপ্পা শৃঙ্গার রসাত্মক গীত। এতে করুণ ও বিরহ রসের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

৯। টপ্পা একটি চঞ্চল প্রকৃতির গীতশৈলী।

১০। "বিলম্বিত ও মধ্য উভয় লয়ে টপ্পা গান বেশি গীত হয় এবং গানের কবিতার প্রায় প্রতিটি শব্দই অলংকৃত করে গাওয়ার রীতি রয়েছে।"[৯৩]

৪.২.৪ ঠুমরী

লঘু প্রকৃতির এক প্রকার গায়ন ধারার নাম ঠুমরী যা ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার মতো ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি বিশেষ ধারা। কোমল 'গা ও না' যুক্ত রাগেই ঠুমরী গানের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। বাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে গানের ভাব প্রকাশার্থে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন স্বর-বিন্যাসের দ্বারা গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। সৃষ্টিশীল গায়নরীতি ও বৈশিষ্ট্যের জন্য সংগীতের এই ধারা উত্তর ভারতের গ্রাম্যগীত থেকে রাজদরবারের সংগীতে স্থান করে নিয়েছিল। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গান রাজদরবারে পরিবেশিত হতে শুরু করে। নবাব ওয়াজেদ আলীর রাজত্ব (১৮২২-১৮৮৭) কালেই লক্ষ্ণৌতে এই গান প্রথম আসরে বসে গাওয়ার প্রচলন

৯৩। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ১৩

হয়। ধ্রুপদ বা খেয়াল অপেক্ষা এই গান সংক্ষিপ্ত এবং কঠোর নিয়ম বহির্ভূত। বিশেষ করে শৃঙ্গার রসাত্মক রাগে এই গানের ভাব অধিক প্রস্ফুটিত হয়। ঠুমরীতে সংগীতের নান্দনিক রস ফুটে উঠে দ্রুত গতির তান, মূর্ছনা, মীড়, মুর্কী প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে। এই গানের গায়কিতে রাগরাগিণী প্রয়োগের স্বাধীনতা রয়েছে। তাই শ্রোতাগণের মনোরঞ্জনে ঠুমরী গান অধিক উপযোগী। ঠুমরীর বিষয়বস্তুতে নারীর প্রেমের ঐকান্তিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। বিলম্বিত ও মধ্য বা দ্রুত, এই দুই লয়ে ঠুমরী গাওয়ার রীতি রয়েছে। ঠুমরীর বৈশিষ্ট্যই এর জনপ্রিয়তার বাহক।

ঠুমরী গানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে বহু সংখ্যক রাগ রয়েছে যার মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ বিদ্যমান। এই সকল রাগের মধ্য থেকে অল্প কিছু বিশেষ রাগেই কেবল ঠুমরী গান গাওয়া হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখ্য যে, ঠুমরী গানে রাগের শুদ্ধতার চেয়ে ভাবের গুরুত্ব অধিক তাই ঠুমরী গানে প্রযুক্ত রাগগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুদ্ধের পরিবর্তে মিশ্র অর্থাৎ মূল রাগের সাথে সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এতে ঠুমরীর ভাব প্রকাশে গায়কের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। রাগের মধ্যে কাফি, খাম্বাজ, তিলং, তিলক-কামোদ, ভৈরবী, পিলু, কিরওয়ানী, দেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। ঠুমরী গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে গুণী শিল্পীগণ গানের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাগ বহির্ভূত কিছু স্বরের প্রয়োগ করেন যা অনিয়মিত স্বর বলেই আখ্যায়িত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে রাগে ঠুমরী পরিবেশিত হচ্ছে সেই রাগে এই স্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ স্বর প্রয়োগের জন্য অবশ্যই তৈরি কণ্ঠ এবং অধিক দক্ষতার প্রয়োজন।

৩। বিলম্বিত, মধ্য বা দ্রুত লয়ের ঠুমরী গানে আলাপ সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়। খেয়াল বা ধ্রুপদের মতো দীর্ঘ সময় ধরে আলাপের প্রচলন নেই। ঠুমরী গান গাওয়ার সময় মূল বন্দিশটি শুরুর আগে যে রাগে ঠুমরী গাওয়া হবে সেই রাগের পকড়, চলন বা আওচার জাতীয় সামান্য আলাপের দ্বারা শ্রোতাদের রাগ সম্পর্কিত ধারণা দিয়ে গান শুরু করা হয়।

৪। বোল-বানাও ঠুমরী গানের একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পর্যায়ে এসে গানের কাব্যাংশের কোন বাক্যকে ভেঙ্গে একাধিক স্বরসমষ্টির দ্বারা ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে একই শব্দের বা শব্দ-সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন আবেগ বা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে।

৫। ঠুমরী গানের কাব্য-ভাব যথাযথ প্রকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে উপযুক্ত স্বরের সংমিশ্রণ গানের বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। ঠুমরী গানের বাণী গৌণ আর ভাবই মুখ্য। আর এই ভাব হয়ে থাকে মূলত কোমল প্রকৃতির।

৬। ঠুমরী গান সুর প্রধান। তাই বিস্তারকালে স্বরের চেয়ে সুরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই গানের বিস্তারে ব্যাপকতা রয়েছে।

৭। নির্দিষ্ট কয়েকটি তালে ঠুমরী গান গাওয়া হয়। তালগুলো অধিকাংশই তবলা সহযোগে বাজানো হয়ে থাকে। তালের মধ্যে ঠুংরী তাল, যৎ, ত্রিতাল, দাদরা, কাহারবা, পাঞ্জাবী, দীপচন্দী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৮। ঠুমরী চঞ্চল স্বভাবের গান, এই গানের বিস্তার মন্দ্র সপ্তকের তুলনায় মধ্য ও তার সপ্তকে অধিক হয়ে থাকে।

৯। ঠুমরী গানের চলনে চপলতার উপস্থিতি রয়েছে বিধায় ঠুমরী গানে ক্ষুদ্র পরিসরে চটকদার তান প্রয়োগ করা হয়। তবে এই তান কেবল মাত্র পাঞ্জাবী ঠুমরীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১০। ঠুমরী তে লয়কারি দেখানো হয় না।

১১। ঠুমরীর বাণীর বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম বা বিরহ। এই গানের বিষয়বস্তুতে পুরুষের প্রতি নারীর মনের ভাব প্রকাশ পায়।

১২। ঠুমরী একটি শৃঙ্গার-রস প্রধান গায়নশৈলী। যেহেতু ঠুমরী গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ বা মানব মনের রোমান্টিক ভাব প্রকাশ পায় সেহেতু এই গানে শৃঙ্গার-রস ও করুণ রসের প্রাধান্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

১৩। খেয়ালের মত ঠুমরী গানের বাণীতে ২টি ভাগ রয়েছে, একটি স্থায়ী অন্যটি অন্তরা।

১৪। ঠুমরী গানে মুর্কীর কাজের আধিক্য থাকায় বিশেষ তৈরি কণ্ঠ না হলে এ জাতীয় ক্ষুদ্র অলংকারের প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই ঠুমরী গায়নের জন্য আলাদা করে তালিম নেওয়া বাধ্যতামূলক।

১৫। ঠুমরী গান প্রথমে বিলম্বিত বা মধ্যলয়ে আরম্ভ করা হয়। অন্তরার অংশ গাওয়ার পর দ্বিগুণ লয়ে গাওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে উঠান বলা হয়। শেষাংশে দ্রুত কাহারবা অথবা ত্রিতালে গাওয়া হয়ে থাকে।

১৬। ঠুমরী গানে গমকের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

১৭। ঠুমরী গানের একই কলিতে ২-৩টি রাগের সংযোগ ঘটে যা এই গানকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলে। ঠুমরীতে রাগের এরকম মিশ্র সংযোগ প্রসঙ্গে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "এতে সচরাচর খাম্বাজের সঙ্গে ভৈরবী কিংবা সিন্ধু, কিংবা পিলু, কিংবা লুম, কিংবা বেহাগ এই

ধরনের সংযোগ দেখা যায়। ঐ ভৈরবীর অংশ এমন সব জায়গায় প্রয়োগ করা হয় যে খাম্বাজের ঠাটেই ভৈরবী কোমল ঠাট পাওয়া যায়।"[৯৪]

১৮। খরজ বা মন্দ্র সপ্তকের স্বরে পরিবর্তন সাধনেও ঠুমরী গানে বৈচিত্র্যতা ফুটিয়ে তোলা যায়।

১৯। ঠুমরী গানের বাণীতে রাগের রঞ্জকতা ও সৃজনশীলতা এই গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২০। সুরবৈচিত্র্য ও গায়নপদ্ধতি ঠুমরী গানের সুরের সৌন্দর্যবর্ধক।

২১। ঠুমরী গান 'সরগম' বহির্ভূত সংগীত গায়নরীতি।

২২। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী, নারীর ঐকান্তিক ভাব, মানব-মানবীর মিলন-বিরহ, বিবাদ, অপেক্ষা, অভিমান, অভিযোগ ইত্যাদি ঠুমরী গানের বিষয়বস্তু।[৯৫]

৪.৩ ঠুমরী গানের গায়নশৈলী

শাস্ত্রমতে গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিন কলার মিলনে হয় সংগীত। সংগীতের এই তিন কলার প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। সংগীতে গায়ন, বাদন ও নর্তন এই তিনটি পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে। ঠুমরী গান যেসব বিশেষ নিয়মে বা ধারাবাহিকতায় গাওয়া হয় তাকেই ঠুমরী গানের গায়নপদ্ধতি বা গায়নশৈলী বলে। অনুরূপভাবে বাদ্যযন্ত্রের জন্য বাদনশৈলী ও নৃত্যের জন্য নৃত্যশৈলীর প্রয়োগ হয়ে থাকে। স্বর-বিস্তার ও বোল-বিস্তার ঠুমরী গানের পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ঠুমরী গানের উদ্ভাবনের শুরুর দিকে উক্ত বিষয়গুলোর তেমন প্রয়োগ না হলেও পরবর্তীকালে ঠুমরী গানের গায়নপদ্ধতিতে স্বর-বিস্তার ও বোল-বিস্তারের প্রচলন, ঠুমরী গানকে নিম্ন পর্যায়ের দেশীয় লোকগীত থেকে খেয়াল গানের মতো শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসাবে গ্রহণীয় করে তুলেছে।

ঠুমরী গান শুরুতে শ্রুতিমধুর, মোলায়েম বা কোমল চটুল প্রকৃতির আলাপ দিয়ে শুরু করে আলাপের শেষে স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়া হয়। ঠুমরী গায়ক তার দক্ষতা দিয়ে নানারকম বিস্তার করে গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন। একই গানের কথায় কয়েকটি সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ এ গানে পরিলক্ষিত হয়। ঠুমরী গান প্রথমে বিলম্বিত লয়ে শুরু করে স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়ার পর ত্রিতাল এক আবর্তন বাজিয়ে দ্রুত দাদরা বা কাহারবা তালে শেষ করা হয়। ঠুমরী গান গাওয়ার সময় ছোট ছোট অনেক অলংকারের (মীড়, মুর্কী, মূর্ছনা ইত্যাদি) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যা ঠুমরী গানের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। ঠুমরী গানের গায়নপদ্ধতি এর শ্রেণিবিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বলা

৯৪। ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা* (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১৭৩
৯৫। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০২)

যায়। যেমন, প্রথম পর্যায়ে ঠুমরী গান বাঈজীরা দাঁড়িয়ে নৃত্য সহযোগে গাইতো যাকে খাড়ী ঠুমরী বলা হতো। পরবর্তী সময়ে আবার ঠুমরী গান যখন বৈঠকি আসরে চলে আসে এবং ওস্তাদি ভাব যুক্ত হতে শুরু করে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে নৃত্যসহ ঠুমরী গান গাওয়া পরিহার করা হয়। ঠুমরী পরিবেশনের এরকম রীতি অর্থাৎ, বসে গাওয়ার প্রচলন ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল এ প্রসঙ্গে 'শান্তিদেব ঘোষ' বলেছিলেন, "গায়কদের মধ্যে এ ঢং-এর চলন হয়েছে অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে– গণপৎ রাও (কদর পিয়া) ও মৈজুদ্দীনের চেষ্টায় এবং উৎসাহে।"[৯৬]

ঠুমরী গানের গায়নশৈলী বা গায়নপদ্ধতির প্রধান দুটি অংশ হিসাবে রাগ ও তালকে মানা হয়ে থাকে। ঠুমরী গানের বিষয়বস্তুর উপযোগী কিছু সংখ্যক রাগ ও তালে ঠুমরী গান গাওয়া হয়। এই সীমিত রাগ ও তালের প্রয়োগ ঠুমরী গানের বৈশিষ্ট্য হিসাবেও ধরা যেতে পারে। এছাড়াও ঠুমরী গানের গায়নশৈলীর উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে রয়েছে ঘরানা, নাটকীয়তা, গায়কের দোষগুণ ইত্যাদি। ঠুমরী গানে ব্যবহৃত রাগ ও তাল সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

৪.৩.১ ঠুমরী গানে রাগ

খেয়াল বা ধ্রুপদের মতো সকল রাগেই ঠুমরী গান গাওয়া হয় না বা গাওয়া যায় না। ঠুমরী যেহেতু কোমল শ্রুতিমধুর সংগীতের এক প্রকার গায়নশৈলী হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত সেহেতু মায়াভরা কোমল সুরের সৃষ্টি হয় এমন রাগেই সাধারণত ঠুমরী গান গীত হয়ে থাকে। ভাব, বিষয়বস্তু ও গায়নশৈলীর কারণে ঠুমরী গান ধ্রুপদ ও খেয়াল গান থেকে আলাদা। ধ্রুপদকে বলা হয় সকল প্রকার রসাত্মক ভাবযুক্ত গান, যার মধ্যে পুরুষবাচক এক প্রকার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে থাকে। ধ্রুপদের বিষয়বস্তুতে ঈশ্বর বা দেবতা, প্রকৃতি বা ঋতু এবং রাজা-মহারাজার গুণকীর্তন ও প্রার্থনা করা হয়। অন্যদিকে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই প্রকার ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে খেয়াল গানে। এই গানে (খেয়াল) নায়ক-নায়িকার একে অন্যের প্রতি প্রেম-বিরহের ঘটনা উপস্থাপন এবং ভাব, ভক্তি ও প্রকৃতির বর্ণনাও করা হয়ে থাকে। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের সাথে তুলনা করে ঠুমরী গানকে নারীসুলভ প্রকৃতির গান বলে বিবেচনা করা হয়। "ঠুমরী গানের স্ত্রী প্রকৃতি, কোমল আকৃতি ও সংবেদনশীল স্বভাব উহার ক্ষেত্রকে কিছুটা সীমিত করিয়া দিয়াছে। এই সীমাকে দুই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা- প্রথম ভাগ রাগের ক্ষেত্রে ও দ্বিতীয় ভাগ তালের ক্ষেত্রে।"[৯৭]

৯৬। তদেব, পৃ. **১৭৪**

৯৭। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭

ঠুমরী সাধারণত স্ত্রী ভাবের শৃঙ্গার ও করুণ রসযুক্ত চঞ্চল প্রকৃতির রাগের সাথে সম্পর্কিত একটি সংগীত ধারা। শৃঙ্গার-রস, মিলন ও বিরহের পাশাপাশি ঠুমরী গানে শান্ত রসেরও উপস্থিতি দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম নিবেদনের অর্থে ঠুমরী গানে শান্ত রসের প্রয়োগ হয়ে থাকে। নারী মনের প্রেম-বিরহের কোমল অবস্থাকে ঠুমরী গান ব্যক্ত করে থাকে বলে এই গান গাওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত কোমল প্রকৃতির কণ্ঠস্বর বেশি উপযোগী। শৃঙ্গার রসের সাথে সহজে সম্পৃক্ত করা যায় এমন করুণ ভাবযুক্ত রসাত্মক রাগে ঠুমরী গায়ন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ঠুমরী গান স্ত্রীবাচক কোমল প্রকৃতির গান হিসাবে বিবেচিত, সেহেতু এতে বীর রসের প্রয়োগ অর্থাৎ পুরুষবাচক ও বীরত্বব্যঞ্জক কোন রসের প্রয়োগ করা হয় না। সাধারণত ধুন জাতীয় রাগ অর্থাৎ কোমল গা ও নি যুক্ত রাগ ঠুমরী গানের জন্য বিশেষ উপযোগী। রাগগুলো হলো-ভৈরবী, কাফি, পিলু, খাম্বাজ, তিলং, ঝিঁঝিট, গারা, দেশ, সিন্ধু, ধানী ও তিলক-কামোদ ইত্যাদি। এছাড়াও কতগুলো বিশেষ বিশেষ রাগে ঠুমরী গান প্রচলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে কিরওয়ানী, কানাড়া, বাগেশ্রী, বেহাগ, সোহিনী, খাম্বাবতী, সুহা, মান্ড, পাহাড়ী, বিহারী, যোগীয়া, জংলা, কালিংড়া/কালেংড়া, বারোয়াঁ ইত্যাদি রাগ অন্যতম।

ঠুমরী গানের সাথে সম্পৃক্ত রাগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা থাকলে পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে আলোচনা সহজে বোধগম্য হবে বলে আশা রাখি। উপরে উল্লিখিত রাগগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

রাগঃ ভৈরবী

রাগ পরিচিতিঃ ভৈরবী রাগটি ভৈরবী ঠাট থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই রাগের আরোহণ-অবরোহণে ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ এই স্বর চারটি কোমল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরোহ-অবরোহ উভয় ক্ষেত্রে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয় বলে এটি একটি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতির রাগ। ভৈরবী রাগে মধ্যম (মা) কে বাদীস্বর এবং ষড়জ (সা) কে সমবাদী স্বর হিসাবে মান্য করা হয়। এই রাগটিকে উত্তরাঙ্গের রাগ হিসাবে গণ্য করা হয়। ভৈরবী রাগের পরিবেশন কাল দিনের প্রথম প্রহরে (ভোর ৪টা- সকাল ৭টা), তবে বর্তমানে সংগীতগুণীরা সকল সময় এই রাগ গাওয়ার প্রচলন ঘটিয়েছেন। এটি চঞ্চল প্রকৃতির একটি রাগ। "রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে সপ্তকের ১২টি স্বরই এই রাগে কুশলী শিল্পীরা প্রয়োগ করে থাকেন যা নিন্দনীয় নয়। এই রাগে ঠুমরী গানের অধিক প্রচলন আছে।"[৯৮]

আরোহঃ সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা।

৯৮। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর* (কলকাতা: সংগীত প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ১১

পকড়ঃ মা, জ্ঞা, সা, ঋা, সা দ্া ণ্া সা অথবা, ণ্া সা জ্ঞা মা পা দা পা, জ্ঞা মা দা পা, মা জ্ঞা ঋা সা।

ন্যাসস্বরঃ জ্ঞা মা ও পা।

রাগরূপঃ সা জ্ঞা ঋা সা, দ্া , ণ্া সা জ্ঞা, মা জ্ঞা ঋা জ্ঞা ঋা - ঋা সা, মা জ্ঞা ঋা সা, ণ্া সা জ্ঞা মা পা দা পা, পা দা ণা র্সা -, র্সা ণা দা পা দা মা -, মা দা ণা দা, দা ণা র্সা-, র্সা র্ঋা র্সা ণা দা ণা দা মা -, পা দা পা মা - জ্ঞা ঋা সা।

রাগ ঃ কাফি

রাগ পরিচিতিঃ এই রাগটি কাফি ঠাটের জনক বা পিতৃরাগ। এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। এই রাগে গা ও নি স্বর কোমল প্রয়োগ করা হয় এবং বাকী সবস্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। কাফি রাগের বাদী স্বর– পঞ্চম (পা) এবং সমবাদী স্বর– ষড়জ (সা)। এটি একটি পূর্বাঙ্গের রাগ। এই রাগটি রাতের দ্বিতীয় প্রহর বা মধ্যরাতে গাওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। "এই রাগের আরোহে ঠুমরী গায়কগণ শুদ্ধ গ ও ন চতুরতার সঙ্গে প্রয়োগ করে রাগের শ্রী বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। স্বর বিস্তার তিন সপ্তকেই (মন্দ্র, মধ্য ও তার) হয়। এই রাগে ঠুমরী গানের অধিক প্রচলন রয়েছে।"[৯৯]

আরোহঃ সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

পকড়ঃ সাসা, রারা, জ্ঞাজ্ঞা, মামা, পা ।

ন্যাসস্বরঃ রা, জ্ঞা, মা ও পা।

চলনঃ সা রা রা জ্ঞা মা মা পা, মা পা মা জ্ঞা, রা জ্ঞা, রা সা ণ্া সা, রা জ্ঞা মা পা।

রাগ ঃ পিলু

রাগ পরিচিতিঃ পিলু রাগ কাফি ঠাটের অন্তর্গত। এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। পিলু রাগে বাদী স্বর– গান্ধার এবং সমবাদী স্বর– নিষাদ। এটি একটি পূর্বাঙ্গের রাগ। পিলু রাগ দিনের তৃতীয় প্রহরে (১২টা-৩টা) গাওয়া হয়ে থাকে। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। এই রাগে গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ স্বরের শুদ্ধ ও কোমল উভয় রূপ গীত হয়।

> "পিলু একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞ একে ধুন বলে থাকেন। ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, গৌরী ও খাম্বাজ রাগের মিশ্রণে উক্ত রাগটির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে এই রাগে সপ্তকের ১২টি স্বরও প্রয়োগ করে থাকেন। এই রাগের পরিবেশনেও

৯৯। তদেব, পৃ. ১১।

ভিন্ন মতের প্রকাশ দেখা যায়। কাফি ঠাটের রাগ হলেও আরোহণ গতিতে শুদ্ধ স্বর প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং কাফি ঠাটের সাথে তেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। অনেকেই ধারণা করেন লোকসংগীতের আধারে এই রাগের সৃষ্টি এবং এর সুরারোপেও ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত হালকা চালের গান- ঠুংরী, ভজন, দাদরা ও টপ্পা বেশী শোনা যায় এই রাগে। যন্ত্রসংগীতে এই রাগের আরোপ বেশী হয়। পিলু রাগের স্বরূপ ভিন্নতা দেখা যায় সেনী ঘরানার সংগীতে।"[১০০]

আরোহঃ না্ সা, জ্ঞারা জ্ঞা, মা পা, দাপা, ণাধা পা, র্সা অথবা, না্ সা গা মা পা না র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা ধা পা, দা পা মা জ্ঞা, রা সা না্ সা ণ্া ধ্া প্া না্ না্ সা অথবা, র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা না্ সা।

পকড়ঃ না্ সা জ্ঞা না্ সা প্াদ্া না্সা।

ন্যাসস্বরঃ জ্ঞা, পা ও না।

রাগরূপঃ সা জ্ঞা রা জ্ঞা, ঋা সা ঋা, না্ সা, না্ ধ্া প্া, না্সা, গা, মা পা ণা ধা পা, দা পা, দা পা মা জ্ঞা, রা জ্ঞা ঋা সা, জ্ঞা মা পা না র্সা।

রাগঃ খাম্বাজ

রাগ পরিচিতিঃ এটি খাম্মাজ ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এই রাগের আরোহে ঋষভ (রা) স্বর বর্জিত এবং অবরোহ সম্পূর্ণ তাই এটি ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ। এই রাগে শুদ্ধ ও কোমল উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহে শুদ্ধ নিষাদ (না) এবং অবরোহে কোমল নিষাদ (ণা) স্বরের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাকি স্বরগুলো শুদ্ধ এবং পা স্বরটি কিছুটা দুর্বল। এই রাগে গান্ধার স্বরটিকে বাদী এবং নিষাদ স্বরকে সমবাদী স্বর হিসাবে মানা হয়। খাম্বাজ একটি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগটি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে (৯টা -১২টা) গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। খাম্বাজ একটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। খাম্বাজ রাগে অধিক ঠুমরী গানের প্রচলন আছে। এই রাগের আরোহণ-অবরোহণ নিম্নরূপ-

আরোহঃ সা গা মা পা ধা না র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা।

পকড়ঃ ণা ধা, মা পা ধা, মা গা।

ন্যাসস্বরঃ গা, পা ও না ।

রাগরূপঃ না্ সা গা মা গা-, গা মা পা, মা পা গা মা গা -, রা সা; গা মা ধা পা, গা মা পা গা - মা গা রে সা।

১০০। দেবব্রত দত্ত, *সংগীত সোবন* (কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১০১

রাগঃ তিলং

রাগ পরিচিতিঃ তিলং রাগটি খাম্বাজ ঠাট থেকে সৃষ্ট। এই রাগের আরোহণ-অবরোহণে ঋষভ ও ধৈবত স্বর দুটি বর্জিত থাকে। তাই এই রাগের জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। রাগটি পরিবেশনের ক্ষেত্রে বাদী-সমবাদী হিসাবে যথাক্রমে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটি মানা হয়। যেহেতু এই রাগে বাদী স্বর গান্ধার তাই এই রাগের অঙ্গ পূর্বাঙ্গ প্রধান। তিলং একটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। এই রাগের পরিবেশন কাল রাত্রি ২য় প্রহর (রাত ৯টা-১২টা)। এই রাগের আরোহে সব স্বর শুদ্ধ এবং অবরোহে নিষাদ স্বরটি কোমল প্রয়োগ করা হয়।

আরোহঃ সা গা মা পা না র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা পা মা গা সা।

পকড়ঃ ণা পা, গা মা গা।

ন্যাসস্বরঃ গা ও পা।

রাগরূপঃ সা গা মা পা, ণা পা, মা পা গা মা গা, সা, গা মা পা, গা মা পা ণা পা, র্সা, ণপা, গমগা, সা।

রাগঃ ঝিঝিট

রাগ পরিচিতিঃ ঝিঝিট রাগটি খাম্বাজ ঠাটের আশ্রয়রাগ। যেহেতু এই রাগের আরোহণ ও অবরোহণে ৭টি স্বরই ব্যবহৃত হয় তাই এটি একটি সম্পূর্ণ জাতির রাগ। এই রাগে শুধু নিষাদ স্বর কোমল এবং বাকী সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই রাগের বাদী স্বর–'গা' এবং সমবাদী স্বর–'ধা'। মতান্তরে বাদী–সমবাদী স্বর যথাক্রমে 'গা' ও 'না' । এটি একটি পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগ। এই রাগটি রাত্রি ২য় প্রহরে গাওয়া হয়ে থাকে। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে প্রধানত এই রাগের বিস্তার করা হয়ে থাকে। রাগবাচক স্বর হিসাবে ধ্সা, রে, মাগা স্বরসমূহ বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

আরোহঃ সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা।

"ঝিঝিট রাগটি একটি বিতর্কিত রাগ হিসাবে সংগীত মহলে পরিচিত এর শাস্ত্রীয় পরিচয় এবং প্রয়োগাত্মক রূপের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদের জন্য। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে এই রাগের কোন পকড় উল্লেখ করেননি। তিনি (ভাতখন্ডে) উঠাও এবং দুই প্রকার চলনের উল্লেখ করেছেন। যথাঃ-

উঠাও - ধ্সা, রামা, গা, পা মা গা রা সা ন্া ধ্া প্া।

চলন (১ম প্রকার)

ধ্সা, রমগ, প, মগ, রাসা, ন্ধ্প্ , ধ্সা, রমগ, গমপমগ, ধপমগ, সারগ, সা, ন্ ধ্প্ , ধ্ সা, রমগ।

চলন (২য় প্রকার)

সা, রগ, সা, ন্ধ্ , প্ধ্সা, সা, রমপধ, মগ, গমসা, রপমগ, সা, রগ, সা, ধ্, প্ধ্সা।"[১০১]

রাগঃ গারা

রাগ পরিচিতিঃ গারা রাগটি উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত রাগ বিশেষ। মতান্তরে এটি কাফি ঠাটের রাগ। এই রাগে উভয় গান্ধার ও উভয় নিষাদ স্বরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। গারা রাগের আরোহে– ঝিঝোটি ও খাম্বাজ এবং অবরোহণে খাম্বাজ ও জয়জয়ন্তী রাগের আভাস পাওয়া যায়। "এছাড়াও উপ-শাস্ত্রীয় সংগীত যেমন: ঠুমরী বা ভজন প্রকৃতির গান গাওয়ার সময় গারা রাগটি মান্ড, পিলু, ভিন্নষড়জ, পাহাড়ী, সিন্ধুরা, জিলা, মাঝ-খাম্বাজ ইত্যাদি রাগের দ্বারা প্রভাবিত হয়।"[১০২] আলাপের সময় গারা রাগে মন্দ্র ধৈবতের প্রাধান্য অন্যদের থেকে পৃথক। হাল্কা বা লঘু অঙ্গের গান, যেমন- ঠুমরী বা ধুন জাতীয় গান বা বাদনরীতি এতে বেশি হয়। এই রাগের জাতি ষাড়ব–সম্পূর্ণ। এটি একটি পূর্বাঙ্গ বাদী রাগ। গারা রাগটি রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি শান্ত প্রকৃতির রাগ। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে এই রাগের প্রাধান্য অধিক।

আরোহণ: স গ ম প ধ ন র্স

অবরোহণ: র্স ণ ধ প ম গ র জ্ঞ র স

বাদীস্বর: গান্ধার (মতান্তরে– স/ ষড়জ)

সমবাদী স্বর: নিষাদ (মতান্তরে– প/ পঞ্চম)

পকড়: স গ ম প, গ ম র জ্ঞ স র ন্ স, ণ্ ধ্ ন্ স।

রাগঃ দেশ

রাগ পরিচিতিঃ খাম্বাজ ঠাট হতে সৃষ্ট করুণ রসের রাগ দেশ। রাগ দেশ একটি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ। এই রাগের আরোহে ৫টি স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে অবরোহ গতিতে এই রাগে ৭টি স্বরের মধ্যে নিষাদ কোমল প্রয়োগ হয়ে থাকে। ষড়জ স্বরটি অবরোহ গতিতে বক্র ভাবে প্রয়োগের প্রচলন রয়েছে। দেশ রাগের বাদী-সমবাদী স্বর যথাক্রমে–রা ও পা, মতান্তরে পা ও রা। এই রাগটি পূর্বাঙ্গের রাগ। দেশ রাগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে (৯টা-১২টা) গাওয়া হয়ে থাকে। এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও করুণ রাসাত্মক। ঋতুভিত্তিক রাগ হিসাবেও দেশ রাগ পরিচিত।

১০১। শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: সঙ্গীত প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৫০

১০২। https://meetkalakar.com/Artipedia/Gara%20

আরোহঃ সা রা মা পা না র্সা

অবরোহঃ র্সা ণা ধা পা মা গা রা গা সা।

পকড়ঃ রা, মপা, ণধপা, পধপা, মগরা, রা গা সা।

ন্যাসস্বরঃ রা, গা, পা ও না।

রাগরূপঃ সা রা মা পা, ণা ধা পা, মা পা মা গা মা রা, গা সা, সা রা ণ্া, ধ্া ণ্া ধ্া প্া, ম্া প্া ন্া, ন্া সা।

রাগঃ সিন্ধু/ সিন্ধুড়া

রাগ পরিচিতিঃ কাফি ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এই রাগে কোমল 'গা' ও 'না' ব্যবহৃত হয়। এই রাগের আরোহে জ্ঞা ও ণা স্বর বর্জিত হয় এবং বাকি সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রাগের জাতি ঔড়ব–সম্পূর্ণ। এই রাগের বাদী স্বর ষড়জ এবং সমবাদী স্বর পঞ্চম। এটি একটি পূর্বাঙ্গের রাগ। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে এই রাগ গীত হয়।

আরোহ: সা, রা মা পা, ধা, র্সা

অবরোহ: র্সা ণা ধা পা, মা জ্ঞা, রা মা জ্ঞা রা সা

পকড়: সা, রা মা পা, ধা, র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা

ন্যাস স্বর: সা, রা, জ্ঞা, পা ও ধা

রাগঃ তিলক–কামোদ

রাগ পরিচিতিঃ রাগ তিলক–কামোদ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এই রাগের আরোহণ–অবরোহণে স্বর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বক্র চলন দেখা যায়। এই রাগের জাতি ষাড়ব–সম্পূর্ণ। এই রাগের বাদী স্বর রেখাব (রা) আর সমবাদী স্বর পঞ্চম (পা) ব্যবহৃত হয়। তিলক–কামোদ রাগটি পূর্বাঙ্গের রাগ। এই রাগটি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়ে থাকে। এর প্রকৃতি চঞ্চল।

আরোহঃ সা রা গা সা, রা মা পা ধা মা পা, র্সা।

অবরোহঃ র্সা পা ধা মা গা, সা রা গা সা ন্া।

পকড়ঃ প্া ন্া সা রা গা, সা, রা পা মা গা, সা ন্া।

ন্যাস স্বরঃ না, গা ও পা।

রাগরূপঃ সা রে গা সা ন্া প্া, ন্া সা রা গা সা, সারা গারা, পা মা গা, সারাগা সান্া, প্া - প্া ন্া ন্া সা, সা রা গা রা পা মা গা, মা পা না নার্সা।[১০৩]

রাগঃ কিরওয়ানী

রাগ পরিচিতিঃ কিরওয়ানী রাগটি মিশ্র ঠাট এর একটি রাগ। এই রাগের আরোহ–অবরোহে ৭টি স্বরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। এই রাগে কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবত স্বরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এছাড়া বাকি সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়। এই রাগের বাদী স্বর পঞ্চম এবং সমবাদী স্বর ষড়জ। ভিন্নমতে, এর বাদী-সমবাদী যথাক্রমে রা ও পা। কিরওয়ানী রাগটি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়। শান্ত-করুণ রসের রাগ এটি। ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানে এই রাগের ব্যবহার অধিক হয়ে থাকে। মানব মনের প্রেম-বিরহের প্রকাশ ঘটাতে কিরওয়ানী রাগটি বিশেষ উপযোগী। এই রাগে পিলু রাগের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

আরোহ: সা রা জ্ঞা মা পা দা না র্সা

অবরোহ: র্সা না দা পা মা জ্ঞা রা সা।

পকড়: রা জ্ঞা মা পা দা-পা, মা পা জ্ঞা রা, ন্া রা ন্া দ্া ন্া সা

চলন: সা রা জ্ঞা মা পা দা পা, না- না র্রা- না দা পা, দা পা জ্ঞা, সা ন্া সা রা-, রা রা ন্া প্া সা।

রাগঃ বাগেশ্রী

রাগ পরিচিতিঃ বাগেশ্রী কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন একটি রাগ। এই রাগের আরোহণে ঋষভ ও পঞ্চম স্বর দুটি বর্জন করার রীতি রয়েছে। বাগেশ্রী রাগের জাতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন মতে ঔড়ব-সম্পূর্ণ, আবার কোন মতে ষাড়ব-সম্পূর্ণ। এই রাগের আরোহণ-অবরোহণে গান্ধার ও নিষাদ স্বর কোমল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাগেশ্রী রাগটিতে বাদী-সমবাদী স্বর যথাক্রমে মধ্যম 'মা' ও ষড়জ 'সা'। এটি একটি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। বাগেশ্রী রাগটি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে (রাত ৯টা-১২টা, মতান্তরে রাত ১০টা-১টা) পরিবেশনের রীতি রয়েছে। এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর। "কদাচিৎ এই রাগে শুদ্ধ নিষাদ স্পর্শ স্বর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[১০৪]

১০৩। দেবব্রত দত্ত, *সংগীত সোবন* (কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৪)

১০৪। তদেব, পৃ. ৫৮

আরোহঃ সা মা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা।

অবরোহঃ র্সা ণা ধা, মা পা ধা জ্ঞা, মা জ্ঞা রা সা।

ভিন্ন মতে,

আরোহঃ সা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা

অবরোহঃ র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা।

পকড়ঃ র্সা ণা ধা, সা, মা ধা ণা ধা, মা, জ্ঞা রা সা।

ন্যাসস্বরঃ জ্ঞা, মা ও ধা।

রাগরূপঃ সা ণ্ ধ্ ণ্ সা মা, জ্ঞ মা ধা ণা ধা, ণা র্সা -, র্সা ণা ধা র্সা ণা ধা , মা , জ্ঞা, মা জ্ঞা রা সা, ণ্ সা জ্ঞা মা ধা, মা ধা ণা ধা ণা র্সা -, ণা ধা - মপধা জ্ঞা , মা জ্ঞা রা - সা।

রাগঃ বেহাগ

রাগ পরিচিতিঃ বেহাগ রাগটি বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। এই রাগের আরোহে ঋষভ এবং ধৈবত স্বর বর্জিত এবং অবরোহে সবগুলো স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এই রাগটিকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলা হয়। বেহাগ রাগে উভয় মধ্যম (শুদ্ধ ও তীব্র/কড়ি) স্বর ব্যবহৃত হয় বলে অনেকে একে কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত রাগ বলে মনে করেন। তবে তীব্র মধ্যম স্বরটি অবরোহণে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রাগে গান্ধারকে 'গা' বাদী এবং সমবাদী স্বর হিসাবে নিষাদকে 'না' মানা হয়। বেহাগ রাগটি পূর্বাঙ্গের রাগ। বেহাগ রাগের গায়নকাল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (রাত ৯টা-১২টা)। বেহাগ একটি শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। এই রাগের অবরোহণে শুদ্ধ মধ্যম সবসময় দুই গান্ধারের মাঝে অবস্থান করে যা এই রাগের স্বর প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে মানা হয়। ঋষভ ও ধৈবত স্বর দুটি বেহাগ রাগে দুর্বল প্রয়োগ হয়। যেমন– এই স্বর দুটির প্রয়োগে 'না' থেকে 'ধা' ছুঁয়ে 'পা' এবং 'গা' থেকে 'রা' ছুঁয়ে 'সা', বা মীড় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বেহাগ রাগের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই রকম মীড় অধিক সহায়ক।

আরোহঃ না সা গা মা পা না র্সা।

অবরোহঃ র্সা না ধা পা ক্ষা পা গা মা গা রা সা।

পকড়ঃ সাগা, মা , পা, গা মা গা।

ন্যাসস্বরঃ গা ও পা ।

রাগরূপঃ ন্া সা, সা গা মা গা, গা, রা সা, রা সা ন্া, সা মা গা, পা ক্ষ, গা মা গা, গা মা পা, ক্ষ পা, গা মা গা, রা সা।[১০৫]

রাগঃ সোহিনী

রাগ পরিচিতিঃ সোহিনী রাগটি মারবা ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই রাগে কোমল ঋষভ ও তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। এই রাগের আরোহে ঋষভ ও পঞ্চম এবং অবরোহে পঞ্চম স্বরটি বর্জিত। এই রাগের জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। সোহিনী একটি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। রাত্রি শেষ প্রহরে এই রাগ গীত হয়। এই রাগের বাদী-সমবাদী যথাক্রমে ধৈবত ও গান্ধার। এটি একটি উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। এই রাগে ধৈবত ও নিষাদ প্রবল এবং রেখাব স্বর অতি দূর্বল প্রয়োগ হয়। এই রাগের অবরোহ বক্র এবং মীড়ের আধিক্য রয়েছে।

আরোহঃ স গ, ক্ষ ধ ন র্স

অবরোহঃ র্স র্ঋ র্স, ন ধ, গ, ক্ষ গ, ঋ স

পকড়ঃ র্সা, র্ঋা র্সা র্ঋা না র্সা, না ধা, গা, ক্ষা ধা না র্সা।

ন্যাস স্বর: গ, ধ, স

রাগঃ সুহা

রাগ পরিচিতিঃ সুহা রাগটি কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই রাগে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগের আরোহে রেখাব স্বর বর্জিত এবং ধৈবত স্বরটি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় এই রাগে। সুহা রাগের জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। দিবা তৃতীয় প্রহরে এই রাগ গীত হয়। এই রাগের বাদী-সমবাদী যথাক্রমে মধ্যম ও ষড়জ। এটি একটি পূর্বাঙ্গ বাদী রাগ। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। এই রাগে শান্ত, করুণ ও শৃঙ্গার রসের উপস্থিতি রয়েছে বলে ঠুমরী গায়নের ক্ষেত্রে এই রাগটি বিশেষ উপযোগী। এই রাগের আরোহ এবং অবরোহে স্বরের বক্র প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুহা রাগটি সুহা কানাড়া নামেও পরিচিত।

আরোহঃ ণ্ স জ্ঞ ম প ণ ম প র্স

অবরোহঃ র্স ণ প ম প জ্ঞ ম প জ্ঞ ম র স

পকড়ঃ পজ্ঞ ম রস,মপ, ণপ, মপ, ণ র্স, ণ প, মপ জ্ঞম রস

চলন: সজ্ঞমরস, সমমপ, জ্ঞমরস, মপণপ, পণমপর্স, র্সপণপ, মপ, জ্ঞমরস

১০৫। শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: সঙ্গীত প্রকাশন, ২০১৫)

ন্যাস স্বর: স, জ্ঞ, ম ও প।

রাগঃ মান্ড

রাগ পরিচিতিঃ মান্ড রাগটি উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিলাবল ঠাট থেকে সৃষ্ট। এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। মান্ড রাগের বাদী স্বর ষড়জ বা (সা) এবং সমবাদী স্বর পঞ্চম বা (পা)। এই রাগের গায়নকাল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অর্থাৎ, রাত ৯টা থেকে ১২টা। কারো মতে দিবা রাত্রি যেকোন সময় এই রাগ গাওয়া যায়। মান্ড রাগে সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়। এই রাগের চলন বক্র। এই রাগে বড় খেয়াল গাওয়া হয় না। ঠুমরী, ভজন, গজল ইত্যাদি লঘু প্রকৃতির গানে এই রাগের প্রয়োগ অধিক হয়ে থাকে। এই রাগে 'রা' ও 'না' স্বর অল্প প্রয়োগ করা হয়।

আরোহ: সা রা গা মা পা ধা না পা ধা র্সা

অবরোহণ: র্সা না ধা পা মা গা রা গা সা

পকড়: গা মা পা ধা র্সা না ধা; ধা পা মা; মা পা গা রা গা সা।

রাগঃ পাহাড়ী

রাগ পরিচিতিঃ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ পাহাড়ী। এই রাগে মধ্যম ও নিষাদ স্বর বর্জিত এবং বাকি সব স্বর শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়। এই রাগের জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। এই রাগের বাদী-সমবাদী স্বর যথাক্রমে– সা ও পা। পাহাড়ী একটি পূর্বাঙ্গের রাগ। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। পাহাড়ী রাগটি যেকোন সময় গাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

আরোহঃ সা রা গা পা ধা র্সা

অবরোহঃ র্সা ধা পা গা পা গা রা সা।

পকড়ঃ গা, রা সা, ধা্, পা্ ধা্ সা।

ন্যাস স্বরঃ সা, গা, পা ও ধা।

রাগঃ যোগীয়া

রাগ পরিচিতিঃ যোগীয়া রাগটি উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এই রাগের আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটি বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার স্বর বর্জিত হয়। তাই এই রাগের জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। এই রাগের চলন মধ্য ও তার সপ্তকে হয়ে থাকে। যোগীয়া রাগে মধ্যম স্বর কে বাদী এবং ষড়জ স্বরকে সমবাদী স্বর হিসাবে মানা হয়। এটি একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। এই রাগের আরোহে গা ও না স্বর বর্জিত

হয় বলে অনেকে আশাবরী মনে করে থাকেন। যোগীয়া রাগটি দিনের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ, ভোর ৪-৭টা এর মধ্যে গাওয়ার রীতি রয়েছে। এটি একটি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। ঠুমরী, ভজন ও রাগপ্রধান গানের জন্য উপযোগী রাগ বিশেষ।

আরোহণঃ স ঋ ম প দ র্স

অবরোহণঃ র্স ন দ প, দ ম ঋ স

পকড়ঃ স ঋ ম, প দ ম, প দ ন দ প ম, প দ র্স ন দ, প দ ম ,ঋ স ।

রাগঃ জংলা

রাগ পরিচিতিঃ ঠাট আশাবরী থেকে উৎপন্ন রাগ জংলা। এই রাগের আরোহে এবং অবরোহে ৭টি স্বরই ব্যবহার করা হয় বলে এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। এই রাগে বাদীস্বর ষড়জ এবং সমবাদী স্বর পঞ্চম। মতান্তরে বাদী-সমবাদী যথাক্রমে পা ও সা। এই রাগে গান্ধার কোমল প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও ধৈবত ও নিষদ স্বর দুটির শুদ্ধ ও বিকৃত উভয় প্রকার প্রয়োগ করা হয়। জংলা রাগটি রাত্রি ৩য় প্রহরে গাওয়া হয়ে থাকে। ঠুমরী, টপ্পা ও গজল প্রকৃতির গানে জংলা রাগটি অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আরোহ: সা রা জ্ঞা মা পা ধা না র্সা ।

অবরোহ: র্সা ণা দা পা ধা পা মা জ্ঞা রা সা ।

পকড়: সা রা জ্ঞা মা পা, মা পা ধা ণা র্সা, দা পা মা জ্ঞা রা সা। অথবা, জ্ঞ রজ্ঞ স রম পদণদপ দ মপ রজ্ঞ রস।

রাগঃ কালিংড়া

রাগ পরিচিতিঃ রাগ কালিংড়া ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এই রাগের আরোহ এবং অবরোহে ৭টি স্বর প্রয়োগ হয় বলে এই রাগের জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। কালিংড়া একটি উত্তরাঙ্গের রাগ। এই রাগে ধৈবত স্বর বাদী এবং সমবাদী স্বর হিসাবে গান্ধার স্বরকে মানা হয়। মতান্তরে, পঞ্চম ও ষড়জ স্বর যথাক্রমে বাদী-সমবাদী। এই রাগে ভৈরব রাগের মত ঋষভ ও ধৈবত স্বর কোমল প্রয়োগ হয়ে থাকে। বাকি সব স্বর শুদ্ধ। ভৈরব রাগ থেকে এই রাগটিকে পৃথক করার জন্য গান্ধার প্রবল এবং ঋষভ দূর্বল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ভৈরব রাগের মতো কালিংড়া রাগে ঋ ও দ স্বরে আন্দোলন করা হয় না, যা কালিংড়াকে ভৈরব থেকে পৃথক করে। এই রাগ রাত্রি শেষ প্রহরে গাইবার প্রচলন রয়েছে। এটি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল যার জন্য এর গতি

একটু দ্রুত হয়ে থাকে। "লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে এই রাগের অবরোহে কড়ি বা তীব্র মধ্যমের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।"[১০৬]

আরোহ: স ঋ গ,ম প, দ ন র্স

অবরোহ: র্স ন দ প, ম গ, ঋ স

পকড়: স ঋ গ ম, দ প গ ম গ।

ন্যাস স্বর: গ ও প।

রাগঃ বারোয়াঁ

রাগ পরিচিতিঃ রাগ বারোয়াঁ উত্তর ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে বর্ণিত কাফি ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ বিশেষ। এই রাগে কাফি, সিন্ধুড়া এবং দেশী রাগের আভাস পাওয়া যায়। এই রাগে দুই নিষাদের ব্যবহারের কারণে দেশী থেকে পৃথক করা যায়। এই রাগের আরোহে গান্ধার স্বর বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার স্বরটি বক্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বারোয়াঁ রাগের জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। এই রাগের বাদী স্বর ঋষভ এবং সমবাদী স্বর পঞ্চম। এটি একটি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগের গায়নকাল দিবা ৩য় প্রহর অর্থাৎ, এটি দুপুর বেলার রাগ। বারোয়াঁ রাগে সাধারণত খেয়াল গাওয়া হয় না। ঠুমরী, দাদরা, ভজন ইত্যাদি এই রাগে বেশি পরিবেশিত হয়। এটি একটি অপ্রচলিত রাগ। তবে পিলু রাগের সংমিশ্রণে এই রাগের প্রচলন রয়েছে পিলু-বারোয়াঁ পরিচয়ে।

আরোহণ: স র ম প ধ ন র্স

অবরোহণ: র্স ণ ধ প ম প জ্ঞ র জ্ঞ র স

পকড়: রজ্ঞরস, ণ্ধ্ম্প্, ন্ন্স

উল্লিখিত রাগ ব্যতীত ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রমধর্মী অনেক রাগের ব্যবহার ঠুমরী গানে দেখা যায়, যদিও এর সংখ্যা খুবই কম। ঠুমরী গান ধ্রুপদ বা খেয়ালের মতো নির্দিষ্ট রাগের গণ্ডির মধ্যে না থেকে নিজেকে বিকশিত করতে স্বীয় রাগ ব্যতীত অন্য রাগেও বিচরণ করার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু, সেই ক্ষেত্রে ঠুমরী গানে ব্যবহৃত রাগের একই ঠাট বা ঐ রাগের সমপ্রকৃতির রাগের স্বর বা ছায়া নিজ রাগের সাথে সম্পৃক্ত করে গানের সৌন্দর্যবর্ধনের স্বাধীনতা ঠুমরীর রয়েছে। এই স্বাধীনতা ঠুমরী গানের শৃঙ্গার রসাত্মক বোল বানানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেকোন

১০৬। http://onushilon.org/music/rag/kalangra.htm

রাগের মিশ্রণে ঠুমরীর নিজস্ব রাগের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। তাই নিজ রাগের অস্তিত্ব বজায় থাকবে ঐরূপ রাগের স্বরবিন্যাস ঘটিয়ে ঠুমরী গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

৪.৩.২ ঠুমরী গানে তাল

সংগীতে তাল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাল সংগীতের প্রাণস্বরূপ। সংগীতে সময়ের পরিমাপক হিসাবে তালের ব্যবহার করা হয়। "গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি বিষয়ের গতি বা লয়ের স্থিতি নিরূপণ করাকে তাল বলে।"[১০৭] সংগীতে গতির সমতা রক্ষা করাই তালের প্রধান কাজ। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন– "ছন্দবদ্ধ মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলে।"[১০৮]

শম্ভুনাথ ঘোষ তাঁর রচিত সংগীত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "তল (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে তাল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, অর্থাৎ গীত, বাদ্য এবং নৃত্য যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সংগীত শাস্ত্রে তাল শব্দটির বুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে –
>
> 'তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরূচ্যতে।
> শিবশক্তি সমাযোগাত্তাল নামাভিধীয়তে।।'
>
> অর্থাৎ 'ত'-কারে শঙ্কর বা শিব এবং 'ল'-কারে শক্তি, এই ২টি বর্ণের সংযোগে 'তাল' শব্দটির নামকরণ হয়েছে।"[১০৯]

হর-গৌরীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যাক্ষরদ্বয় নিয়ে তাল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *'সংগীত তরঙ্গ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে–

> " হর-গৌরী নৃত্য হৈতে সৃষ্টি হৈল তাল।
> তালের কারণ দুই- ক্রিয়া আর কাল।।
> হরের নৃত্যের নাম তান্ডব প্রকাশ।
> পার্ব্বতীর যেই নৃত্য, তার নাম লাস।।"[১১০]

হর-গৌরী বলতে শিব-পার্বতীকে বুঝানো হয়েছে। তাণ্ডব প্রকাশ পায় নর বা পুরুষ বা শিবের নৃত্যের দ্বারা আর লাস প্রকাশ পায় নারীর নৃত্যের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে সংগীতে তাল বলতে বোঝায় কাল পরিমাণ বিশেষ।

ঠুমরী গান কতগুলো সহজ, হালকা, ছন্দময় তালে নিবদ্ধ থাকে। যৎ, দীপচন্দী, আদ্ধা, পাঞ্জাবী ও ঠুংরী তাল সাধারণত বিলম্বিত চালের ঠুমরী গানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য দিকে ত্রিতাল, সেতারখানি, কাহারবা ও দাদরা

১০৭। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ২৫
১০৮। শ্রী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর* (কলকাতা: সঙ্গীত প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ২৩।
১০৯। শম্ভুনাথ ঘোষ, *সংগীতের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: সঙ্গীত প্রকাশন, ১৯৭২), পৃ. ১৪১
১১০। রাধামোহন সেন দাস, *সঙ্গীত–তরঙ্গ* (কলকাতা: প্রকাশক-শ্রী নুটবিহারী রায়, সম্পাদক- শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৯০৩), পৃ. ৩৬৭

ইত্যাদি তালগুলো মধ্য ও দ্রুত লয়ের ঠুমরী গানে প্রয়োগ করা হয়। ঠুমরী গানে ব্যবহৃত তাল সমূহের সাধারণ পরিচয় নিম্নরূপ–

পাঞ্জাবী

তাল বিবরণঃ পাঞ্জাবী তালের মাত্রা সংখ্যা ১৬। এই তালটি সমান ৪টি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ এটি একটি সমপদী তাল। প্রতি ভাগে মাত্রা সংখ্যা ৪ করে (৪/৪/৪/৪) ১৬ মাত্রায় বিভক্ত। এই তালে ৩টি তালি যথাক্রমে- ১,৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং ১টি খালি ৯ মাত্রায়। উক্ত তালের পরিচয় ত্রিতাল এর মতোই কিন্তু এর বোল ত্রিতাল ভিন্ন এবং গতি আড়লয়ের হয়ে থাকে।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I	ধা	sধি	sক	ধা	ধা	sধি	sক	ধা	তা	sতি	sক	ধা	ধা	sধি	sক	ধা I
চিহ্নঃ		+				২				০				৩			

দীপচন্দী

তাল বিবরণঃ দীপচন্দী তালটি একটি বিসমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ১৪ এবং ৪ টি ভাগে বিভক্ত। এই তালটি ৩/৪/৩/৪ ছন্দে রচিত। এর ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা রয়েছে। এই তালে ৩টি তালি (১,৪,১১ মাত্রায়) ও ১টি খালি (৮ মাত্রায়)।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
বোলঃ	I	ধা	ধিন	s	ধা	ধা	ধিন	s	তা	তিন	s	ধা	ধা	ধিন	s I
চিহ্নঃ		+			২				০			৩			

যৎ তাল

তাল বিবরণঃ যৎ একটি সমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ৮ মতান্তরে ১৬ মাত্রা। তবে উভয় প্রকারেই বিভাগ ৪টি। ৮ মাত্রার যৎ তাল ২/২/২/২ ছন্দে রচিত এবং ১৬ মাত্রার যৎ তাল ৪/৪/৪/৪ ছন্দে রচিত। ৮ মাত্রার তালে ৩টি তালি (১,৩,৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)। আর ১৬ মাত্রার যৎ এ ১,৫,১৩ মাত্রায় তালি ও ৯ মাত্রায় খালি রয়েছে।

৮ মাত্রার ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোলঃ	I ধা	ধিন	ধাধা	ধিন	না	তিন	ধাধা	ধিন I
চিহ্নঃ	+		২		০		৩	

১৬ মাত্রার ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I ধা	s	ধিন	s	ধা	ধা	তিন	s	তা	s	তিন	s	ধা	ধা	ধিন	s I
চিহ্নঃ	+				২				০				৩			

আদ্ধা তাল

তাল বিবরণঃ আদ্ধা একটি সমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ৮ মতান্তরে ১৬ মাত্রার হয়ে থাকে। তবে উভয় প্রকারেই বিভাগ ৪টি। ৮ মাত্রার আদ্ধা তাল ২/২/২/২ ছন্দে রচিত এবং ১৬ মাত্রার আদ্ধা তাল ৪/৪/৪/৪ ছন্দে রচিত। ৮ মাত্রার তালে ৩টি তালি (১,৩,৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)। আর ১৬ মাত্রার তালে ১,৫,১৩ মাত্রায় তালি ও ৯ মাত্রায় খালি রয়েছে।

৮ মাত্রার ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোলঃ	I ধাধিন	ধা	ধাধিন	ধা	নাতিন	তা	নাধিন	না I
চিহ্নঃ	+		২		০		৩	

১৬ মাত্রার ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I ধা	ধিন	s	ধা	ধা	ধিন	s	ধা	তা	তিন	s	তা	ধা	ধিন	s	ধা I
চিহ্নঃ	+		২		০				৩							

ত্রিতাল

তাল বিবরণঃ ত্রিতাল এর মাত্রা সংখ্যা ১৬। এই তালটি সমান ৪ টি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ এটি একটি সমপদী তাল। প্রতি ভাগে মাত্রা সংখ্যা ৪টি করে (৪/৪/৪/৪) ১৬ মাত্রায় বিভক্ত। এই তালে ৩টি তালি যথাক্রমে– ১, ৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং ১টি খালি ৯ মাত্রায়।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	তা	তা	ধিন	ধিন	ধা I
চিহ্নঃ	+		২		০				৩							

সেতারখানি

তাল বিবরণঃ সেতারখানি তালের মাত্রা সংখ্যা ১৬। এই তালটি সমান ৪টি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ এটি একটি সমপদী তাল। প্রতি ভাগে মাত্রা সংখ্যা ৪টি করে (৪/৪/৪/৪) ১৬ মাত্রায় বিভক্ত। এই তালে ৩টি তালি যথাক্রমে– ১, ৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং ১টি খালি ৯ মাত্রায়। এই তালের মাত্রা, বিভাগ, চিহ্ন ত্রিতালের অনুরূপ। তবে এই তালের বোল বাণী ত্রিতাল থেকে একে পৃথক করে।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I ধা	ধি	ইন	ধা	ধা	ধি	ইন	ধা	তা	তি	ইন	তা	ধা	ধি	ইন	ধা I
চিহ্নঃ	+		২		০				৩							

ঠুমরী/ ঠুংরী

তাল বিবরণঃ ঠুমরী তালের মাত্রা সংখ্যা ১৬। এই তালটি সমান ৪টি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ এটি একটি সমপদী তাল। প্রতি ভাগে মাত্রা সংখ্যা ৪টি করে (৪/৪/৪/৪) ১৬ মাত্রায় বিভক্ত। এই তালে ৩টি তালি যথাক্রমে- ১, ৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং ১টি খালি ৯ মাত্রায়। এই তালের মাত্রা, বিভাগ, চিহ্ন ত্রিতালের অনুরূপ। তবে এই তালের বোল বাণী ত্রিতাল ও সেতারখানি তাল থেকে একে পৃথক করে। ঠুমরী গানের সাথে এই তালের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবলা সহযোগে এই তাল বাজানো হয়ে থাকে।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বোলঃ	I ধা	ধিন	ক্রে	ধিন	ধা	ধিন	ক্রে	ধিন	ধা	তিন	ক্রে	তিন	তা	ধিন	ক্রে	ধিন I
চিহ্নঃ	+		২		০		৩									

কাহারবা

তাল বিবরণঃ কাহারবা একটি ৮ মাত্রা বিশিষ্ট সমপদী তাল। এই তালে ২টি বিভাগ (৪+৪) রয়েছে। এই তালে ১টি তালি ও ১টি খালি রয়েছে। তালিটি প্রথম মাত্রায় আর খালিটি পঞ্চম মাত্রায়। এটি বহুল প্রচলিত একটি তাল যা তবলায় ব্যবহার করা হয়। ঠুমরী, গজলসহ বিভিন্ন শ্রেণির গানের সাথে এই তালের প্রয়োগ অধিক জনপ্রিয়। এই তালটি কার্ফা নামেও পরিচিত।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোলঃ	I ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না I
চিহ্নঃ	+			০				

বি:দ্রঃ উক্ত ঠেকা ছাড়াও কাহারবা তালের আরো অনেক ঠেকা প্রচলিত আছে।

দাদরা

তাল বিবরণঃ এটি ৬ মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। এই তালে ২টি বিভাগ (৩+৩) রয়েছে। এই তালে **১**টি তালি ও **১**টি খালি রয়েছে। তালিটি প্রথম মাত্রায় আর খালিটি চতুর্থ মাত্রায়। এটি বহুল প্রচলিত একটি তাল যা তবলায় ব্যবহার করা হয়। ঠুমরী, দাদরা, গজলসহ বিভিন্ন শ্রেণির গানের সাথে এই তালের প্রয়োগ অধিক।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

বোলঃ I ধা ধিন না | না তিন না I

চিহ্নঃ + ০

ধুমালী তাল

তাল বিবরণঃ এটি উত্তর ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত ৮ মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। এই তালে ৪টি বিভাগ (২+২+২+২) রয়েছে। এই তালে ৩টি তালি ও **১**টি খালি রয়েছে। তালিটি ১, ৩, ও ৭ মাত্রায় আর খালিটি পঞ্চম মাত্রায়। "এটি বহুল প্রচলিত একটি তাল যা বাংলা গানে প্রয়োগ হয়।"[১১১] এটি বায়া-তবলা যোগে বাজানো হয়। ঠুমরীসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণির গানের সাথে এই তালের প্রয়োগ অধিক। ধ্রুপদ বা খেয়ালের সাথে এই তালের প্রয়োগ নেই।

ঠেকা

মাত্রা সংখ্যাঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

বোলঃ I ধা ধিন | ধা ধিন | না ধিন | ধাগে তেরেকেটে I

চিহ্নঃ + ২ ০ ৩

ঠেকা (২য় প্রকরণ)

মাত্রা সংখ্যাঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

বোলঃ I ধা ধিন | না তা | ক ধি | না ধা I

চিহ্নঃ + ২ ০ ৩

১১১। http://onushilon.org/music/tal/dhumali.htm

ঠুমরী গানের গায়নশৈলীতে রাগ ও তালের প্রয়োগ মাহাত্মপূর্ণ। বলা যায়, প্রায় নির্দিষ্ট সংখ্যক রাগ ও তালের ব্যবহার ঠুমরীকে অন্যান্য ধারার মধ্যে ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাগ ও তাল ছাড়াও ঠুমরীর গায়নশৈলীতে যে বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে তার মধ্যে 'ঘরানা' অতিব গুরুত্বপূর্ণ। ঠুমরী গানের গায়নপদ্ধতিতে উক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তবে ঘরানাভেদে এর গায়নরীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

৪.৩.৩ ঠুমরী গানের ঘরানা

রাগসংগীত একটি গুরুমুখী বিদ্যা। তাই এই বিদ্যা অর্জনে ঘরানার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কালের বিবর্তনে জাগতিক প্রায় সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। সংগীত সর্বদা পরিবর্তনশীল। সংগীতের একটি অনন্য ধারা হিসাবে ঠুমরীও তার পরিবর্তন, বিবর্তন বা রূপান্তরের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন ঘরানার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, গায়নপদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। "ঘরানা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে হিন্দি শব্দ 'ঘর' থেকে। এর অর্থ হলো বংশ বা পরিবার।"[১১২] তবে ঠুমরী বা অন্যান্য সংগীত ধারার ক্ষেত্রে ঘরানা বলতে বংশ বা পরিবার না বুঝিয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আবৃত নির্দিষ্ট কোন গায়নপদ্ধতিকে বোঝায়। মোবারক হোসেন খান সংগীতে ঘরানার পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে– "সামগ্রিকভাবে গায়নশৈলী (style of singing) বৈশিষ্ট্যকে তথা গায়কির বিশিষ্ট প্রয়োগ কলাকেই 'ঘরানা' এবং সাধারণভাবে যে স্থানে বা যে স্থানের শিল্পী দ্বারা একটি বিশেষ শৈলীর সৃষ্টি হয় সেই স্থান বা শিল্পীর নাম অনুসারে ঘরানার নামকরণ হয়ে থাকে।"[১১৩] নিজস্ব গায়নশৈলীর পরিচয় তুলে ধরার জন্য ধ্রুপদ ও খেয়ালের যেমন প্রসিদ্ধ ঘরানা রয়েছে, ঠিক তেমনি ঠুমরী গানের গায়নরীতির স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যতা প্রকাশের জন্য অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠুমরী ঘরানার সূচনা ঘটে। উত্তর প্রদেশকে ঠুমরী গানের উৎপত্তিস্থল মনে করা হয়, তাই এই অঞ্চলে ঠুমরী গানের বেশিরভাগ ঘরানা বিকাশ লাভ করে। ঠুমরীর বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে পাঞ্জাব, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, কিরাণা জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ঠুমরী গানের উন্নত অবস্থান দৃঢ় করতে এই ঘরানাগুলোর চিত্তাকর্ষক গায়নশৈলী বিশেষ ভূমিকা রাখে। উক্ত ঘরানাগুলোর প্রবর্তক, শিল্পী, বৈশিষ্ট্য ও গায়নরীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক।

১১২। পংকজ কান্তি সরকার, *রাগ সঙ্গীত সাধনা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯), পৃ. ২৩৯

১১৩। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ২২

লক্ষ্ণৌ ঠুমরী ঘরানা

ঠুমরীর সাথে লক্ষ্ণৌ শহরের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ঠুমরীর প্রসঙ্গ আসলেই লক্ষ্ণৌ আর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র নাম সামনে চলে আসে। লক্ষ্ণৌ শুধু একটি স্থানের নাম না, বিখ্যাত ঠুমরী ঘরানার নাম। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ সুবিখ্যাত এই ঠুমরী ঘরানার প্রবর্তক এ কথা সকলের বিশ্বাস। এই ঘরানার ঠুমরীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো চলনে দ্রুত গতির উপস্থিতি। গিটকিরি, মুর্কী ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ এই ঘরানার ঠুমরী গানে লক্ষণীয় বিষয়। এই ঘরানার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট কোন স্বরকে প্রাধান্য না দিয়ে স্বরসমষ্টির আলংকারিক প্রয়োগের প্রাধান্য দেওয়া। এই গায়নরীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়ীর দ্বিতীয় পদকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। স্থায়ীর এই অংশটুকু অন্তরার সাথে স্থায়ীর যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যবর্তী এই অংশকে জোড় বলা হয়, যার অর্থ সংযোগ স্থাপনকারী। এইরীতির ঠুমরীতে কাব্য-ভাব প্রাধান্য পায়। তাই কাব্য-ভাবকে স্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলতে গানের কবিতার সঙ্গে একই ভাষার বা ভিন্ন কোন ভাষার অতিরিক্ত কিছু পদ যুক্ত করা হয়। ঐ নতুন সংযুক্ত পদগুলোকে শের বা শৈর বলা হয়। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গায়কগণ এরূপ অতিরিক্ত অর্থবহ শব্দ বা পদ ঠুমরী গায়নকালে তাৎক্ষণিক রচনা করে উপস্থাপন করে থাকেন। লক্ষ্ণৌ ঠুমরীতে চিত্তাকর্ষক সুরের বিস্তার অধিক পরিলক্ষিত হয়। ধারণা করা হয় যে, খেয়ালের লঘু চাল ও ভাও পরস্পর যুক্ত হয়ে এই রীতির ঠুমরী গানের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ ছিলেন লক্ষ্ণৌ রাজদরবারের সভাগায়ক। ধারণা করা হয় তাঁর (সাদিক আলী কওয়াল) প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে এই ঘরানার ঠুমরীতেও লচাও ভাব ও টপ্পা রীতির অলংকার যুক্ত হয়ে বিলম্বিত লয়ের ঠুমরী গায়নের প্রচলন শুরু হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ রীতির একটি ঠুমরী গানের নমুনা ও ভাবার্থ নিম্নে তুলে ধরা হলো –

"রাগঃ মিশ্র খাম্বাজ

তালঃ আধ্যা (মধ্য লয়)

স্থায়ীঃ অব মোরা মানোঁ কহনবা। পিয়া

জোড়ঃ কাহে গঁবাও চহনবা।।

অন্তরাঃ মাধো পিয়া কহেঁ, বহুত দিনন মেঁ

মোরে আয়ে সজনবা।।

শৈরঃ কোঈ দস্তুর নহী ইস্ক কে দীবানোঁ কা।

শমা নে হাল ন্ পুছা কভী পরবানোঁ কা।।

মাজরায়ে শবে গম, আপ ন পুছেঁ হমসে।

সুননা আসান নহীঁ দর্দকে অফসানোঁ কা।।

ঔর হম কুছ নহী কহতে, মগর ইতনা সুনলো

দিল দুখানা ন মুসীবত মেঁ পরেশানোঁ কা।।

ভাবার্থ ঃ

স্থায়ী ঃ এবার আমার কথা শোন। প্রিয় হে, কথা রাখো।

জোড় ঃ কেন শুধু শুধু ঠাট্টা তামাসায় চেঁচামেচি করছো ?

অন্তরা ঃ মাধব প্রিয় বলেছেন- অনেক দিন বাদে আমার প্রাণনাথ ঘরে এসেছেন।

শৈর ঃ প্রেমের পাগলের কোন নিয়ম রীতি নেই। প্রদীপ শিখা কখনো পতঙ্গের অবস্থা জানতে চায় না। নিস্তব্ধ রাত্রি আমাকে উপহাস করে। কিন্তু আপনি কোন দিন তা আমার কাছে জানতে চাননি। দুঃখের কাহিনী শোনা অত সহজ নয়। আমি আর কিছুই বলতে চাই না। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, যে ব্যাকুল হ'য়ে কষ্টে আছে, তার হৃদয় আর ব্যথিত ক'রে তুলবেন না।"[১১৪]

পাঞ্জাবী ঠুমরী ঘরানা

ঠুমরী গানের একটি অতি জনপ্রিয় ঘরানা হচ্ছে "পাঞ্জাব ঘরানা"। ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলের নামানুসারে এই ঘরানার নামকরণ হয়েছে। পাঞ্জাবী ঠুমরী পশ্চিমা শৈলীর ঠুমরী গানের আওতাভুক্ত। সংগীত শাস্ত্রীগণের মতে, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁকেই পাঞ্জাব ঘরানার প্রবর্তক হিসাবে মানা হয়। অল্প কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই ঘরানার ঠুমরী গায়নপদ্ধতি লক্ষ্ণৌ ঘরানার মতোই। এই ঘরানার ঠুমরীতে বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে পাঞ্জাবী গ্রাম্য গীতের অলংকার প্রয়োগ। পাঞ্জাবী ঠুমরীর নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গ্রাম্য গীতের অলংকার প্রয়োগ অন্যতম। এই রীতির ঠুমরীতে কাব্য-ভাব ফুটে উঠে মাদকতাপূর্ণ সুরের সমাগমে। এ ঘরানার ঠুমরীতে ব্যাকুলিত তান, পাঞ্জাবী "খড্ডা"[১১৫] ইত্যাদির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও হঠাৎ এ ধারার ঠুমরীতে অসমধর্মী বা অপ্রত্যাশিত কোন স্বরের প্রয়োগ এবং তার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাঞ্জাবী ঘরানার একটি ঠুমরী গান নিম্নে স্বরলিপি ও ভাবার্থসহ তুলে ধরা হলো –

১১৪। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ২৭- ২৮

১১৫। খড্ডা– পাঞ্জাবী গ্রাম্য সংগীতের অলংকার বিশেষ।

“রাগঃ পিলু

তালঃ দীপচন্দী (মধ্য লয়)

স্থায়ী

কাটে না বিরহা কী রাত

সখি পী বিন জোবন জাত।।

অন্তরা

সুধি বিসরাঈ মোরী অঙ্গনা ন ভাবে

কা সে কহুঁ যে বাত।।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

| সা গা সাগা মাধা | পা – জ্ঞা | রা সা – না্ I

কা টে না ০ ০০ | ০ ০ বি | র হা ০ কী

\+ ২ ০ ৩

I সা – সা | পা পা মা – | গা জ্ঞা রা | জ্ঞা রা সা না্ I

রা ০ ত | কা টে না ০ | ০ ০ ০ | বি র হা কী

\+ ২ ০ ৩

I সা – সা | গা মা পা – | পা পা গা | - মা মাপা মাধা পা I

রা ০ ত | স খি পী ০ | বি ন জো | ০ ০ ব ০ ০ ০ ০

\+ ২ ০ ৩

I জ্ঞা না সা

জা ০ ত

\+

অন্তরা

I | মা পা না না | র্সা – – | র্সা – – – I

সু ধি বি স | রা ০ ০ | ঈ ০ ০ ০

\+ ২ ০ ৩

I না – র্সা | না না না – | র্সা – না | র্সা নার্সা র্রার্সা ণা I

মো ০ রী | অঁ গ না ০ | না ০ ভা | ০ ০০ ০০ বে

\+ ২ ০ ৩

I ধা পা – | পা – পা পা | পা – মাপা | ধা পাধা ণাধা পা I

০ ০ ০ | কা ০ সে ক | হূঁ ০ যে০ | ০ ০০ ০০ ০

\+ ২ ০ ৩

I জ্ঞা ন্‌ সা

বা ০ ত”[১১৬]

\+

ভাবার্থ ঃ উল্লিখিত কবিতা বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, কোন এক প্রেমিকা তার মিত্রের কাছে নিজের বিরহের কথা ব্যক্ত করছে কিছুটা এরকম ভাবে–

স্থায়ীঃ সখী আমার বিরহের রাত যেন শেষই হতে চায় না। আর প্রিয়তম কে না পেয়ে আমার যৌবন বৃথা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অন্তরাঃ সে ভদ্রলোক মনে হয় আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছে। তাই আমার বাড়িতেও আর আসেনা। আমার এই দুখের কথা আমি কার কাছে বলবো?

বেনারসী ঠুমরী ঘরানা

পূর্বীয়া শ্রেণিভুক্ত একটি স্বনামধন্য ঠুমরী ঘরানার নাম 'বেনারস'। খেয়াল অঙ্গে গীত এই ঠুমরী ঘরানার আবিষ্কার কার দ্বারা হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য আজ অবধি জানা যায়নি। তবে এই ঘরানার প্রচার-প্রসারে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসাবে মৌজুদ্দীন খাঁ'র নাম সবার আগে আসে। বেনারস বা বারাণসী অথবা বানারস ঘরানার ঠুমরী গান খেয়াল অঙ্গে গাওয়া হলেও এ গান গম্ভীর প্রকৃতির এবং লয় বা গতি অপেক্ষাকৃত ধীর হয়ে থাকে। এই ঘরানার ঠুমরীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে গায়নরীতিতে সংক্ষিপ্ত আলাপ ও ক্ষুদ্রাকৃতির তান ক্রিয়ার উপস্থিতি দেখা যায়। বেনারসী ঠুমরীতে স্বর প্রয়োগের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রতিটি স্বর স্বতন্ত্রভাবে ঠুমরী গানের কাব্য-ভাব ও রস ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। কোন রকম চঞ্চলতা এই ঘরানার ঠুমরী গানে পরিলক্ষিত হয় না। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই ধারার ঠুমরী গানে ভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটানো হয়ে থাকে যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বেনারস ঘরানার ঠুমরী গানের একটি 'বন্দিশ' ভাবার্থসহ নিম্নে দেওয়া হলো –

১১৬। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলকাতাঃ দীপায়ন, ১৪০৫), পৃ. ৫৬–৫৮

"রাগঃ পিলু বারোয়া

তালঃ ত্রিতাল (মধ্য লয়)

স্থায়ীঃ ভোর ভয়ো কুছ দের ভঈ

প্রভু নিরুখে হাম্‌রী ওর।।

অন্তরাঃ না জানে কিস পাপকী গঠরী

দুঃখ সে ভরী চহু ওর।।

ক্‌হত তুম্‌হী সে দেখ দুখী স্‌ব

কাটো অব এহী ভোর।।"[১১৭]

ভাবার্থ ঃ উপরিউক্ত ঠুমরী গানের কাব্যাংশ বিশ্লেষণ করলে এর ভাবার্থ হয় কিছুটা এরকম–

স্থায়ীঃ সকাল হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, নীলাকাশে আলোর ঘনঘটা। হে দয়াময়, আমার প্রতি দৃষ্টি দান করুন।

অন্তরাঃ যে দিকেই তাকাই, শুধু দেখি অজানা কোন পাপের বোঝায় চারদিক যেন দুঃখে ভরে গেছে। হে প্রভু, আপনার নিকট আমার আকুল আবেদন– সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিন।

কিরাণা ঘরানা

ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ ছিলেন কিরাণার যন্ত্রসংগীত ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর গুরু নির্মল শাহ'র নিকট যন্ত্রসংগীতের তালিম নেন। নির্মল শাহ্‌ ছিলেন মিঞা তানসেনের বংশধর। আর কিরাণার কণ্ঠসংগীত ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন ওস্তাদ বাজিদ আলী খাঁ। তবে আধুনিক কিরাণা ঘরানার জনক হিসাবে ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেব কেই মানা হয়। এই ঘরানার অতি সুরেলা ঠুমরী গান শ্রোতার মনকে সহজেই আন্দোলিত করে। এই ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়কগণের মধ্যে আব্দুল করিম খাঁ, আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ, হীরাবাঈ বরোদেকর, সরস্বতী বাঈ রাণে, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, আমীর খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, প্রমুখ গায়কগণ উল্লেখযোগ্য। কিরাণা ঘরানার ঠুমরীতে গানের বাণী অপেক্ষা সুরের ব্যাপকতা প্রাধান্য পায়। এই ঘরানার ঠুমরীর একটি বিশেষ দিক রয়েছে আর তা হলো ভিন্ন ভিন্ন স্বর-বিন্যাস দ্বারা গানের একই বাণীর প্রত্যাগমন ঘটে। এই ঘরানার গায়কিতে চপলতা নেই, রয়েছে স্বর প্রয়োগের বিশেষ ঢং বা কায়দা ও ধীর গতি। কিরাণা ঘরানার ঠুমরীতে সুর-বিস্তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘরানার একটি জনপ্রিয় ঠুমরী গান নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১১৭। তদেব, পৃ. ৩৭

“রাগঃ যোগীয়া

তালঃ কাহারবা (বিলম্বিত লয়)

স্থায়ী– পিয়া কে মিলন কী আস

দিন দিন জোবনবা নহীঁ জাত।

অন্তরা– জবসে গয়ে মোরে সুধ হুঁন লীহ্নী

কৈসে জাউ মেঁ পিয়া কে পাস।।

স্থায়ী

৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪
সারে	মা	-মা	পাদা	পাদা	র্সা	–	র্সা	–
পিয়া	কে	০মি	লন	কী০	আ	০	স	০
	০				+			

দাদা	দাপা	পা	পাপা	দা	পামা	ঋামা	ঋমপদা
দিন	দিন	জো	বন	বা	০ ০	ন ০	হীঁ ০০০
০				+			
দপমগা	ঋা	সদ্	–	সা	–	–	
জা০০০	০	০ ০	০	ত	০	০	
০				+			

অন্তরা

–	মামা	পা	–দা	র্সা	–	ঋর্া	র্সা
০	জ ব	সে	০ গ	য়ে	০	মো	রি
০				+			
–	র্সার্সা	ঋর্া	–মা	ঋর্া	–	র্সা	–
০	সু ধ	হু	০ ন	লী	০	নী	০
০				+			
ঋর্া	র্সা	নার্সা	না	দা	দা	পা	–
কৈ	০	সে ০	০	জা	উ	মৈ	০
০				+			
মা	পা	মপদা	পা	মা	ঋর্া	–র্সা	–

পি য়া কে ০০ ০ | পা ০ ০ স ০ "[১১৮]
০ +

ভাবার্থঃ উক্ত বন্দিশটি বিবেচনা করলে এর ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে –

স্থায়ীঃ প্রিয় মানুষের সঙ্গে মিলনের তীব্র আশা মনে নিয়ে অপেক্ষায় আছি, কিন্তু প্রতিনিয়ত আমার যৌবন লোপ পাচ্ছে বা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অন্তরাঃ যে দিন থেকে সে দৃষ্টির আড়াল হয়েছে সে দিন থেকে আমার চিন্তা-বুদ্ধি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কি করে আমার প্রিয় মানুষের কাছে যাবো ?

বাংলা ঘরানা

কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল থেকে বাংলা ঘরানার সূত্রপাত ঘটে। বাংলা ঘরাণার ঠুমরী মূলত লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঠুমরীর প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ইংরেজ সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ নির্বাসিত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং সঙ্গে নিয়ে আসেন প্রসিদ্ধ ঠুমরী গায়নরীতি ও সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের। এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় ঠুমরী গানের চর্চা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তবে এই ঘরানা উদ্ভাবনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ও গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)। তাঁদের প্রভাবেই বাংলা ঠুমরী ঘরানা গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। এই ঘরানার ঠুমরীর গায়নরীতিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর তা হলো– ঠুমরী গায়নকালে তাল প্রয়োগে ছন্দময় চটুলতা। এছাড়াও রয়েছে গানের বাণীতে সুরের ব্যাপকতা। বাংলা রীতির ঠুমরী গানের চলনে তালের লাস্য ভাবের সাথে কাব্য-ভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পায়। এই চালের ঠুমরী গানে সুর প্রয়োগ এমন ভাবে করা হয় যে, গানে সংশ্লিষ্ট রাগের রাগরূপ প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার অলংকার, তান, বিস্তার ইত্যাদি বিকশিত হয়ে থাকে। এই ঘরানার ঠুমরী গানে "লচাও ঠুমরীর" প্রভাব লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে এই বাংলা ঘরানার ঠুমরী গানের ধারক ও বাহক হিসাবে অসামন্য অবদান রাখেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। এছাড়াও শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব (যিনি প্যারা খাঁ নামেও খ্যাত) কলকাতার বা বাংলা ঘরানার ঠুমরী গানের ওস্তাদ হিসাবে সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিলেন। অপরদিকে নূরজাহান বাঈ, জোহরা বাঈ, অমিয়নাথ স্যানাল প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ বাংলায় ঠুমরী রীতির অগ্রগতিকে বেগবান করেছিলেন। লচাও ভাবযুক্ত একটি ঠুমরী গান স্বরলিপি সহযোগে নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১১৮। তদেব, পৃ. ৫১–৫২

"রাগ ঃ ভৈরবী

তাল ঃ দীপচন্দী (ঢিমালয়)

স্থায়ী– জাও ছোড় মোরী বৈয়াঁ

নিলাজ দেখত নাহি ঘরমে ননদীয়া।

অন্তরা– তুম নাছোড় হৈ ধাবত নিশ দিন

বোল বোলত হি বৈরী ননদীয়া।।

স্থায়ী

পাদা র্সানা দা | পা মাজ্ঞা মা পা | মাজ্ঞা মাদা পা | সাঋা মাজ্ঞা ঋা সা

জা ০ ০০ ও | ছো ড় ০ মো রী | বৈ ০ ০০ ০ | য়াঁ ০ ০০ ০ ০

০ ৩ + ২

দা পা জ্ঞা | জ্ঞা পা দা পা | জ্ঞামা মাদা পামা | জ্ঞারা মাজ্ঞা ঋা সা

নি লা জ | দে খ না হি | ঘ ০ র ০ মে ০ | ন ০ ন ০ দি য়া

০ ৩ + ২

অন্তরা

র্সা র্সা ঋা | ণার্সা -ণা ণাদা ণাদা | দা র্জ্ঞা ঋর্জ্ঞা | ঋর্া ঋর্া র্সা র্সা

তু ম না | ছো ০ ০ড় হৈ ০ ০০ | ধা ব ত ০ | নি শ দি ন

০ ৩ + ২

দা – দা | পানা পার্সা ণা দা | জ্ঞামা দাপা মাজ্ঞা | জ্ঞারা মাজ্ঞা ঋা সা

বো ০ ল | বো ০ ল ০ ত হি | বৈ ০ ০০ রী ০ | ন ০ ন ০ দি য়া "[১১৯]

০ ৩ + ২

উপরিউক্ত ঘরানাগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি ঠুমরী ঘরানা রয়েছে। তাদের মধ্যে পাটনা ঘরানা, বম্বাই/ বম্বে/ বোম্বে ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, ফারুখাবাদ ঘরানা, মহারাষ্ট্র ঘরানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ঘরানাগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা খুব বেশি নজরে পড়ে না। অধিকাংশ সময় স্বনামধন্য বা জনপ্রিয় ঘরানাগুলোর প্রভাব এতে দেখা যায়। তবে এই ঘরানাগুলো পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ইত্যাদি ঘরানাগুলোর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়, কিছু কিছু পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি ঘরানার ঠুমরী গানের মধ্যেই রয়েছে। যেমন–

১১৯। তদেব, পৃ. ৭০-৭১

মহারাষ্ট্র ঠুমরী ঘরানায় মধ্য বা দ্রুত গতির খেয়াল অঙ্গের ঠুমরী গায়ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এছাড়া মহারাষ্ট্র ঘরানার ঠুমরীর গায়নরীতিতে গানের বাণী অপেক্ষা সুর-বিস্তারের প্রাধান্য রয়েছে। অপর দিকে আগ্রা ঘরানার তানের লয়কারি অন্যান্য ঠুমরী ঘরানা থেকে নিজেকে পৃথক করে। দিল্লী ও ফারুখাবাদ ঘরানায় ঠুমরী গীত হয় খেয়াল অঙ্গে। আবার পাটনা ঘরানার ঠুমরী গানে আঞ্চলিক গ্রাম্য সংগীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সকল ঘরানার ঠুমরী গানই যে ভাব-ব্যঞ্জনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে শ্রোতাবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করে এ কথা বলা বাহুল্য।

উল্লেখ্য যে, উত্তর প্রদেশের গ্রাম্যগীত বা লোকগীতি থেকে যখন ঠুমরী গান বিকশিত হয়ে একটা পর্যায় লাভ করে তখন থেকে ঠুমরী গান খেয়াল অঙ্গেই গাওয়া হতো। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ সংগীত গায়কগণের সুনজরে পড়ে বিভিন্ন ঘরানার গায়নরীতির প্রভাব পড়ে ঠুমরী গানে। সৃষ্টি হয় ঠুমরী গানের নতুন রূপ। ঠুমরীতে সংযুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন প্রকারের অলংকার। যেমন– সংক্ষিপ্ত আলাপ, ক্ষুদ্রাকৃতির তান, সূত, কণ্, খটকা, ঝটকা, মীড়, মুর্কী ও জমজমা ইত্যাদি। তবে প্রতিটি ঘরানার গায়নপদ্ধতি ভিন্ন। তাই একেক ঘরানায় একেক অলংকার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরানা কোন একটি বিশেষ গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করে, যার কারণে একটি থেকে অন্য আরেকটি ঘরানার ঠুমরীতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নির্দিষ্ট কোন ঘরানার গায়নশৈলীর স্বকীয়তা বজায় রেখে ঠুমরী গাওয়ার মতো গায়কের সংখ্যা বর্তমানকালে স্বল্প পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের অধিকাংশ ঠুমরী গায়ক নিজস্ব গায়নরীতির সাথে ভিন্ন ঘরানার ঠুমরী গানে প্রয়োগকৃত বিভিন্ন শ্রুতিমধুর অলংকার বা গায়নরীতির বিষয়বস্তুর মিশ্রপ্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। বর্তমানে ঠুমরী গানের একটি মিশ্ররূপের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঠুমরীর এই রূপান্তরিত গায়নপদ্ধতি ঠুমরী গানরে মনোমুগ্ধকারী ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে বলে সংগীত শাস্ত্রীগণ মনে করেন।[১২০]

৪.৩.৪ নাটকীয়তা

ভারতীয় রাগসংগীতের প্রধান প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে ঠুমরী একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ধারা। এই ধারার গায়নশৈলীতে বিচিত্র প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাটকীয়তা শব্দটি যখন উচ্চারিত হয় তখনই নাটকের কোন দৃশ্য বা অভিনয় আমাদের মনে কল্পিত হতে থাকে। অর্থাৎ চোখের সামনে কোন এক দৃশ্যপট চলে আসে। নাটককে তাই সাহিত্যের ভাষায় দৃশ্যকাব্য বলা হয়ে থাকে। নাটকীয়তা প্রসঙ্গে এভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বা অভিনয় শিল্পী যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠের প্রয়োগে কোন চরিত্রের উক্তি ব্যক্ত করে বা প্রতিষ্ঠিত করে, তাই নাটকীয়তা। যেহেতু গান এবং নাটক উভয়ই কণ্ঠ নির্ভর সেহেতু বলা যায় যে, ঠুমরী গানের

১২০। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫)

সাথেও নাটকীয়তার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শুরুতে যে পদ্ধতিতে ঠুমরী গান পরিবেশিত হতো তাতে নৃত্য ও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেই গানের কাব্যাংশকে শ্রোতাগণের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা হতো। গায়নশৈলীর এই পর্যায়ে ঠুমরী গান পরিবেশনকালে যেসব বিষয় গুরুত্ব বহন করে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

ঠুমরী গান পরিবেশনকালে নাটকীয়তা বজায় রাখতে যে বিষয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে ছেদ-যতি চিহ্ন, উচ্চারণ, বাচ্য-বদল, অতি-পদ, অঙ্গভঙ্গি, উচ্ছ্বাস, রস-ভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যে পদ্ধতিতে বা যে চিহ্ন ব্যবহার করে কোন বাক্যকে ছন্দময় এবং অর্থবহ করে তোলা হয় তাকে ছেদ-যতি চিহ্ন বলে। ঠুমরীতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঠুমরী গানে ছেদ বা যতি চিহ্নের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গানের কোন বাক্য বা পদকে ভেঙ্গে বিভিন্ন ছন্দে এবং ছোট আকারে ব্যক্ত করা হয়। ঠুমরীতে ব্যবহৃত ছেদ ও যতি চিহ্ন গুলোর মধ্যে– (,) সমাচ্ছেদ, (;) অর্দ্ধচ্ছেদ, (।) পূর্ণচ্ছেদ, (?) জিজ্ঞাসা, (!) বিস্ময়, (–) দীর্ঘ, (~~~) কম্পিত, (....) থেমে থেমে ও (:) হলন্তে ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ 'আমি যাব না' এই বাক্যটির প্রয়োগ কৌশল ছেদ-যতি চিহ্নে কি রকম তা তুলে ধরা হলো–

"আমি যাবো না।	আমি; যা–বো – না।
আমি– যাবো না।	আমি? যাবো না।
আমি যাবো – না।	আমি? যাবো? না।
আমি, যাবো না?	আমি যাবো? না।
আমি যাবো! না।	আমি ! যাবো না?
আ-মি – যাবো না।	আমি ! যাবো না।
আমি, যাবো! না:।	আমি যা –বো– না।
আমি.... যাবো.... না।	আমি যাবো– না–।
আ–মি– যা–বো– না–।	আমি ~~~~~ যাবো ~~~~~ না ~~~~~।"[১২১]

ঠুমরী গান ভাবপ্রধান এক প্রকার সংগীত ধারা, তাই গানের বাণীর প্রতিটি শব্দের প্রকাশ বা উচ্চারণ হয়ে থাকে কাব্য-ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে। শব্দের উচ্চারণ ঠুমরীর ভাব–রস উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ঠুমরী গানের সঠিক ভাবার্থ প্রকাশে উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– তীব্র, গম্ভীর, ক্ষীণ, বেগ, বিনয়, কম্পন, একাগ্রতা, ধীর ইত্যাদি বিষয়গুলো শব্দের উচ্চারণের সময় বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এ উচ্চারণরীতি গুলো

১২১। পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহড়ী*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: দীপায়ন, ১৪০২), পৃ. ১৯

বিশেষণ হিসাবে কাজ করে। এগুলো মূলত বাক্যে ব্যবহৃত কোন শব্দের গুরুত্ব বা বিশেষত্ব প্রকাশের নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো মাধুর্য বাড়িয়ে তোলার জন্য ঠুমরী গানে কণ্ঠস্বরের বিভিন্নপ্রকার তারতম্যের সাহায্যে কোন শব্দ বা বাক্যাংশের উচ্চারণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। এই গানের গায়নশৈলীতে যেমন নাটকীয়তার গুরুত্ব অসীম, অপরদিকে নাটকীয়তার মধ্যেও একটি বিশেষ অংশ হলো রস-ভাব। কাব্যের বিশেষায়িত অর্থই রস যা শ্রোতার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি করে। আর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাব্য-রস শ্রোতার নিকট উপভোগ্য বা সহজবোধ্য করে তুলে ধরা হয় তাকে ভাব বলে। রস ও ভাব একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। তাই একসঙ্গে এরা রস-ভাব নামে পরিচিত। ঠুমরী গানের অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গণ্য এই রস-ভাব। নয় রকমের রসের ব্যবহার হয় সাহিত্যে। তবে ঠুমরী গানে এই রসগুলোর মধ্যে কেবল শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য অধিক। ক্ষেত্র বিশেষে করুণ ও শান্ত রসের ব্যবহারও লক্ষণীয়। ঠুমরী গানে প্রযুক্ত রাগ ও তাল ঠুমরীর রস-ভাব প্রকাশে ভূমিকা রাখে। অধিকাংশ ঠুমরী গানেই নারীর ঐকান্তিক প্রেমের বিষয় প্রাধান্য পায়। এই সকল বিষয় ব্যক্ত করতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উৎপত্তি ঘটে। যেমন– সুখ, দুঃখ, সন্দেহ, আশা, বিরক্তি, হতাশা, ভীতি, বিরহ, মিনতি ইত্যাদি। উক্ত ভাবগুলো ঠুমরী গায়ক বিশেষ সাবধানতা ও কুশলতা অবলম্বন করে নিষ্ঠার সাথে ফুটিয়ে তোলেন। তবে ভাব প্রকাশে উপযুক্ত স্বর বিন্যাসের দ্বারা ঠুমরীর রস ও ভাব উভয়ই শ্রোতার চিত্ত হরণ করে। তাই রস-ভাব প্রকাশের নিমিত্তে গায়ক বা গায়িকা ঠুমরীতে ব্যবহৃত রাগের সাথে সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্র স্বর-বিন্যাস ঘটিয়ে থাকেন। কখনো কখনো গানের ভাব-রস প্রকাশে রাগ বহির্ভূত স্বরের প্রয়োগ করা হয়। এই গানকে অধিক মাত্রায় শ্রোতাবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে একটি বিশেষ পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়, আর তা হলো বাচ্যের পরিবর্তন। অথাৎ, এর মাধ্যমে শুধু বাচ্যের বা উক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করা হয় মাত্র, বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই প্রক্রিয়ায় কোন বাক্যকে ভেঙ্গে খণ্ডিত অংশগুলোকে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঠুমরী গানকে অধিক হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ খাম্বাজ রাগের অন্তর্গত ও যৎ তালে নিবদ্ধ একটি ঠুমরী গানের বাচ্য-বদল করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

কন গলী গায়ো শ্যাম বাতা দে মোরে সাইয়া।
শ্যাম গায়ো কন গলী বাতা দে মোরে সাইয়া।
মোরে সাইয়া বাতা দে শ্যাম গায়ো কন গলী।
বাতা দে মোরে সাইয়া কন গলী গায়ো শ্যাম।
শ্যাম গায়ো কন গলী মোরে সাইয়া বাতা দে।

– ইত্যাদি।

ঠুমরী গানের কবিতার অংশগুলোকে খণ্ডিত করে বা ওলট-পালট করে বাচ্য পরিবর্তন করা হয় এবং এ পরিবর্তিত রূপটি গাওয়ার ক্ষেত্রে রাগের স্বর-বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ঠুমরী গানের ভাব, অর্থ, রঞ্জকতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যা বিশেষভাবে সহায়তা করে তা হলো অতিপদ। অতিপদের অর্থ হলো অতিরিক্ত পদ। অর্থাৎ ঠুমরী গানের কবিতায় ব্যবহৃত বাক্য বা পদগুলোর আগে, পরে বা মাঝখানে অতিরিক্ত কোন অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা পদের ব্যবহারকে অতিপদ বলে। বিভিন্ন ধারার গানে অতিপদের প্রয়োগ করা হয়। তবে সেই তুলনায় ঠুমরী গানের বিশেষ অর্থ বা ভাব প্রকাশে অতিরিক্ত পদের ব্যবহার অধিক। অতিপদ সংযোজনের ক্ষেত্রে স্বরের বিন্যাস যথাযথভাবে করা অত্যাবশ্যক। এই ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঠুমরী গায়কের তাৎক্ষণিক সংযোজন ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এর পাশাপাশি ভাষার যথাযথ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত ঠুমরী গানে যে সকল বর্ণ বা অক্ষর, শব্দ অতিপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে – এ,ও, রা, রী, বে, গা, কা, ক্যা, না, সে, তু, হা, হাঁ, হে, হো, ইত্যাদি অক্ষরগুলো এবং রাম, রামা, সৈঁয়া, সজনা, পিয়া, সখী, তুম্, হম্, মেরা, মেরী, মোরী, মোরা, অব, তব, জব, কহ, বোলো, আরে, হায় ইত্যাদি শব্দগুলো উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে ওরে সনম, ও মেরে সজনা, হায় রাম, রে সাওয়ারীয়া, বালম রে, বালামওয়া, সখী রী, হা রে শ্যাম, তোরে সাথ, তু বড়া, মোরা সাইয়া, বাতা দে, শ্যাম রে ইত্যাদি পদগুলো ঠুমরী গানের ভাব-রস বৃদ্ধি করতে অতিপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত অতিপদসমূহ কোথায় কিভাবে সংযোজন করা হবে, রাগের কোন স্বরের সাথে বা আগন্তুক কোন স্বরের সাথে অতিপদের সমন্বয় ঘটবে তা নির্ভর করে ঠুমরী গায়কের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার উপর।[১২২] ঠুমরী গান তখনই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে যখন উক্ত অতিপদসমূহের সাথে স্বরের সঠিক সমন্বয় ঘটবে। ঠুমরী গানের গায়নশৈলীতে শিল্পীর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বিশেষ প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত করা হয়ে থাকে যা মুদ্রা হিসাবেও পরিচিত। কোন নাটককে অর্থবহ ও আকর্ষণীয় করতে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে দর্শকবৃন্দকে সহজে একটি ধারণা দিতে অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক মুদ্রার ব্যবহার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একই ভাবে ঠুমরী গানেও এরূপ মুদ্রার প্রয়োগ ঘটে থাকে যেহেতু ঠুমরীর সাথে নাটকীয়তার একটা সুসম্পর্ক ঠুমরী গান সৃষ্টির শুরু থেকেই রয়েছে। তৎকালীন সময়ের সংগীতজ্ঞগণ তথা ঠুমরী গানের কলাকারগণ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ঠুমরী গান পরিবেশন করতেন। অনেকে আবার গানের মূলভাব প্রকাশার্থে ঠুমরী গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করতেন। আবার অনেকেই ঠুমরী গানকে নৃত্যের মাধ্যম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া ঠুমরী গান প্রাক্কালে মহিলা বা বাঈজীরা দাঁড়িয়ে নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করত। এমন কি ঠুমরীর বিকাশ কালেও নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ঠুমরী গানে বিভিন্ন রকমের অঙ্গভঙ্গির প্রয়োগ

১২২। তদেব

দেখিয়েছেন। তবে বর্তমানে ঠুমরী গানে নৃত্য বা কোন মুদ্রার প্রয়োগে ব্যাপকতা না থাকলেও গায়ক ঠিকই গানের ভাব অনুসারে সামান্য হলেও হাত ও মাথার রুচিসম্মত সঞ্চালন করে থাকেন। ঠুমরী গানে নাটকীয়তা তথা নৃত্য বা ভাও এর প্রয়োগ গানের কাব্য-ভাব, রস-ভাব ও মর্ম-ভাব শ্রোতাবৃন্দের নিকট সহজবোধ্য করে এবং ঠুমরী গানকে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়তা করে। নাটকীয়তা ঠুমরী গানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এটি ঠুমরী গানের বিশেষ অলংকার স্বরূপ যা ঠুমরীর সকল ভাব, রস, বিরহ-বেদনা পিছনে ফেলে উচ্ছ্বাসের প্রভাবে গানের অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে আসে। ঠুমরী গানের উঠান পর্বে এসে মত্ত-উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব ঘটে। মত্ত-উচ্ছ্বাস বলতে সীমাহীন আনন্দে আত্মহারা এইরূপ অবস্থাকে বোঝায়। ঠুমরী গানের অন্তিম পর্ব যেমন উঠান, অনুরূপভাবে নাটকীয়তার শেষ ধাপ হচ্ছে মত্ত-উচ্ছ্বাস। এই পর্যায়ে এসে নারী তার মনের শোক, দুঃখ, ভয়, সন্দেহ, নিরাশা, লজ্জা, অসম্ভ্রম, অপমান ইত্যাদি সকল মোহ ও বন্ধন থেকে মুক্ত ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। মত্ত-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ঠুমরী গায়ককে অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কারণ এ সময় ঠুমরী গানে পূর্বে ব্যবহৃত নাটকীয়তার প্রতিটি পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং সাথে বিভিন্ন প্রকার অলংকারের প্রয়োগ ও স্বরের বিন্যাস ঘটতে থাকে যাতে অনুমেয় হয় যে, ঠুমরী গানের পরিবেশনার অন্তিম পর্ব চলছে। সব শেষে বলা যায় যে, ঠুমরী গান সংগীতের অন্য সকল ধারা থেকে পৃথক হিসেবে পরিচিত হয়েছে কারণ এটি ভাবপ্রধান শৃঙ্গার রসাত্মক গীত। তাই এই ধারার গানে নাটকীয়তার ব্যবহার থাকাই যুক্তিযুক্ত।

৪.৩.৫ গায়কের গুণ-অবগুণ

গুণ ও অবগুণ বলতে সাধারণত কোন কিছুর ভালো ও মন্দ দিকটিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংগীতের ক্ষেত্রেও এর অস্তিত্ব রয়েছে। অতএব, ঠুমরী গানের গায়ক–গায়িকাদের মধ্যেও দোষ–গুণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বর্তমানে ঠুমরী গানের প্রচার-প্রসারের আধিক্যের কারণে অনেকেই ঠুমরী গান গেয়ে থাকেন এবং এদের মাঝে কেউ কেউ প্রসিদ্ধ গায়ক–গায়িকা হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। অপরদিকে ঠুমরী গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঠুমরী গানের বিশেষজ্ঞদের নজরে আসে, যা গানের মনোরঞ্জক উপস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে ঠুমরীসহ সংগীতের সকল ধারা পরিবেশন কালে ভালো দিকটি গ্রহণ করে দোষ বা খারাপ দিকটি বর্জন করাই গায়ক–গায়িকাদের জন্য শ্রেয়। একজন প্রসিদ্ধ ঠুমরী গায়ক বা গায়িকা হওয়ার জন্য যে সকল বিশেষ গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং যেসব অবগুণ বর্জনীয় সে প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

প্রথমেই আসা যাক সুমিষ্ট কণ্ঠ প্রসঙ্গে, কেননা ঠুমরী গান এমনি একধরনের গান যা ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তিকে রাগ ও তালের সহযোগে চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশ করে। শ্রোতাবৃন্দের চিত্তহরণের জন্য সাবলীল গায়কির সাথে প্রয়োজন গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে নমনীয়তা, মিষ্টতা, মায়াভরা সুর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। উপযুক্ত তৈরি কণ্ঠ না হলে ঠুমরী গানের আবেগ, অনুভূতি বা মূলভাব প্রকাশ করা কঠিন। যেহেতু কয়েকটি বিশেষ রাগে ঠুমরী গান গাওয়া হয়ে থাকে সেহেতু, একজন ঠুমরী গায়কের অবশ্যই সংগীতের স্বর সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তিনটি সপ্তকেই (মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তক) স্বর প্রয়োগের দক্ষতা বা ক্ষমতা একজন ঠুমরী গায়কের থাকা বাঞ্ছনীয়। গানের কবিতার ভাব ও এর সাথে সম্পর্কিত রাগের রস ফুটিয়ে তুলতে যেকোন সময় যেকোন স্বর প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। তাই স্বর প্রয়োগের নিপুণতা একজন ঠুমরী গায়ক-গায়িকার একটি বিশেষ গুণ। স্বর-জ্ঞানের পর যে গুরুত্বপূর্ণ গুণটি একজন ঠুমরী গায়কের থাকা দরকার তা হলো তাল ও লয় সম্পর্কে দক্ষতা। সাধারণত ঠুমরী গানে যে তালগুলো ব্যবহার করা হয় তাদের পরিচয়, গতিবিধি এবং ঠুমরী গানে তাদের প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। তালের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ বিষয় হচ্ছে লয়। তাল ও লয়ে পরিপক্ব জ্ঞান যে গায়ক বা গায়িকার মধ্যে বিদ্যমান, তাঁর পক্ষে সংগীতের সকল শাখায় বিচরণ করা সম্ভব। ঠুমরী গানে লয়ের সঠিক প্রয়োগ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার লয়ে ঠুমরী গান গাওয়ার ক্ষমতা ঠুমরী গায়কের থাকা একান্তভাবে কাম্য। যেমন– ঠায় লয়ে দীর্ঘ সময় বহাল থাকা আবার প্রয়োজন মতো লয় মধ্য বা দ্রুত গতির হয়ে গেলে তার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে গান করার ক্ষমতা থাকা। তাল ও লয়ের সাথে আরেকটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা ছন্দ নামে সকলের নিকট অধিক পরিচিত। ঠুমরী গানে কুশলী গায়কগণ ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন যা ঠুমরী গানের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করে। গায়নকালে ঠুমরী গানে বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ, বিরতি, স্বরের উঠা-নামা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রয়োজন মতো তা ঠুমরী গানে প্রয়োগ করাও একটি বিশেষ গুণ। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের অলংকার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও ঠুমরী গায়কের গুণাগুণের পর্যায়ভুক্ত।[১২৩] ঠুমরী গানে ব্যবহৃত রাগের রাগরূপ প্রকাশের পাশাপাশি গানের পদগুলোকে প্রয়োজন মতো ভেঙ্গে ভাব-রসাত্মক বিভিন্ন প্রকার অলংকারের প্রয়োগ বা স্বরবিন্যাস দ্বারা শ্রোতাগণের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতাও গায়কের অন্যতম একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য। ঠুমরী গান গাওয়ার পূর্বে গানের বাণী বা কাব্যাংশের ভাষাগত অর্থ, ভাবগত অর্থ বা ভাবার্থ ও মনন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ঠুমরী গায়নকালে স্পষ্টভাবে তা উপস্থাপন বা ব্যক্ত করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। রাগের স্বর ও গানের কথার

১২৩। তদেব

বিন্যাস ঘটানো হয় ঠুমরী গানের বিস্তার পর্বে। বিস্তারের সময় প্রয়োজন মতো স্বরের উঠা-নামার সাথে গানের কলির সংযোজন অথবা বিয়োজন ঘটিয়ে উপস্থাপন করাও ঠুমরী গায়কের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। উক্ত গুণবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যেক ঠুমরী গায়কের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। সঠিক সময়ে সঠিক গুরু বা শিক্ষক নির্বাচন করা ঠুমরী গায়ক বা শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত তালিম, পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা এবং শিক্ষার্থীর নিরলস প্রচেষ্টা ঠুমরী গায়ক হিসাবে যোগ্যতা অর্জনে অপরিহার্য বিষয় বলে বিবেচ্য। ঠুমরী গানের পরিবেশন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় ভিন্ন ভিন্ন গায়ক-গায়িকা ভেদে। কেউ তান প্রয়োগে প্রাধান্য দেয় আবার কেউ বিস্তারে। কেউ কেউ আবার অলংকার প্রয়োগে জোর দেন, কেউ আবার বোল-বানাও এ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে যে যাই প্রাধান্য দিক না কেন, নিজ গায়কিতে ঠুমরী গানের কাব্য-ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গায়ক-গায়িকাই যত্নবান। ঠুমরী গানের চর্চার ক্ষেত্রে এর গায়কগণের ভাষা জ্ঞান থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এই ঠুমরী গান গেয়ে থাকে। অঞ্চল ভেদে তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ঠুমরী গানও বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়। যেমন– হিন্দি, উর্দু, ব্রজবুলি, ইত্যাদি। তাই ঠুমরী গায়কের ভাষার জ্ঞান না থাকলে বা কম থাকলে গানে ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ না হলে গানের মূলভাব বা কবিতাংশের অন্তর্নিহিত রস-ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। তাই নিজ ভাষার পাশাপাশি ঠুমরী গানে যে সকল ভাষার ব্যবহার করা হয় বা ঠুমরী যে সমস্ত ভাষাকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানর্জন করা ঠুমরী গায়কের অন্যতম প্রধান কাজ। অনেকেই ঠুমরী গান গেয়ে থাকেন তবে সঠিক তালিম বা অধ্যবসায়ের অভাবে সব গায়কের ঠুমরী গান শ্রোতার মনকে আন্দোলিত করতে পারে না। একটি মুখ্য রাগের সাথে সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ সবসময় ঠুমরী গানকে অধিক সুশ্রাব্য করে তোলে। তবে কোন কোন গায়ক বা গায়িকা এমনভাবে ঠুমরী গান গেয়ে থাকেন যে মুখ্য রাগটি তার অস্তিত্ব হারিয়ে গৌণতা স্বীকার করে, অন্যদিকে ক্রমশ গৌণ রাগগুলোর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এইকারণে প্রকৃত রাগটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পরে। রাগের যথাযথ প্রয়োগবিধি না জানা থাকলে গানের গুরুত্ব কমে যায়। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন গায়ক ঠুমরী গানের বাণী সম্পূর্ণ গাইছেন না। কেউ হয়তো অন্তরার অংশ বাদ দিয়ে পরিবেশনা করছেন আবার কেউ সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর হয়ে ঠুমরী গান গাইছেন। এই অসম্পূর্ণ গায়নরীতির জন্য ঠুমরী গানটির কাব্য-ভাব উত্তমরূপে ফুটে উঠেনা। এই ধরনের ঠুমরী গায়নশৈলী যা ঠুমরী গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বাধার সৃষ্টি করে তা বর্জন করা সকল ঠুমরী গায়ক-গায়িকার দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য। অনেকেই আবার কোন বিশিষ্ট গুরুর কাছে ঠুমরী গায়নের কোন প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ না করেই ঠুমরী গেয়ে থাকেন। এ ধরনের গায়কগণের মধ্যে আবার এমন অনেকেই রয়েছেন যারা মূলত খেয়াল গান গেয়ে থাকেন। ফলে ঠুমরীতে

খেয়ালের ক্রিয়া প্রতিফলিত হতে থাকে আর ঠুমরী তার পরিচয় হারাতে থাকে। দেখা যায় যে, তারা কিছু ঠুমরী গান সংগ্রহ করে রপ্ত করেন এবং নিজেই তা গাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। এক্ষেত্রে গায়কের কণ্ঠস্বর খেয়াল গায়নের জন্য উপযুক্ত হলেও কোমল প্রকৃতির ঠুমরী গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযোগী। কারণ হিসাবে বলা যায়, ঠুমরী গানের কাব্য-ভাব, গায়কের কণ্ঠস্বরের নমনীয়তা, গীতের ধরন, গায়ন কৌশল সবই খেয়াল গায়কের প্রতিকূলে। খেয়াল গায়নের জন্য গলায় যে গমক, দরাজ আওয়াজ ও মেজাজের উৎপত্তি বা আবির্ভাব ঘটে তা ঠুমরী রীতির গান গাওয়ার জন্য অনুকূল ভূমিকা পালনে অক্ষম। তাই ঠুমরী গান গাওয়ার পূর্বে ঠুমরী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন পূর্বক গুরুর নিকট তালিম প্রাপ্ত হয়ে ঠুমরী গাওয়া অত্যাবশ্যক। তাহলেই ঠুমরীর মাধুর্যতা ও মর্যাদা উভয়ই অক্ষুণ্ন থাকবে। সংগীতে মুদ্রার ব্যবহার থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে তা যদি শাস্ত্রের বহির্ভূত হয় তাহলে এর প্রয়োগ ঠুমরী গানের জন্য ক্ষতিকর। তাই ঠুমরী গায়কগণকে অবশ্যই মুদ্রা দোষ পরিহার করতে হবে। সর্বোপরি বলা যায় যে, সংগীত সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তাই সকলের উচিত সংগীতের প্রতিটি ধারা সম্পর্কে সঠিক তালিম গ্রহণপূর্বক শাস্ত্রের নিয়ম মেনে কৌশলগত ভাবে উপস্থাপন করা। তাহলেই সংগীতের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব

রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব

বাংলার একটি অনবদ্য সংগীত ধারার নাম রাগপ্রধান বাংলা গান। রাগপ্রধান বাংলা গান সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের বিশেষ দুটি সংগীত ধারাকে কেন্দ্র করে। একটি হলো হিন্দুস্থানি রাগরাগিণী ও অন্যটি বঙ্গদেশের বাংলা গান। এই দুই ধারার পরস্পর মিলনের ফলে ১৮শ শতকের শেষ দিকে ভারতীয় সংগীত জগতে এক নতুন সংগীত ধারার প্রচলন শুরু হয় যা রাগপ্রধান বাংলা গান নামে খ্যাত। গুণীজন মতে ভারতীয় রাগরাগিণীর চর্চা সর্বপ্রথম শুরু হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭শ–১৮শ, নদীয়া) রাজ সভায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) একটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে নদীয়ায় হিন্দুস্থানি সংগীত চর্চার কথা। উদ্ধৃতিটি হলো–

> "কালোয়াৎ গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
> মৃদঙ্গ সমঝখেল্ কিন্নর আকৃতি।।
> নর্তন প্রধান ফেরে মামুদ সভায়।
> মোহন খোসালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়।।"[১২৪]

বাংলায় রাগসংগীত চর্চার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণপুর। অষ্টাদশ শতকে হিন্দুস্থানি সংগীতের অধিক গ্রহণযোগ্যতা ও আত্তীকরণতায় সমগ্র ভারতে বিষ্ণুপুরের নাম সুপরিচিতি লাভ করেছিল। বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরানার খ্যাতনামা শাস্ত্রীয় সংগীতের শিল্পী বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতগুরু। সম্ভবত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে কলকাতায় রাগসংগীত চর্চার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার সংগীত সমাজ ভারতীয় রাগসংগীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল প্রধানত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্'র সুবাদে। ড. প্রদীপকুমার ঘোষ বলেছেন, "অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে সুবিশেষ অবদান রাখার জন্য নবাবকে বলা হতো শিল্পী রাজা।"[১২৫] ইংরেজ সরকারের মিথ্যে ষড়যন্ত্রের কারণে নবাবকে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করা হয়েছিল। নবাব কলকাতায় আসার সময় তাঁর দরবারের সংগীতজ্ঞদেরও সাথে নিয়ে আসেন। নবাব ঠুমরী গানের পৃষ্ঠপোষকতায় মগ্ন ছিলেন। সম্ভবত সেই জের ধরেই কলকাতায় ঠুমরী গানেরও গ্রহণযোগ্যতা ও চর্চা অধিক ছিল। হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর শিক্ষা গ্রহণের পর বাংলার সংগীতজ্ঞ ও আধুনিক বাংলা গানের রচয়িতাগণের

১২৪। ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, *বাংলায় রাগসংগীত চর্চার ধারা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৯), পৃ. ১৫
১২৫। তদেব, পৃ. ১৭

প্রচেষ্টায় এক নতুন ধারার সংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী যার নামকরণ করেছিলেন 'রাগপ্রধান বাংলা গান'।

> "ঊনবিংশ শতাব্দীতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে হিন্দুস্থানি রাগ-রাগিণী ভিত্তিক বাংলা গানের উৎকর্ষসাধন হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ঠাকুরবাড়িতে স্বনামধন্য উচ্চাঙ্গের তথা শাস্ত্রীয় সংগীতের বেশ কয়েকজন সংগীতজ্ঞের অবস্থান ছিল। তাঁদের মধ্যে যদুভট্ট, শ্যামসুন্দর মিশ্র, গুলাম আব্বাস, মৌলা বক্স্, বিষ্ণু চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।"[১২৬]

তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, দাদরা, চৈতী, কাজরী ইত্যাদি গান ভাসমান ছিল। এসব কারণেই সম্ভবত রাগপ্রধান বাংলা গানেও উচ্চাঙ্গের গীতশৈলীর প্রভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী উল্লেখ করেছেন– "হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীত ছাড়াও ঠুমরী, দাদরা, কাজরী, গজল ইত্যাদি লঘু চালের রাগ-ভিত্তিক গানেরও যথেষ্ট প্রভাব বর্তমানে প্রচলিত রাগপ্রধান বাংলা গানে খুবই শোনা যায়।"[১২৭] রাগপ্রধান বাংলা গানে হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর প্রাধান্য ছাড়াও কিছু বিষয়ে ঠুমরী গানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যেমন: সুর-বিস্তারে স্বাধীনতা, বাণীর পরিসর, বাণীর বিষয়বস্তু, রাগ, তাল, বোল-বিস্তার, রাগ মিশ্রণ, আলাপ, অলংকারের প্রয়োগ, রস ও ভাব, হালকা চাল ইত্যাদি।

৫.১ রাগপ্রধান বাংলা গান

রাগপ্রধান বাংলা গান আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট গায়নরীতি যা প্রকাশের কাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা গানের ধারাকে গতিময় করে রেখেছে। বাংলা কাব্যসংগীতে রাগরাগিণীর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত জগতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় যার নামকরণ করা হয়েছিল রাগপ্রধান বাংলা গান। রাগপ্রধান গান গীত হয় আধুনিক শিল্পসম্মত পরিবেশন ভঙ্গিতে। রাগপ্রধান বাংলা গান সম্পর্কে অনেকেই তাদের মতামত দিয়েছেন। পংকজ কান্তি সরকার বলেছেন, "রাগপ্রধান বাংলা গান একটি বিশেষ গীতরীতি যা বাংলা ভাষায় রচিত কিন্তু খেয়াল ও ঠুমরীর রীতিতে গাওয়া হয়।"[১২৮] শ্রী সুকুমার রায় বলেছেন– "রাগপ্রধান একটি নাম– সঙ্গীত লক্ষণ নয়, প্রকার নয়, শুধু আধুনিক বাংলা গান রচনার একটি গায়কি রীতি। এ গানে রাগের প্রাধান্য কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নয়। আধুনিক বাংলা গানের একটি প্রকার রাগপ্রধান।"[১২৯] রাগপ্রধান বাংলা গানের রীতিতে ভারতীয় রাগসংগীত

১২৬। তদেব, পৃ. ১৭

১২৭। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৭

১২৮। পংকজ কান্তি সরকার, *রাগ সঙ্গীত সাধনা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯), পৃ. ২৫০

১২৯। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

গাওয়ার নজির বাংলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। এই সংগীত রীতি একান্তই বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব সম্পদ যা বাংলা সাহিত্যের রসে পরিপূর্ণ। রাগপ্রধান বাংলা গান একদিকে যেমন রাগ ও তালের প্রয়োগ সহজবোধ্য করেছে অপরদিকে আবার বাংলা গান তথা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্মানও অক্ষুণ্ন রেখেছে। রাগপ্রধান বাংলা গানে রাগই প্রধান, অর্থাৎ যে বাংলা গানে রাগের ব্যবহার মুখ্য তাকে রাগপ্রধান বাংলা গান বলে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যে গানে বাংলা কাব্যের সাথে রাগ মিশ্রিত হয়ে কাব্যভাব এবং রাগরস উভয় প্রকার রস-ভাবের সঞ্চার ঘটে তাই রাগপ্রধান বাংলা গান। রাগপ্রধান বাংলা গান হলো এমন একটি গীতধারা যা হিন্দুস্থানি রাগসংগীত ও আধুনিক বাংলা গানের একটি সময়োপযোগী সমন্বয়। এই অভিনব পদ্ধতির বাংলা গান খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৎকালীন শ্রোতাবৃন্দের কাছে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। শুরুতে এই ধারার গান খেয়াল গানের আদলে আত্মপ্রকাশ করলেও খেয়াল গানের অতি–বিলম্বিত লয় রাগপ্রধান বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত। কালক্রমে খেয়াল অপেক্ষা ঠুমরীর বৈশিষ্ট্যগুলো অধিক প্রভাব বিস্তার করে রাগপ্রধান বাংলা গানের গায়নশৈলীতে। রাগপ্রধান বাংলা গানের সাথে অন্যান্য ধারার বাংলা গানের পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় রাগপ্রধান বাংলা গানে ব্যবহৃত রাগের রাগভাবের কারণে। এই রীতির গানে রাগভাব প্রকাশ করাই মুখ্য বিষয়। যদিও অন্যান্য ধারার বাংলা গানেও রাগের ব্যবহার বহুকাল আগে হতেই ছিল। কিন্তু ঐসব বাংলা গানে রাগরাগিণী ব্যবহারের গুরুত্ব রাগপ্রধান বাংলা গানের মতো ছিল না। রাজ্যেশ্বর মিত্র রাগপ্রধান গান প্রসঙ্গে বলেছেন– "বাংলায় রাগপ্রধান পর্যায়ে যে সংগীত গড়ে উঠেছে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে, কারণ তা একদিক দিয়ে কাব্যসংগীত অপরদিক দিয়ে রাগসংগীত। কাব্য এবং রাগ একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে যা একটি বিশিষ্ট শ্রেণির সম্মান দাবী করতে পারে।"[১৩০] রাজ্যেশ্বর মিত্রের কথায় সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, রাগপ্রধান বাংলা গান একটি বিশেষ ধারার গান যা অতি অল্প সময়েই জনশ্রুতি অর্জন করেছিল। এর বিশেষ কারণ হলো এই গান প্রধানত দুই শ্রেণির শ্রোতাবৃন্দকে একত্রে অকৃষ্ট করেছিল এবং রাগ ও কাব্যের রস এক সঙ্গে আস্বাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সংগীত শাস্ত্রকার সুকুমার রায় তাঁর '*মিউজিক অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া*' গ্রন্থে বলেছেন– "রাগপ্রধান নামটির প্রচলন হয়েছে আধুনিক গীতি-কবিতাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের ছন্দ ও ঢং বজায় রেখে লঘু-শাস্ত্রীয় সংগীতের গীতি-ভঙ্গীতে পরিবেশন করার জন্য।"[১৩১] সুকুমার রায়ের বক্তব্য থেকেও একথা ধরে নেওয়া যায় যে, রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরী গানের প্রভাব রয়েছে।

১৩০। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৩১। তদেব, পৃ. ২০

৫.২ রাগপ্রধান বাংলা গানরে ইতিহাস

১৮শ শতকে ভারতীয় সংগীতের স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটে ইংরেজ শাসনামলের সূচনালগ্নে। এ সময় ভারতীয় সংগীতের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে আসে। ঐতিহাসিক মতে, মুঘল শাসন ব্যবস্থার পতনের পর বিভিন্ন রাজ দরবারের বহু সংগীতজ্ঞ বিষ্ণুপুর রাজ সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সংগীতের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর নামক স্থান প্রাচীনকাল হতেই সংগীত তথা উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালীন সময়ে বিষ্ণুপুর বাংলার স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। বহু উচ্চাঙ্গের সংগীতজ্ঞের সমাগমে বঙ্গদেশে বাংলায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরীর প্রচলন শুরু হয়ে এর চর্চা অব্যাহত থাকে। ফলে ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন বাংলার সংগীতানুরাগী সাহিত্যিকগণ এবং রাগরাগিণীর আদলে বাংলা গান রচনা আরম্ভ করেন। উত্তর ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রচলনের পূর্বে যে বাংলায় রাগের ব্যবহার ছিল না সে কথা ভাবা সমিচীন হবে না। কারণ বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধারার (লোকগান, কীর্তন, যাত্রাপালার গান, চর্যাপদের গান ইত্যাদি) অসংখ্য গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে বাংলার গানে যেসব রাগরাগিণীর প্রয়োগ করা হতো তার সাথে হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর কিছু পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য ছিল শাস্ত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন– "বাংলায় রাগের প্রচলন বহু আগেই ছিল, এ সময় শুধু হিন্দুস্থানি স্টাইল এবং রাগ গাইবার ধরন অনুসরণ করা হলো, যা কি না পরবর্তীযুগে রাগপ্রধান বাংলা গান উদ্ভবের সহায়ক ছিল।"[১৩২] উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন সংগীত রীতির অনুকরণ করে যেসব রাগ প্রযুক্ত বাংলা গানের প্রচলন বঙ্গদেশে ছিল সে প্রসঙ্গে ড. অসিত রায় বলেছেন– "অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সাংগীতিক রাজধানী বিষ্ণুপুরে অন্যান্য প্রকার বাংলা রাগ সংগীতের চর্চা থাকলেও বাংলা রাগ প্রধান নামে কোন গীত প্রকারের চর্চার কথা জানা যায় না।"[১৩৩]

রাগপ্রধান বাংলা গানের কথা বলতে গেলেই বাংলা গানের প্রসঙ্গ চলে আসে। কারণ উত্তর ভারতীয় রাগরাগিণী আর বাংলা গানের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে রাগপ্রধান বাংলা গান। ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র ভারতে– পাশ্চাত্য, বাংলা ও হিন্দুস্থানি এই তিন ধরনের সংগীত সমধারায় চলমান ছিল। এর কারণ ছিল ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা। ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের ফলে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির আগমন ঘটে এবং প্রতাপশালী ধনী সমাজ এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুঘল শাসকদের পতন তাঁদের দরবারের সংগীতজ্ঞদের ছত্রভঙ্গ হতে বাধ্য করে। যারজন্য অনেক সংগীতজ্ঞ বাংলার স্বাধীন অঞ্চল বিষ্ণুপুরে রাজদরবার অলংকৃত করেন। এদিকে

১৩২। প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা:প্রকাশক– শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ১৭৮
১৩৩। ড. অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১৯), পৃ. ১২৩

বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাংলা গান, সাহিত্য–সংস্কৃতির বিকাশে স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে সংগীত মহলে সমাদৃত হতে থাকে। ভারতীয় রাগসংগীত প্রথম দিকে বাঙালি শ্রোতাদের হৃদয়ে ঠাঁই নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে রাগের রঞ্জকতাগুণে বাংলার সংগীত পিপাসুদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের প্রতি। হিন্দুস্থানি সংগীত বিকশিত হয়েছিল দিল্লীর মুঘল দরবারকে কেন্দ্র করে। আর বাংলা গানের বিকাশ শুরু হয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। আধুনিক যুগের সংগীতের তীর্থস্থান খ্যাত কলকাতায় বঙ্গদেশের সংগীত ও সংস্কৃতির ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটেছিল। নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) কলকাতায় আসেন অষ্টাদশ শতকে এবং উদ্ভাবন করেন নতুন আঙ্গিকের বাংলা গানের। যে গান কলকাতাসহ সমগ্র ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর সেই অভিনব সৃষ্টিকর্মটি ছিল বাংলা টপ্পা গান। তাঁর রচিত অভিনব পদ্ধতির বাংলা গান স্বল্প সময়ে শ্রোতা সমাজ তৈরি করতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতাপ ও পাশ্চাত্যের সংগীত পদ্ধতির সাথে তৎকালীন বাঙালিদের যৌথ চিন্তার মধ্যদিয়ে বাংলা গানের অভিষেক ঘটে এবং তা সারা বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তৎকালীন সময়ে (ঊনবিংশ শতকে) মিশ্ররাগের অধিক প্রয়োগ দেখা যায় বাংলা গানে। বিভিন্ন ধারার বাংলা গান রচনা করে যারা রাগের ব্যবহার সুনিশ্চিত করেছেন তাঁদের মধ্যে রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১-১৮৩৯) টপ্পা, দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) পাঁচালী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) কবিগান, হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪), কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০), শ্রীধর কথক প্রমুখের বাংলা গানে ভারতীয় রাগরাগিণীর মিশ্র প্রয়োগ ছিল লক্ষণীয়। কৃষ্ণ যাত্রায় পদাবলী কীর্তনের মতো বিভিন্ন প্রকার রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই রাগগুলো হলো– ভৈরব, ভৈরবী, বেহাগ, বাগেশ্রী, বিভাস, বসন্ত, বাহার, ভাটিয়ার, মালকোষ, মুলতানী, মল্‌হার, রামকেলী, যোগিয়া, কালেংড়া, সিন্ধু, গৌরী, সুরট, গারা, দেবগিরি, ললিত, ঝিঝিট, খাম্বাজ, গৌড়সারং, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি। রাগের পাশাপাশি যাত্রাগানে তাল হিসাবে আদ্ধা, চৌতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, যৎ, সুরফাঁক, তেওট, সাওয়ারী, লোফা, দশকোশী, রূপক, মধ্যমান ইত্যাদি তালের প্রয়োগ হতো, যা পরবর্তীকালে রাগপ্রধান বাংলা গান সৃষ্টির নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কালী মীর্জার টপ্পা ছিল মার্জিত বাংলা গান যার মধ্যে শুদ্ধ ও অমিশ্রিত রাগের ব্যবহার ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি তাঁর রচনায় অনেক রাগের ব্যবহার করেছেন। যেমন:- ভৈঁরো, ইমন, বেহাগ, বাগেশ্রী, কাফি, খাম্বাজ, আলাহিয়া, সোহিনী, গৌরী, পরজ, সাহানা, ভৈরবী, ললিত, পাহাড়ী, গৌড়, ঝিঁঝিট, কালেংড়া, মুলতানী, মালশ্রী ইত্যাদি।[১৩৪]

১৩৪। স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা* (কলকাতা, শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯)

রাগপ্রধান বাংলা গান উদ্ভাবনের পূর্বে বেশকিছু গীতধারার সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদের মধ্যে বাংলা খেয়াল, বাংলা ঠুমরী, বাংলা টপ্পা, ধ্রুপদাঙ্গীয় ও খেয়ালাঙ্গীয় বাংলা গান ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে এদের কেউই শ্রোতার মনকে আন্দোলিত করে তুলতে পারেনি। ভারতীয় রাগরাগিণী অবলম্বনে উক্ত প্রকার গানগুলো গীত হলেও তা রাগপ্রধান বাংলা গানের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। কারণ হিন্দি ভাষায় প্রচলিত ঐসকল গীতরীতিতে হিন্দির পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করা হতো যা সম্পূর্ণরূপে রাগপ্রধান বাংলা গানের শর্ত পূরণ করেনি। তবে রাগ ও তালে নিবদ্ধ এসব গানের সুরের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় রচিত গানগুলো পরবর্তীকালে রাগপ্রধান বাংলা গান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা ইত্যাদি গীত ধারাগুলো কখনো বাংলা ভাষায় তাদের পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। তাই বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশে সক্ষম এমন এক গীতশৈলীর উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে উঠেন বাংলা ভাষাভাষী সংগীত অনুরাগী ও গুণী সংগীতজ্ঞরা। ফলে বাংলা কাব্যের সাথে রাগকে প্রাধান্য দিয়ে সৃষ্টি হয় রাগপ্রধান বাংলা গান। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী রাগপ্রধান বাংলা গানের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন – "রাগপ্রধান বাংলা গান বর্তমানে উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দুস্থানি রাগ-পদ্ধতির বিভিন্ন রাগ, তাল ও গাইবার ধরণকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।"[১৩৫] রাগপ্রধান বাংলা গানকে বলা হয় আধুনিক যুগের বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর কারণ সন্ধানে সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, নতুন কোন গীতরীতির আত্মপ্রকাশ তখনি ঘটেছে যখন কোন প্রাচীন গীতধারার অবসান ঘটেছে। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলা গানের উদ্ভবের ফলে কোন প্রকার সংগীত ধারার বিলুপ্তি ঘটেনি। অর্থাৎ ভারতীয় রাগসংগীত এবং বাংলা গানের স্বীয় অবস্থান অটুট ছিল। বিস্ময়কর এই সৃষ্টি বাংলা গান ও রাগসংগীত উভয় ধারার শ্রোতাবৃন্দের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। কোন গীতধারার গতিপথে বাধার সৃষ্টি না করেই অভিনব পদ্ধতির গায়নশৈলীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই ধারার গান যৌবনকালে 'রাগপ্রধান' নামেই পরিচিত ছিল। "১৯৩৫ সালে শ্রী সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী 'রাগপ্রধান' গানের প্রবর্তন করেন।"[১৩৬] পরবর্তীকালে এই ধারার গান প্রচারিত হয় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক 'রাগপ্রধান' নামটি প্রবর্তনের পর এ গান সর্বপ্রথম কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয় ১৯৩৭ সালে। 'রাগপ্রধান' শিরোনামে রথীন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রথম পরিবেশিত ও প্রচারিত হয় রাগপ্রধান বাংলা গানের। রাগপ্রধান গান প্রসঙ্গে পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ বলেছেন–

> "বাংলা খেয়াল গান হিসাবে রাগপ্রধান বাংলা গান তাঁর আত্মপ্রকাশ করে নি এমনকি সুরেশ বাবু বা তাঁর সমসাময়িক রাগপ্রধান গানের শিল্পীদেরও এরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুরেশ বাবুর কথা মতো, রাগপ্রধান গানের লক্ষ্য হবে,

১৩৫। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৭
১৩৬। পংকজ কান্তি সরকার, *রাগ সঙ্গীত সাধনা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯), পৃ. ২৫৫

খেয়ালের বন্দিশকে আশ্রয় করে এর জটিলতা বর্জন করা এবং রাগের সরল রূপায়ণকে অবলম্বন করে বাংলা গানের স্বাতন্ত্রতাকে অব্যাহত রেখে তালের সৌন্দর্য রক্ষা করে এ গানের পরিবেশন করা।"[১৩৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ছিল বহিরাগত শিল্পীদের দ্বারা আবৃত। তাঁদের সংগীত রীতিতে আকৃষ্ট হন বাংলার সংগীতানুরাগী, সংগীত রচয়িতা ও সুরকারগণ। তখন কলকাতায় সমগ্র ভারতের উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের অনেক কদর ছিল। তাদের পরিবেশিত রাগ শুনে, তাতে প্রযুক্ত সুর-তালের অনুকরণে বহু সংখ্যক গানের রচনা করা হয় কিন্তু গানগুলোর ভাষা ছিল বাংলা। *'রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে'* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "উচ্চাঙ্গের শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত গীতধারার ভাষার দৈন্যতা এবং প্রাধান্যকে অস্বীকার বাংলার তৎকালীন গীতিকার ও সুরকারগণ বাংলা ভাষায় সেই সুর ও তালে অজস্র বাংলা গানের রচনা করেছিলেন যা বাংলা রাগপ্রধান গানকে অধিক সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে।"[১৩৮] অনেকেই ধারণা করেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন রাগপ্রধান বাংলা গানের উদ্ভবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এর কারণ হিসাবে ধারণা করা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পর মুঘল রাজা-বাদশাহ্দের দরবারের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে তাঁদের সংগীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুস্থানি রাগসংগীত প্রসারিত হয় এবং বাংলায়ও উচ্চাঙ্গের অনেক গুণী সংগীতজ্ঞের আগমন ঘটে। ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিক উন্নয়নের ফলে রাজদরবারের বিভিন্ন ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের প্রসিদ্ধ গায়কগণ বাংলায় আসতে শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় বাংলার সংগীত অনুরাগীদের উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন রাগরাগিণীর নৈকট্য লাভের সুযোগ হয়। আধুনিক বাংলা গনের সাথে হিন্দুস্থানি রাগরাগিণী বিশেষের যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে রাগপ্রধান বাংলা গানের উৎপত্তি ঘটে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাগপ্রধান বাংলা গান বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য ধারার বাংলা গানের থেকে অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৫.৩ পঞ্চকবি ও রাগপ্রধান গান

পঞ্চকবি হলো বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংগীতের ক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে দিব্যি ভেসে বেড়ানো তরণীর মতো যারা বিশ্ব শ্রোতাকূলের নিকট বাংলা গানের বিভিন্ন ধারাকে করেছেন মহিমান্বিত। পঞ্চকবি বলতে আমরা বুঝি বাংলা সাহিত্যের পাঁচজন কবিকে। পাঁচজন বিশিষ্ট কবির সমন্বয়ে 'পঞ্চকবি' নামটি অধিক জনশ্রুতি অর্জন করেছে। তাঁদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যের জন্য সমন্বিতভাবে তাঁদেরকে পঞ্চকবি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই

১৩৭। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ১৯
১৩৮। তদেব, পৃ. ৮

পঞ্চকবির পাঁচজন কবি হলেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তাঁদের পাঁচজনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে তা হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক বা শিল্পী। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সময়ের পরিক্রমায় তাঁরা করেছেন সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। তাঁদের বাংলা রেঁনেসাসের কবি বলেও আখ্যায়িত করা হয়। পঞ্চকবি সম্পর্কে ড.অসিত রায় তার '*সংগীত অন্বেষা*' গ্রন্থে বলেছেন, "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পঞ্চগীতি কবির অবদানের মাধ্যমে বাংলাগান যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছিল, সমস্ত বাংলা গানের ইতিহাসে তা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পঞ্চগীতিকবির গানের ধারাবাহিকতায় আধুনিক বাংলা গানের ধারায় বিশ শতকের কালজয়ী কিছু গানের সৃষ্টি হয়েছিল।"[১৩৯]

তাঁদের সংগীত বাংলা গানের ধারায় নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছিল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার অনুসরণে ও রাগরাগিণীর আদলে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য বাংলা গান। এভাবে বাংলা রাগপ্রধান গানের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধিতে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

পঞ্চকবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বাংলা রাগপ্রধান গান রচনা করে বাংলার সংগীত ভাণ্ডারকে প্রসারিত করেছিলেন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে 'রাগপ্রধান' নামের প্রচলন শুরু হয়নি, কিন্তু তিনি গানের কথা বা বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতীয় রাগরাগিণীর মিশ্রণে বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ২২৩২টি গানের মধ্যে বহু রাগপ্রধান গান রয়েছে যার অধিকাংশই ধ্রুপদ-আঙ্গিকের। রবী-ঠাকুরের গানে ধ্রুপদ তথা উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব অধিক। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ঠাকুর পরিবারের তৎকালীন সাংগীতিক পরিবেশ। তৎকালীন সময়ে ঠাকুর বাড়িতে ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের সমাগম ছিল। যার দরুন বাদ্যযন্ত্র থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় পারদর্শী হয়ে উঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই বিস্তৃত সংগীতজ্ঞান পরবর্তীকালের বাংলা রাগপ্রধানসহ বিভিন্ন শৈলীর গানকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর আদলে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন অঙ্গে বিচরণ করেছেন এবং রচনা করেছেন বহু গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতি অঙ্গের গানগুলোর মধ্যে– কী সুর বাজে

১৩৯। ড. অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৯), পৃ. ২২

আমার প্রাণে (রাগ: পিলু-বারোয়াঁ), তুমি কিছু দিয়ে যাও (রাগ: খাম্বাজ), হায় কে দিবে আর সান্তনা (রাগ: দেশ), এই করেছ ভালো নিঠুর হে (রাগ: ইমন-কল্যাণ), আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (রাগ: পিলু), আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে (রাগ: মিশ্র-মালকোষ), আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে (রাগ: বেহাগ), জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে (রাগ: বেহাগ), তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (রাগ: ছায়ানট), দ্বীপ নিভে গেছে মম (রাগ: বেহাগ), এসো শ্যামল সুন্দর (রাগ: দেশ), বিরহ মধুর হল আজি (রাগ: বেহাগ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গানগুলো শুনলে অনুভব করা যায় যে, তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধিতে কতটা অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের মহত্ত্বকে যেমন স্বীকার করেছেন অনুরূপভাবে বাংলা গানের স্বাতন্ত্র্যতাকেও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গানে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালের বহু গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করে এই গানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বাংলা গানের ধারাকে সুপ্রসারিত করেছেন বাংলা সাহিত্য-সংগীতের অনন্য রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম। শুরুতে কাজী নজরুল ইসলামের গানগুলো রাগপ্রধান বাংলা গান হিসাবে প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য ধারার বাংলা গানের অসংখ্য রচনায় তাঁর গানগুলো নজরুলগীতির আওতাধীন হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালে রাগপ্রধান নামে প্রচার শুরুর পূর্বেও কাজী নজরুলের রাগভিত্তিক বা রাগাশ্রিত বা রাগপ্রধান গানের শ্রোতা সমাজ গড়ে উঠেছিল সমগ্র বাংলায়। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর সাথে কবি নজরুলের ছিল গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। দুইজনের পারস্পরিক সখ্যতার কারণে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতে অসামান্য জ্ঞান থাকায় নজরুলের অধিকাংশ রাগপ্রধান গানে কণ্ঠ দিয়েছেন জ্ঞান গোঁসাই। পরবর্তী সময়ে আধুনিক বাংলা গানের ঢঙে নজরুলের রাগপ্রধান গানের অধিক জনশ্রুতি অর্জনে অবদান রাখেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের রাগপ্রধান গানের প্রবর্তক বলা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। চিন্ময় লাহিড়ী রাগপ্রধান বাংলা গানে নজরুলের অবদান বা ভূমিকা সম্পর্কে অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন–

> "রাগপ্রধান সম্বন্ধে বলতে গেলে গোড়ার থেকেই বলতে হয়। আমার যতদূর জানা আছে এ বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা হলেন শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি এর চলন একটু বেড়েছে বটে কিন্তু ৩০/৩৫ বছর আগেও রাগপ্রধান বলে কোন গান কাউকে গাইতে আমি তো শুনিনি। যখন কাজীদা এই রাগাশ্রিত গান তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন তিনি কিন্তু এই গানে

তান, সরগম, কেন এমনকি বোল-বিস্তার বা বোলতান পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি শুধু রাগের কাঠামোর উপরই গান শিখিয়েছেন।"[১৪০]

চিন্ময় লাহিড়ীর বক্তব্যে একটি কথা স্পষ্টত, কাজী সাহেব যেসকল রাগপ্রধান গান সৃষ্টি করেছেন তার শুরুতে শাস্ত্রীয় বিভিন্ন অলংকারের প্রয়োগ তেমন প্রাধান্য পায়নি। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরবর্তীকালে ছোট ছোট তান, হরকত, সরগম ইত্যাদি গানের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে। তাঁর রচিত রাগাশ্রয়ী বা রাগপ্রধান গানগুলো পরবর্তীকালের রাগপ্রধান গানের ভিত্তিকে অধিক মজবুত ও প্রসারিত করেছিল। তিনি নিজেও বিভিন্ন রাগ ও তাল সৃষ্টি করে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান গানগুলোর মধ্যে– সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি (রাগ: পিলু, তাল: দাদরা), কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া (রাগ: খাম্বাজ, তাল: ত্রিতাল), একি তন্দ্রা বিজরিত আঁখিপাত (রাগ: মালকোষ), সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ (রাগ: তিলককামোদ, তাল: ঝাঁপতাল), গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে (রাগ: রবিকোষ, তাল: ত্রিতাল), অরুণ-কান্তি কেগো যোগী ভিখারি (রাগ: আহীর ভৈরব, তাল: ত্রিতাল), অঞ্জলী লহ মোর সংগীতে (রাগ: তিলং, তাল: ত্রিতাল), কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায় (রাগ: পিলু-বারোয়াঁ, তাল: কাহারবা), শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় (রাগ-ছায়ানট, তাল: একতাল), আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী (রাগ: খাম্বাজ-পিলু, তাল: দাদরা), ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙ্গাতে কি (রাগ: রামকেলী, তাল: ত্রিতাল), কেঁদে যায় দখিন-হাওয়া (রাগ: সিন্ধু-ভৈরবী, তাল: কাহারবা), ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি? (রাগ: হিজাজ, তাল: ত্রিতাল), আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া (রাগ: কেদারা/হাম্বির, তাল: ত্রিতাল), একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর (রাগ: জৌনপুরী, তাল: দাদরা), প্রথম প্রদীপ জ্বালো মম (রাগ: পটদীপ, তাল: ত্রিতাল), ফিরে নাহি এলে প্রিয় ফিরে এলো বরষা (রাগ: নটমল্লার, তাল: ত্রিতাল), যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম (রাগ: সিন্ধু-কাফি, তাল: যৎ), সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে (রাগ: সামন্ত-কল্যাণ, তাল: ত্রিতাল), রিনিকি ঝিনিকি ঝিনিরিনি রিনি ঝিনিঝিনি বাজে (রাগ: ছায়ানট, তাল: ত্রিতাল), মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ (রাগ: জয়জয়ন্তী, তাল: ত্রিতাল), পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া (রাগ: দেশ-খাম্বাজ, তাল: ত্রিতাল/ আদ্ধা-কাওয়ালি), দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা (রাগ: মধুমাধবী সারং, তাল: ত্রিতাল), ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু (রাগ: দেশ, তাল: ত্রিতাল), কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে (রাগ: দরবারী-কানাড়া, তাল: ত্রিতাল), এসো প্রিয় আরো কাছে (রাগ: দেশী, তাল: ত্রিতাল), আজি নন্দলাল মুখচন্দ নেহারি (রাগ: খাম্বাবতী, তাল: ঝাঁপতাল), অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর (রাগ: মিঞাকি মল্লার, তাল: ত্রিতাল) ইত্যাদি গানগুলো অধিক জনপ্রিয়।[১৪১] উক্ত

১৪০। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৪৯
১৪১। https://nazrulgeeti.org/sa

রাগপ্রধান গানগুলো বিবেচনায় দেখা যায় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অধিকাংশ রচনায় ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা প্রভৃতি তালগুলোর ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত রাগপ্রধান বাংলা গানে ভাষার আভিজাত্য ও রাগের সৌন্দর্য উভয় সমান প্রাধান্য পেয়েছে। রাগপ্রধান বাংলা গানের বৃহৎ পরিধি সৃষ্টিতে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা অতুলনীয় এবং অপরিমেয়। এই ধারার গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অন্যতম।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

২৬ শে জুলাই ১৯৬৫ সালে রজনীকান্ত সেনের জন্ম হয় সিরাজগঞ্জ জেলার গঙ্গাবাড়ি গ্রামে। তাঁর পিতা একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ হওয়ায় শৈশবে পিতার নিকট হতেই শুরু হয় সংগীতের তালিম গ্রহণ। রজনীকান্ত সেন ছিলেন কবি ও গীত রচয়িতা। তাঁর গানে সুরের মাধুর্য ও আবেগে ভক্তি, দেশাত্মবোধ, প্রীতি, হাস্যরস ইত্যাদি বিষয় সহজবোধ্য কাব্যযোগে ফুটে উঠে। "রজনীকান্ত সেন 'কান্তকবি' নামেও অধিক পরিচিত। তাঁর আধ্যাত্মবোধ শ্রোতার মনে সহজ ও আন্তরিক আবেগের সংযোগ ঘটিয়েছিল। তাঁর গান রচনার সরলতা ও অকৃত্রিম ভাবাবেগ সাধারণের মন কেড়ে নিত। এই সহজ-সরল রূপ তাঁর সৃষ্ট রাগভিত্তিক গান গুলোতেও অধিক লক্ষ্যণীয়।"[১৪২] রজনীকান্ত সেনের সহজ-সরল হালকা চালের গান বিংশ শতকের বাংলা গানকে বিশেষায়িত করেছিল। রাগপ্রধান বাংলা গানে তাঁর অবদান ছিল বাংলা গানের ভিন্ন রূপান্তর। তাঁর গানে রাগের ব্যবহার ছিল মাধুর্যতাপূর্ণ। রজনীকান্ত সেনের রাগভিত্তিক গানগুলো হলো- আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে (রাগ: মিশ্র-কানাড়া, একতাল), ওমা কোলের ছেলে ধুলো ঝেরে তুলে নে কোলে (রাগ: ভৈরবী, ঝাঁপতাল), আমি অকৃতি অধম (রাগ: বেহাগ, একতাল), কেন বঞ্চিত হব চরণে (রাগ: মিশ্র-খাম্বাজ, জলদ একতাল), সে যে পরম প্রেম সুন্দর (রাগ: সুরট মল্লার, সুরফাঁক), মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায় (রাগ: মিশ্র-বেহাগ, ঝাঁপতাল), কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো কেউ দেখে আধাঁর (রাগ: বেহাগ, জলদ একতাল), মরমে পরশে তার গান (রাগ: মিশ্র-ভূপালী, কাওয়ালী), শোনাও তোমার অমৃত বাণী (রাগ: বেহাগ, তেওড়া), ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে (সিন্ধু-খাম্বাজ, কাহারবা), তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে (রাগ: ভৈরবী, দাদরা), প্রেমে জল হয়ে যাও গলে (বাউল সুর, গড় খেমটা), বুঝি পোহাল না পাতক রজনী (রাগ: টোড়ি-ভৈরবী, কাওয়ালী), যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি (রাগ: ভৈরবী, একতাল), মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় (রাগ: মূলতানী, গড়-খেমটা), মুক্তপ্রাণের দীপ্ত বাসনা (রাগ: মিশ্র-ভৈরবী, জলদ একতাল), সেথা আমি কি গাহিব গান (রাগ: গৌরী, একতাল)। উল্লিখিত গানগুলো

১৪২। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৩০-১৩১

ছাড়াও বহু রাগভিত্তিক বাংলা গানের স্রষ্টা রজনীকান্ত সেন। কিন্তু তাঁর গানে গাম্ভীর্যতা, ভারী অলংকার ও শাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের চেয়ে সরলতা, শান্তরস ও পবিত্র রস-ভাবের প্রাধান্য ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর গানগুলো বাংলা রাগপ্রধান গানের পূর্বসূরী হিসাবে বিশেষ অবদান রেখেছে এবং রাগপ্রধান বাংলা গানকে করেছে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত। রাগপ্রধান ভক্তিমূলক গানে রাগমিশ্রণ ও বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগে রজনীকান্ত সেন ছিলেন অনন্য। উদাহরণ স্বরূপ ভৈরবী ও বারোয়াঁ রাগে রচিত যথাক্রমে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' এবং 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' গান দুটির কথা বলা যেতে পারে। দুটি গানেই রাগের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা সহজ সুরে ভক্তিরসের প্রকাশ লক্ষণীয়।

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)

পঞ্চগীতি কবিদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ সালের ৩০শে অক্টোবর ঢাকায়। পিতার অকাল মৃত্যুতে তিনি মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং সেখানেই তাঁর সংগীত জীবনের সূচনা ঘটে। তিনি পেশায় ছিলেন আইনজীবী। পেশাগত কারণে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তাঁর সংগীত সৃষ্টির সূচনা হয়। অবসরে তিনি সংগীতের সেবায় মগ্ন থাকতেন। তিনি বহু বাংলা গানের রচনা করেছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেনের গানের বিষয়বস্তুতে স্বদেশ, প্রেম, ভক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রাধান্য অনেক। তিনি তাঁর রচনায় সুরারোপের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন যথাযথভাবে। তাঁর রচিত স্বদেশী, রাগাশ্রয়ী ও আধুনিক ইত্যাদি বহু গানে রাগের মিশ্রণ লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন, "তাঁর ডাকে কোয়েলা বারে বারে গানটি গৌর মল্লার রাগে বাঁধা। মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে গানটি আশাবরীকে কেন্দ্র করে ভৈরবী-ভৈরব প্রভৃতি রাগের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সংগীতের কাব্যভাব বজায় রেখেও অতুলপ্রসাদ অনেক গানে রাগ মিশ্রণ করেছেন।"[১৪৩] ঠুমরী গানের গায়নরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা গান রচনার প্রসঙ্গে মোবারক হোসেন খানের '*সংগীত মালিকা*' গ্রন্থে বলা হয়েছে- "অতুলপ্রসাদ সেন সর্বপ্রথম বাংলা গানে ঠুমরীর প্রচলন শুরু করেন। তাঁর প্রায় সব গানেই মাধুর্যতা বৃদ্ধিতে তিনি ঠুমরীর লালিত্য ও কমনীয়তা ব্যবহার করেন।"[১৪৪] সম্ভবত লক্ষ্ণৌতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য তিনি ঠুমরী গান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজস্ব রচনায় প্রয়োগ করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছিলেন। চমকপ্রদ সুর তাঁর গানকে পৃথক করেছিল অন্যদের থেকে। অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানে রাগের ব্যবহার

১৪৩। প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫), পৃ. ২৫৬
১৪৪। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৩১

সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে, প্রচলিত কিছু রাগের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর গানের সুর সৃষ্টি করেছেন। যেসব রাগ অবলম্বনে তিনি বাংলা গানে সুর করতেন, তাদের মধ্যে ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, বেহাগ, কাফি, বাগেশ্রী, ঝিঁঝিট, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি রাগগুলো অধিক ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর রাগভিত্তিক বাংলা গানে। তিনি কাব্যের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে রাগরাগিণীর প্রয়োগ করেছেন। তাঁর রাগাশ্রয়ী গানগুলোতে রাগরাগিণী কখনো গানের ভাষাকে ছাপিয়ে যায়নি। তাঁর গানে টপ্পার ঢং এবং হিন্দি গানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও তাঁর গানে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী সুরের ব্যবহার এবং তার সাথে রাগরাগিণীর সার্থক প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অতুলপ্রসাদের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলো পরবর্তীকালের রাগপ্রধান বাংলা গানকে করেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর।

অতুলপ্রসাদ সেনের রাগরাগিণীর প্রয়োগে শ্রোতার মন জয় করা গানের মধ্যে– যদি তোর হৃদ যমুনা (কীর্তন), কে আবার বাজায় বাঁশি (রাগ: পিলু-বারোয়াঁ), মোর আজি গাঁথা হলো না মালা (রাগ: বারোয়াঁ), কে গো গাহিলে পথে, মোদের গরব মোদের আশা (বাউল সুর), মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে (রাগ: আশাবরী), মম মনের বিজনে, মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে (রাগ: নটমল্লার), বধুঁয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে (রাগ: বেহাগ), ওগো নিঠুর দরদী, একা মোর গানের তরী (রাগ: মিশ্র-বেহাগ), এসো গো ধনী হৃদয়কুঞ্জে (রাগ: ঝিঁঝিট), আমার বাগানে এত ফুল (রাগ: খাম্বাজ), তুমি দাও গো দাও মোরে পরান ভরি (রাগ: ভীমপলশ্রী), কার লাগি সজল আঁখি (রাগ: বাগেশ্রী), হে পান্থ বারেক ফিরে চাও মম মুখপানে (রাগ: সিন্ধু-কাফি), চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে (রাগ: মিশ্র দেশ-পিলু), মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে (বাউল সুর), বঁধু ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আঁখি (রাগ: কালেংড়া), কেন তারে পাই নে দেখা নয়নে (রাগ: কাফি-সিন্ধু), মনোপথে এল বনহরিণী (রাগ: দেশ), তুমি গাও গো (রাগ: বেহাগ), যারা তোরে বাসলো ভালো (রাগ: ভীমপলশ্রী), আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন সাহসে (রাগ: ভৈরবী) উল্লেখযোগ্য। অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কবি, গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা রাগপ্রধান গানের প্রচার, প্রসার ও বিকাশে অতুলপ্রসাদের গান বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত সংগীত পরিবারে ১৮৬৩ সালে। তাঁর পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট গায়ক। ডি.এল. রায় সংগীতের জ্ঞান লাভ করেছিলেন পিতার নিকট

হতে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও গীতিকার। দেশীয় পড়ালেখা শেষ করে তিনি বিলেতে গমন করেন এবং সেখানে পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে নাটক রচনা শুরু করেন এবং জনপ্রিয়তা প্রাপ্তিতে নাটকের প্রয়োজনে গান লেখা আরম্ভ করেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সংগীতরীতিতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকায় তিনি তাঁর গানে সার্থকতার সাথে এর প্রয়োগ করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও সংগীত গ্রন্থ রচয়িতা মোবারক হোসেন খান তাঁর রচনায় লিখেছেন– "বাংলা সংগীত ভুবনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক বিরল প্রতিভা। সংগীত রচনা ও সুরারোপে তিনি সংগীতে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এনেছিলেন। রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুরকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে তিনি বাংলা গানে অভিনবত্ব আনেন।"[১৪৫] বাংলা গানের কথায় ভারতীয় রাগরাগিণী ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুর-মিশ্রণে তাঁর সৃষ্ট গানগুলো পরবর্তীকালে রাগপ্রধান গানের উদ্ভাবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, প্রেম-বিরহ, হাস্যরস, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব বহন করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান আধুনিক যুগের রাগপ্রধান বাংলা গানের উৎস ভাণ্ডারকে পূর্ণতা দানে সহায়তা করে এক অভিনব পদ্ধতিতে। তিনি বাংলা কাব্যগীতিতে রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন পাশ্চাত্যের কায়দায়। তাঁর সৃষ্ট গানগুলোর মধ্যে– ধন ধান্য পুষ্প ভরা (রাগ: কেদার, তাল: দাদরা), আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে (রাগ: মিশ্র-খাম্বাজ, তাল:দাদরা), আমরা এমনি এসে ভেসে যাই (রাগ: ঝিঁঝিট, তাল: যৎ), আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি (রাগ: ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, তাল: যৎ), এ জগতে আমি বড়ই একা (রাগ: ভীমপলশ্রী, তাল: কাহারবা), আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার, আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে (রাগ: ভৈরবী) ইত্যাদি গান উল্লেখযোগ্য। তাঁর গান ছিল সুর নির্ভর। ডি.এল.রায়ের গানে হিন্দুস্থানি রাগের ব্যবহার শুরু থেকেই ছিল। কোন একটি নির্দিষ্ট রাগকে অবলম্বন করে রাগের প্রভাবকে ছাপিয়ে কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়ে গানের রসভাব ফুটিয়ে তোলা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এরূপ বাংলা গান সৃষ্টির ধারা রাগপ্রধান বাংলা গানকে অগ্রগামী করতে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করেছিল।

পঞ্চকবির গান সমকালীন বাংলা গানের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে বহুগুণে। তাঁদের রচনা, সুরের আঙ্গিক, গায়কি ও ভাব-মাধুর্যের জন্য বাংলা গান অতীতে যেমন জনপ্রিয় ছিল বর্তমানেও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

১৪৫। মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৩০

৫.৪ রাগপ্রধান বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য

বাংলার সংগীত অনুরাগীদের নিজস্ব সম্পদ রূপে রাগপ্রধান বাংলা গান প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি বিশেষ ধারার নাম যা শ্রোতার মনে একধরনের বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার ঘটায়। বিভিন্ন ধারার বাংলা গান প্রাচীনকাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং রাগরাগিণীর উপস্থিতি কম বেশি প্রায় সকল ধারার বাংলা গানেই রয়েছে। তবে রাগপ্রধান বাংলা গান সবার থেকে ভিন্ন। এই গানে হিন্দুস্থানি রাগ ও রাগভাবের পাশাপাশি বাংলা কাব্য-ভাবকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে যদি কোন একটি বিষয় বিশেষত্ব অর্জন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সমন্বয়কৃত দুটি বিষয়ের সমান প্রাধান্য রয়েছে। কারণ একটিকে মুখ্য অন্যটিকে গৌণ হিসাবে বিবেচনা করা হলে এদের সমন্বয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বাংলা গানের ধারাগুলোর মধ্যে রাগপ্রধান বাংলা গানের গায়নরীতিতেই কেবল গায়কের স্বাধীনতা লক্ষণীয়। এই গান পরিবেশনে শিল্পী তাঁর দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বনে গানের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে প্রতিটি গায়নরীতির নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একেকটি সংগীত ধারার স্বকীয়তার প্রকাশ করে। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, গজল, দাদরা, বাংলা গান ইত্যাদি বিভিন্ন রীতির গানের মতো রাগপ্রধান বাংলা গানেরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সঙ্গত কারণে বহুসংখ্যক ঐতিহ্যবাহী সংগীত ধারার ভিড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রাগপ্রধান বাংলা গান একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। রাগপ্রধান বাংলা গান সম্পর্কে বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার 'গোপাল দাস গুপ্ত' বলেছেন–

> "বিশুদ্ধ রাগেই কেবল রাগপ্রধান গান গাইতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই গানের মুখ্য বিষয় হবে রাগভাব। হয়তো গান শুনে কোন বিশেষ রাগের চরিত্র নাও ধরা পরতে পারে, কিন্তু গানের মধ্যে যে একটা রাগের ভাব প্রবল তা পরিবেশন ভঙ্গির জন্য বেশি মনে হবে। অর্থাৎ রাগভাবটাই হবে রাগপ্রধান গানের বৈশিষ্ট্য।"[১৪৬]

অর্থাৎ, রাগপ্রধান বাংলা গান শুনে কোন রাগে গীত হচ্ছে তা বুঝতে না পারলেও বিশেষ কোন একটি রাগের আশ্রয়ে যে গাওয়া হচ্ছে তা যেন বোঝা যায়। অন্যথায় রাগে তান, সরগম, বোল সহযোগে রাগপ্রধান গাওয়া হলে তা রাগপ্রধান বাংলা গান অপেক্ষা হিন্দুস্থানি খেয়াল, ঠুমরী হিসাবেই বিবেচিত হবে বলে সংগীতগুণীদের ধারণা। রাগপ্রধান বাংলা গানের অবয়ব তৈরি করা হয়েছে বাংলা কাব্যগীতির উপর ভারতীয় রাগের কাঠামো বা পদ্ধতিতে সুর প্রয়োগ করে। রাগের ছন্দ ও ঢং বজায় রেখে রাগপ্রধান বাংলা গান গীত হয় লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের আধুনিক গায়নপদ্ধতিতে।

১৪৬। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ২৩

যেসব বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে রাগপ্রধান বাংলা গান পরিবেশিত হয় সেগুলো নিম্নরূপঃ–

১। রাগপ্রধান বাংলা গানে রাগভাবই মুখ্য।

২। রাগপ্রধান বাংলা গানে রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহের ক্রমকে অগ্রাহ্য করা হয়।

৩। হিন্দুস্থানি সংগীত রীতির মতো রাগরাগিণীর সময় মেনে রাগপ্রধান গান গাওয়া হয় না।

৪। রাগপ্রধান বাংলা গানে শাস্ত্রীয় ৯ রসের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

৫। রাগপ্রধান বাংলা গানে রাগের মুখ্য অঙ্গগুলো বিশেষভাবে মানা হয়।

৬। এই গানে অধিক অলংকারের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৭। এই গানে রাগের সাথে গানের কথার সামঞ্জস্যতা আবশ্যক।

৮। এই গানের বাণীর শব্দ চয়নে আধুনিকতার স্বাক্ষর রয়েছে।

৯। এই গানের সুর-বিস্তারে গায়কের স্বাধীনতা রয়েছে।

১০। অধিকাংশ রাগপ্রধান বাংলা গানে খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, গজল শ্রেণির গানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন– 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল' রাগপ্রধান গানে খেয়াল গানের গায়নশৈলী লক্ষণীয়।

১১। রাগপ্রধান বাংলা গানে রাগের শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়, তবে গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে ক্ষেত্র বিশেষে রাগের স্বরের সাথে ভিন্ন স্বরের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

১২। রাগপ্রধান বাংলা গানে সঙ্গতকারী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে।

১৩। আদ্ধা, যৎ, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি তালে রাগপ্রধান বাংলা গান অধিক গাওয়া হয়।

১৪। আলাপ, বিস্তার, তান-সরগম ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল গানের সাথে রাগপ্রধান বাংলা গানের বিশেষ মিল রয়েছে।

১৫। ধ্রুপদাঙ্গীয় রাগপ্রধান বাংলা গানে ধ্রুপদের কঠোর নিয়ম মানা হয় না।

১৬। এই গানে বিভিন্ন রাগ অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় সুরের প্রকাশ করা হয়।

১৭। এই গানের কাব্যগীতের প্রতাপে একই রাগের ভিন্ন ভিন্ন গানে আলাদা রসের সঞ্চার ঘটে ।

১৮। এই গানের রাগরূপ প্রকাশক হিসাবে কাজ করে গানের সুর।

১৯। রাগপ্রধান গানের কাব্যাংশ ও রাগের চলনের উপর ভিত্তি করে আরোপিত সুর একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

২০। এই গান হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর কঠোর নিয়ম বহির্ভূত।

২১। এই শ্রেণির গানে রাগরাগিণীর প্রাধান্যতার পাশাপাশি এর আদলে বাংলা সুরের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[১৪৭]

৫.৫ রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচার ও প্রসার

রাগপ্রধান বাংলা গান বাংলা সংগীত জগতে গড়ে ওঠা এক হৃদয়গ্রাহী সংগীত ধারার নাম। হিন্দুস্থানি রাগসংগীত এবং বাংলা কাব্য ও সুরের সাবলিল প্রয়োগে উৎপন্ন গীতধারার নাম রাগপ্রধান বাংলা গান। সংগীতজ্ঞানী ও গুণীর অভিমতে, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এই ধারার গানকে লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতের শাখা থেকে বের করে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে নামকরণ করেন 'রাগপ্রধান' গান। রাগপ্রধান কী? বা এর স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে এই গানে কর্ণপাতের বিকল্প নেই। রাগপ্রধান বাংলা গান যে একটি স্বতন্ত্র গীতধারা হিসাবে খ্যাতি অর্জনের ক্ষমতা রাখে তা কেবল এই গান শুনলেই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সহজ হবে। 'রাগপ্রধান' নামটি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বাংলাসহ সমগ্র ভারতের সংগীত মহলে সারা ফেলেছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল কলকাতা বেতারসহ বাংলার কয়েকজন গুণী সংগীত পূজারিগণের দ্বারা। পরবর্তীতে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকেও এই ধারার গানের প্রচার হয়েছিল। কলকাতা বেতার সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে 'রাগপ্রধান' নামে একটি সংগীতানুষ্ঠানের প্রচার শুরু করেছিল, যেখানে রাগপ্রধান গান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদানসহ এই রীতির গান পরিবেশন করা হতো। ১৯৩৭ সালের পূর্বেই রাগপ্রধান গান সৃষ্টি হয়েছিল। তবে জনসম্মুখে এর প্রচার শুরু হয় প্রথম কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রাগপ্রধান' শিরোনাম দিয়ে। ১৯২৭ সালে কলকাতা বেতারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম দিকে ঠুমরী, খেয়াল, টপ্পা, বৈঠকি গান প্রচারে উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া পাওয়া না গেলেও 'রাগপ্রধান' নামে অনুষ্ঠান প্রচারের পর থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয়তা তখন আকাশ ছোঁয়া। অপরদিকে কলকাতা বেতারের প্রচারনায় রাগপ্রধান বাংলা গান হিন্দুস্থানি রাগসংগীত ও বাংলা গানের শ্রোতাবৃন্দের নজরে আসে। কলকাতা বেতার কর্তৃক প্রচারিত 'রাগপ্রধান' নামক গানের অনুষ্ঠান তৎকালীন সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কলকাতা বেতার কেন্দ্র ও রাগপ্রধান বাংলা গান পরস্পর একে অপরকে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠা লাভের পর পূর্ব বাংলায়ও লোকগান, রাগাশ্রয়ী বাংলা গান, লঘু উচ্চাঙ্গ শ্রেণিভুক্ত বাংলা গানের পাশাপাশি রাগপ্রধান বাংলা গানেরও জনপ্রিয়তা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তবে কলকাতা বেতারের তুলনায় ঢাকা বেতারে রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রাধান্য কম ছিল। পূর্ব বাংলায় ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। তৎকালীন সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব

১৪৭। তদেব

পালন করেছিলেন যথাক্রমে– নির্মল ভট্টাচার্য, গোপাল দাশগুপ্ত, চিন্ময় লাহিড়ী, গিরিন চক্রবর্তী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সুরকারগণ।

তৎকালীন সময়ে রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচার ও প্রসারে যে সকল বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-১৯৪৫), তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৭৫), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭), সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯২০-১৯৫২), চিন্ময় লাহিড়ী (১৯২০-১৯৮৪), গিরিজা শংকর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮), কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-), বেগম আখতার (১৯১৪-১৯৭৪), শচীনদেব বর্মন (১৯০৬-১৯৭৫), জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ (১৯০৯-১৯৯৭), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯), অখিলবন্ধু ঘোষ (১৯২০-১৯৮৮) প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচলন শুরুর পর যার কণ্ঠে অসংখ্য রাগপ্রধান গান গীত হয়েছিল এবং যার পরিবেশন ভঙ্গি শ্রোতার হৃদয় হরণ করেছিল ও জনপ্রিয় করেছিল রাগপ্রধান বাংলা গানকে তিনি হলেন শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী। জ্ঞান গোঁসাই নামেও তিনি তৎকালীন সংগীত সমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর দখল ছিল নজরকাড়া। খেয়াল গানে তাঁর অধিক জ্ঞান এবং পারদর্শিতার কারণে তাঁর গাওয়া অধিকাংশ রাগপ্রধান বাংলা গান শুনলে মনে হয় যেন বাংলা খেয়াল। তাঁর গায়কিতে খেয়ালের অঙ্গ অধিক প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী সম্পর্কে শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী বলেছেন–

> "জ্ঞান গোঁসাইকে মেগাফোন কোম্পানীর JNG 5114 রেকর্ডে পাই Prof. Jnanendra Pro. goswami রূপে। এই রেকর্ডখানাতে তিনি দুটি বাংলা গান গেয়েছেন পুরোপুরি খেয়াল অঙ্গে। গমক, সাপাট, ছুটতান, তান, বোলতান সবকিছুই এই গান দুখানাতে প্রয়োগ করেছেন। একটি গান তুলসী লাহিড়ীর কথায় 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল'। তবে সুরকারের নাম নেই। লেখা আছে Bengali Bhajan। ভজন, নট-মল্হার। দ্বিতীয় গানখানাও Bengali Bhajan – ভজন-ভৈঁরো বলে লেখা আছে। গানটির কথা 'চিরসুন্দর নওল কিশোর'। গীতিকার তুলসী লাহিড়ী। সুরকারের নাম নেই। বড়মুখের ভারী আওয়াজওয়ালা তবলা ও হারমোনিয়ামের সঙ্গে পুরোপুরি খানদানি বৈঠকী মেজাজের আসরের এই গানটিকে আমরা বাংলা খেয়াল বলতে পারি। কারণ এখানে রাগের বাঁধা-ধরা এবং খেয়ালের কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত মেনেই গানটি শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োগ নৈপুণ্যে এক অনুপম কুশলতায় প্রকাশ করেছেন। সুর-সৃষ্টি, সুরকার বা কম্পোজার বলতে আমরা যা বুঝি এই নট-মল্লার ও ভৈঁরো রাগে গাওয়া গান দুটিতে তাঁর কোন ভূমিকা যদিও থাকে– বিশেষ নেই। এই কারণেই বোধহয় রেকর্ডখানিতে গীতিকারের নাম আছে– সুরকারের নাম নেই– এবং নাম নেই বলেই অনুমান করে নিতে পারি যে শিল্পী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী তাঁর ভারতীয় রাগসংগীতের শিক্ষাগত নৈপুণ্য বাংলা কথার

মাধ্যমে প্রকাশ করে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। হয়ত বিস্মিত করেছেন কিন্তু সুর-স্রষ্টার ভূমিকা পালন করেননি, রাগপ্রধান বাংলা গানের জন্য যার প্রয়োজন। তবে তাঁর এই সংগীতে নিশ্চিতরূপেই পাই রাগপ্রধান বাংলা গানের উৎস ধারা।"[১৪৮]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত কথা ও সুরে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া গানের সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁর গাওয়া গানে রাগভাব স্পষ্ট ধরা যায়। গানগুলো শুনলে মনে হয় যেন বাংলা খেয়াল। কারণ বেশিরভাগ গানই খেয়াল বা টপ্পার অঙ্গে গীত হয়েছে। তাঁর কণ্ঠে গীত রাগপ্রধান গানে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব লক্ষণীয়। যত বাংলা গান তিনি গেয়েছেন সব গানেই তাল-সুরের বন্ধন ছিল অটুট। সংগীত গুণীজনদের মতে, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গানের মতো সুর এবং তালের শক্ত বাঁধুনি বর্তমান কালের রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোতে তেমন দেখা যায় না। তাঁকে বলা হয় বাংলা রাগসংগীতের দিকপাল। তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানের কাব্য-ভাব, রাগরাগিণীর রাগভাব ও সুরকে ছাপিয়ে কখনোই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। জ্ঞান গোঁসাই রাগপ্রধান বাংলা গানের অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর মাধ্যমে রাগপ্রধান বাংলা গানের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।[১৪৯]

জ্ঞান গোঁসায়ের পর যারা রাগভিত্তিক বাংলা গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে তারাপদ চক্রবর্তী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে আমরা বর্তমানের পরিশুদ্ধ রাগপ্রধান বাংলা গানের সন্ধান লাভ করেছি। তাঁদের গাওয়া রাগভিত্তিক বাংলা গানগুলোর প্রচার-প্রসারের জন্যই রাগপ্রধান বাংলা গানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। উক্ত বাংলা গানের পূর্বসূরীগণ হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে যেসব রাগ ভিত্তিক বাংলা গান গেয়েছেন, তার অধিকাংশই খেয়াল ও ঠুমরীর ভঙ্গিতে গাওয়া। ঠুমরী ও খেয়াল গানের আঙ্গিকে তাঁরা যেসব প্রতিষ্ঠিত বাংলাগান গেয়েছেন সেগুলো দ্বারা বর্তমানের রাগপ্রধান বাংলা গান অধিক প্রভাবিত হয়েছে। তারাপদ চক্রবর্তী ছিলেন খেয়াল ও ঠুমরী গায়ক। তারাপদ চক্রবর্তী প্রথম জীবনে কাজ করেন তবলা বাদক হিসাবে কলকাতার আকাশবাণীতে। একবার সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে জ্ঞান গোঁসাই-এঁর অনুপস্থিতির জন্য গান পরিবেশনের সুযোগ আসে তাঁর। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সহস্রজনের মনে জায়গা করে নেন রাগপ্রধান বাংলা গানের নতুন কাণ্ডারিরূপে। তাঁর গাওয়া– বনে বনে পাপিয়া বোলে (বাহার), চামেলি আঁখি মেল (ভূপাল-টোড়ী) ইত্যাদি গানগুলো খেয়াল অঙ্গে গীত। রাগসংগীতে পারদর্শিতার জন্য তাঁর গাওয়া প্রায় সব গানই মনে হতো বাংলা খেয়াল। অন্যদিকে খেয়াল, ঠুমরী ও টপ্পা গানের প্রসিদ্ধ গায়ক হয়েও রাগপ্রধান বাংলা গানে শাস্ত্রীয় ভাবের প্রতিফলন ঘটাননি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

১৪৮। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ. ২৫–২৬
১৪৯। তদেব

তিনি তাঁর গায়কি দিয়ে তৎকালীন সময়ে রাগপ্রধান বাংলা গানে নতুন মাত্রার যোগ করেছিলেন। রাগপ্রধান বাংলা গানে স্বতন্ত্রতার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে তাঁর গায়কি অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। কাফি-ভৈরবী রাগে 'যদি মনে পড়ে সে দিনের কথা' এবং জয়জয়ন্তী রাগে 'ফুলের দিন হলো যে অবসান' গান দুটি ভীষ্মদেবের গাওয়া সার্থক রাগপ্রধান গানের উদাহরণ।[১৫০] রাগপ্রধান গানের প্রচার-প্রসারে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ব্যতিক্রমধর্মী কণ্ঠস্বর ও গায়কির দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাগপ্রধান বাংলা গানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে আসেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। যদিও তাঁর গানে খেয়াল, ঠুমরী, কাওয়ালি প্রভৃতি অঙ্গের আধিক্য ছিল, কিন্তু রাগপ্রধান বাংলা গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা কাব্য-ভাবের প্রতি ছিলেন যত্নশীল। দ্রুত গতির তানসহ বিভিন্ন প্রকার অলংকারের উপস্থিতি ছিল তাঁর গানের লক্ষণীয় দিক। বাংলা রাগভিত্তিক গানের সুরকার রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। বাংলা ভাষায় রচিত গানের সুর সৃষ্টিতে সার্থক রূপকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণজন্মা এই শিল্পী-সুরকার রাগপ্রধান বাংলা গানকে করেছেন মহিমান্বিত। তাঁর গান ছিল ঠুমরী গানের সুর-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তাঁর সুর করা গানগুলোর মধ্যে– রজনীগো যেওনা চলে এখনও যায়নি লগন, অলিরে ডাকে আজি চাঁপা কলি জোছনাতে, গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায় বিরহের বালুচরে ইত্যাদি গানগুলোতে ঠুমরী গানের নানান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুর সংযোজনার প্রসঙ্গে অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী লিখেছেন–

> "রাগ-সংগীতের সুরে সমৃদ্ধ সুধীরলালের যে সমস্ত বাংলা গান আধুনিক বাংলা গানের সম্পদ এবং পরোক্ষভাবে পরবর্তীকালের উদীয়মান সুর-শিল্পীদের রাগপ্রধান গানের সুর রচনার একটা আধুনিক ধারার ইশারা দিতে পেরেছে তার মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে 'সাথীহারা রাতে বিমনা বনের পাখী', 'খেলাঘর মোর ভেঙে গেছে হায়', 'তুমি কতদূরে কোন গহন আঁধারে ওগো চিরতরে গেছ হারায়ে' ইত্যাদি গান।"[১৫১]

অর্থাৎ, রাগপ্রধান বাংলা গানের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগ করে সময়োপযোগী আধুনিক সুর সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। তিনি বাংলা আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবেও সমাধিক পরিচিত। সুধীরলাল তাঁর সুরের মায়াজালে শ্রোতাদের এমনভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে, সাধারণ একজন শ্রোতাও গান শুনে সহজেই সুধীরলালের সুর চিহ্নিত করতে পারতেন।

১৫০। তদেব

১৫১। তদেব, পৃ. ৯০

হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন গায়ন ধারায় প্রভাবিত রাগপ্রধান বাংলা গানের আরেক পথিকৃৎ হলেন চিন্ময় লাহিড়ী। পঞ্চাশের দশকে চিন্ময় লাহিড়ী ছিলেন নবাগত প্রতিষ্ঠিত রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পী। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তিনি খেয়াল, ঠুমরী, গজলসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সংগীতরীতিতে পারদর্শী ছিলেন। 'রাগপ্রধান বাংলাগান' শিরোনামে তিনি অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোর মধ্যে পবিত্র মিত্রের কথা ও চিন্ময় লাহিড়ীর সুরে– 'রজনী ফুরালো যে পথ পানে চাহিয়া, রাধানামে শুধু বাঁশরী বাজে' গান দুটি আধুনিক রাগপ্রধান গানের পরিচয় বহন করে। রাগপ্রধান বাংলা গানে সুধীরলাল চক্রবর্তীর আধুনিক সুরারোপের ধারা পরবর্তীকালে চিন্ময় লাহিড়ীর সুরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি তাঁর গানে অলংকার হিসাবে ছোট ছোট তান, সরগম, হরকত প্রভৃতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, কিন্তু তা খেয়ালের মতো করে নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র পরিসরে এইসব অলংকারের প্রয়োগ ও ভাষার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখে রাগপ্রধান বাংলা গান নামে শ্রুতিমধুর একপ্রকার আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি করা। তাঁর এই মতাদর্শের কারণেই অন্য সকল বাংলা রাগপ্রধান গানের শিল্পীদের থেকে চিন্ময় লাহিড়ীর গানের ধরন ছিল ভিন্ন।

তৎকালে আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীদের মধ্যে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সকলের পরিচিত মুখ। তিনি পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ীর নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গের সংগীত শিক্ষা লাভের পর সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃজনশীল সংগীত ভাবনা থেকে বাংলা গানে এমন এক রূপ ও রসের সৃষ্টি করেছিলেন যা, আধুনিক থেকে উচ্চাঙ্গের সকল শ্রোতার মন আবিষ্ট করেছিল। তাঁর গানে ঠুমরীর প্রভাব লক্ষণীয়। "পবিত্র মিত্রের কথায় ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে রেকর্ডকৃত নন্দকোষ রাগে 'কোথা তুমি ঘনশ্যাম' ও কাফি রাগের 'ওগো শ্যাম মিনতি তোমায়' গান দুটি ঠুমরী অঙ্গে গীত হয়েছিল। এছাড়াও 'কেন জানি না বাজে' ও 'পথ চেয়ে রাধিকা' গান দুটি গেয়ে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় রাগপ্রধান বাংলা গানে নতুন জোয়াড় এনেছিলেন।"[১৫২] তবে রাগপ্রধান বাংলা গানে তাঁর পথচলা ছিল ক্ষণিকের। এই প্রসঙ্গে অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী বলেছেন– "আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম সার্থক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় 'রাধিকা বিহনে কাঁদে রাধিকা রমন', 'কোথা তুমি ঘনশ্যাম' প্রভৃতি গান গেয়ে একটা বেগবর্তী রাগপ্রধান সংগীতের স্রোতধারা সৃষ্টি করতে গিয়েও কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।"[১৫৩] তিনি নতুন ধারার রাগপ্রধান বাংলা গানের বহু শ্রোতা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর হৃদয়গ্রাহী গায়কির মাধ্যমে।

১৫২। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৫০
১৫৩। তদেব, পৃ. ১১

আধুনিক যুগে অর্থাৎ, পঞ্চাশের দশকে রাগপ্রধান বাংলা গানে প্রধান শিল্পী বিবেচনায় চিন্ময় লাহিড়ীর নাম অগ্রগণ্য। এই যুগের রাগপ্রধান গানে তিনি নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়েছিলেন। অপরদিকে গীতরচনা ও সুর সংযোজনার মাধ্যমে আধুনিক কালের রাগপ্রধান বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ মহাশয়। তিনি নিজে খুব কম গান গেয়েছেন। তবে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রতিভাবান শিল্পীদের দিয়ে অসংখ্য রাগপ্রধান বাংলা গান তিনি উপহার দিয়েছেন। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ছিলেন একাধারে শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীত ও যন্ত্র সংগীতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোর মধ্যে– কোয়েলিয়া গান থামা এবার, পিয়া ভোল অভিমান, আমি সুরে সুরে ওগো তোমায় ছুয়ে যাই, ফিরায়ে দিও না মোরে শূন্য হাতে, আজি বসন্তে মঞ্জুল বায় ইত্যাদি বিখ্যাত গানগুলো আধুনিক সংগীত সমাজকে সুরের মায়াজালে আবিষ্ট করেছিল। তাঁর গানে ঠুমরী গানের গায়ন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। কোয়েলিয়া গান থামা এবার ও পিয়া ভোল অভিমান গান দুটি যথাক্রমে মাঝ-খাম্বাজ ও পিলু রাগের ঠুমরী গানের আদলে সৃষ্ট। রাগপ্রধান গান রচনায় এবং এর সুউচ্চ অবস্থান নিশ্চিত করতে জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ছিলেন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। রাগপ্রধান বাংলা গান প্রতিষ্ঠায় জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "রাগপ্রধান বাংলা গান রচনা করে এবং তাতে সুর সংযোজনা করে যদি কেউ বাংলা দেশে রাগপ্রধানের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সার্থক প্রচেষ্টা করে থাকেন তবে তিনি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।"[১৫৪] তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানের মধ্যে– নিশীথ শয়নে জাগে আঁখি উদাসী, চরণের ধ্বনি শুনে, বসন্তে মঞ্জুল বায় প্রভৃতি অনেক গান রাগপ্রধান বাংলা গানের চিরস্থায়ী সম্পদ।

রাগপ্রধান বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যিনি প্রচারবিমুখ একজন শিল্পী ও সুরস্রষ্টা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হলেন অখিলবন্ধু ঘোষ। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতে অসামান্য জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সংগীত জীবন অতিবাহিত করেছেন আধুনিক ও রাগপ্রধান বাংলা গানের সমৃদ্ধির পেছনে। রাগপ্রধান বাংলা গানে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী একজন গুণী শিল্পী। তাঁর গাওয়া রাগপ্রধান গানগুলোর মধ্যে, আজি চাঁদনি রাতি গো, জাগো জাগো প্রিয়, বরষার মেঘ ভেসে যায় ইত্যাদি গানগুলো উল্লেখযোগ্য। বাংলা গানের কথার সাথে ভারতীয় রাগরাগিণীর সংমিশ্রণ যে মধুর সুরের সৃষ্টি করে হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়, তার উদাহরণ হলো অখিলবন্ধু ঘোষের রাগপ্রধান বাংলা গানগুলো।

১৫৪। তদেব, পৃ. ১২

বিংশ শতাব্দীতে রাগপ্রধান বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে যিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন তিনি সংগীতাচার্য শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী। সংগীত সমাজে তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী হিসেবেই সমাদৃত। তাঁর রচিত ও সুর সংযোজিত অসংখ্য গান বেশ জনশ্রুতি অর্জন করেছিল বিংশ শতাব্দীতে এবং বর্তমানকালেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। রাগপ্রধান বাংলা গান রচনায়, সুর সংযোজন এবং গানের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে রাগরাগিণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অধিক দক্ষ ও বিচক্ষণ। যার দরুন তাঁর গানগুলো মানুষের মনে সহজেই স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। রাগপ্রধান বাংলা গান সৃষ্টিতে তাঁর সুনিপুণতা দেখে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতীয় রাগসংগীতে তাঁর দক্ষতা কতখানি। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরীর গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রথিতযশা শিল্পীবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, পণ্ডিত অরূণ ভাদুরী, ওস্তাদ রসিদ খান, বিদুষী শিপ্রা বসু, ভারতী কর চৌধুরী, অনসূয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যে রিনিঝিনি পায়ে শ্রীমতী চলে (রাগ:মধুবন্তী), গুঞ্জরনে এলো অলি (রাগ: ছায়াহিন্দোল, ঐ ঘিরে আসে বাদলের মেঘ (রাগ: দেশ), কেন তুমি প্রিয় (রাগ: পিলু) ইত্যাদি রাগপ্রধান গানগুলো অধিক জনশ্রুতি অর্জন করেছে। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী বাংলা রাগপ্রধান গানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন 'রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে। রাগপ্রধান বাংলা গানের সৃষ্টি এবং প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি বাংলা সংগীত জগতে চির অমর হয়ে আছেন।

রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচার-প্রসারে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখিত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার ছাড়াও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগম আখতার, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, নির্মলা মিশ্র, হৈমন্তী শুক্লা, অরুণ ভাদুরী, অজয় চক্রবর্তী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, আঙ্গুর বালা, কানন বালা প্রমুখ শিল্পীবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

৫.৬ রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব

প্রভাব শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে তা হলো, কোন কিছুর অনুসরণ বা অনুকরণ করা। তেমনি রাগপ্রধান বাংলা গানে পূর্বের ঠুমরী গানের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলো অনুসরণ করা হয় বলে একথা গ্রহণীয় যে রাগপ্রধান বাংলা গান ঠুমরী গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রাগপ্রধান বাংলা গানে বিভিন্ন গীতশৈলীর প্রভাব সম্পর্কে শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, "বর্তমানে যেসকল রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রচলন রয়েছে তাতে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীত ছাড়াও ঠুমরী, দাদরা, কাজরী, গজল ইত্যাদি লঘু চালের রাগভিত্তিক গানের

যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি আরও বলেছেন যে, বাংলা রাগপ্রধান গানকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে ঠুমরী ও দাদরা গান।"[১৫৫] তাঁর এ কথা থেকে আরও স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, বর্তমান কালের রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরী গানের প্রভাব অনেক। ঠুমরী গানের বিভিন্ন রীতি যেমন– বোল-বানাও, রাগমিশ্রণ, হালকা চাল, গানের কথা ও সুরের মধ্যে রসের সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্তমান রাগপ্রধান বাংলা গানে অধিক পরিলক্ষিত হয়। রাগপ্রধান বাংলা গান খেয়াল গানের শর্তাধীন নয়। রাগপ্রধান বাংলা গানগুলো ঠুমরী গানের অনুরূপ সুর-বিস্তার নির্ভর। তাই বর্তমান রাগপ্রধান গানে ঠুমরীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সুধীরলাল চক্রবর্তী, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বেগম আখতার, অজয় চক্রবর্তী, অরুণ ভাদুরী, শিপ্রা বসু প্রমুখ শিল্পীবৃন্দের রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোতে ঠুমরী গানের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যারা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা সকলেই খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, গজল, টপ্পাসহ ভারতীয় রাগসংগীতের বিভিন্ন ধারায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা খেয়াল, ঠুমরী ও দাদরার আধারে যে প্রতিষ্ঠিত বাংলা গান গেয়েছেন, সেগুলো বর্তমানকালের রাগপ্রধান বাংলা গানকে অনেক প্রভাবিত করেছে। রাগপ্রধান বাংলা গান গাওয়ার জন্য হিন্দুস্থানি রাগরাগিণী এবং বাংলা গান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই যারা রাগপ্রধান গানের স্রষ্টা তাঁরা উচ্চাঙ্গের সংগীতশৈলীতে ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ। রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরীর প্রভাব বা সাদৃশ্য নিম্নরূপ–

বিষয়বস্তু

রাগপ্রধান বাংলা গানের কাব্যাংশ রচনার ক্ষেত্রে উপজীব্য বিষয় হিসাবে গণনা করা হয় রাধা-কৃষ্ণের লীলা, মানব মানবীর প্রেম-বিরহ এবং বর্ষামুখর দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার আকুলতা, বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, আবেগ, অভিযোগ, বিবাদ ইত্যাদি ঠুমরী গানের বিষয়গুলো রাগপ্রধান বাংলা গানে অধিক পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রেম-বিরহ ও মান-অভিমান প্রকাশার্থে– পিয়া ভোল অভিমান মধুরাতি বয়ে যায়, বিবাদ ও অভিযোগ প্রকাশার্থে– জোছনা করেছে আড়ি আসেনা আমার বাড়ি, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও মিনতি অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে– ফিরায়ে দিওনা মোরে শূন্য হাতে ইত্যাদি রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা ঠুমরী অঙ্গেই গাওয়া হয়ে থাকে।

১৫৫। শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ১১

তাল

রাগপ্রধান বাংলা গানে সচরাচর যে তালগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অধিকাংশ তাল ঠুমরী গানেও প্রয়োগ হয়। দাদরা, কাহারবা, যৎ, ত্রিতাল, আদ্ধা ইত্যাদি তালগুলো ঠুমরী এবং রাগপ্রধান বাংলা গান উভয় সংগীতরীতিতেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু রাগপ্রধান বাংলা গানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই তাল বিরাজমান থাকে, যেখানে ঠুমরী গানের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ উঠান পর্বে মূল তাল পরিবর্তন করে দাদরা বা কাহারবা তালে তবলায় লগ্‌গী বাজানো হয়। তবে রাগপ্রধান বাংলা গানে একতাল, ঝাঁপতাল, রূপক প্রভৃতি তালেরও ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ঠুমরী ও রাগপ্রধান উভয় শ্রেণির গানে সুর এবং কাব্যগীতির সংমিশ্রণের সুবিধার্থে এই তালগুলোর ব্যবহার করা হয়।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

যেহেতু অধিকাংশ রাগপ্রধান বাংলা গান ঠুমরী অঙ্গে গাওয়া হয়, সেহেতু গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঠুমরী গানের সাথে প্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও রাগপ্রধান বাংলা গানে করা হয়। ঠুমরী গানে তানপুরা, তবলা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র শুরু থেকে থাকলেও হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করেন গণপৎ রাও। হারমোনিয়ামের ব্যবহার ঠুমরী গানকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় সমসাময়িক বিভিন্ন সংগীত ধারা থেকে। রাগপ্রধান বাংলা গানেও তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। রাগপ্রধান বাংলা গানের সুর সৃষ্টিতে তৎকালীন সংগীতগুণীরা হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করেছেন অধিক। তাছাড়া রাগপ্রধান বাংলা গানে তবলা, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গীর মতো বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে এই ধারার গানের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাগ সংখ্যা ও রাগ মিশ্রণ

রাগ মানেই হলো এর রঞ্জকতা গুণ থাকবে। আমরা জানি যে, হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর সকল রাগ ঠুমরী গানের জন্য উপযোগী নয়। ঠুমরী গানের কাব্য-ভাবের সাথে স্বর বা সুর যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে ঠুমরী গানের কবিতার অর্থ বা ভাব যেমন সঠিকভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হবেনা তেমনই রাগও তার রঞ্জকতা হারাবে। ঠুমরী গানের কাব্যাংশে ঐকান্তিক প্রেমের করুণ কাহিনীর বর্ণনা থাকায় শৃঙ্গার রসাত্মক সুর সৃষ্টিতে সক্ষম এমন রাগের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ঠুমরী গানে ভৈরবী, ঝিঁঝিট, গারা, খাম্বাজ, বেহাগ, কাফি, দেশ, কিরওয়ানী, তিলক কামোদ, পিলু, যোগীয়া, জংলা, সোহিনী, কালেংড়া ইত্যাদি রাগের ব্যবহার বেশি করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রাগপ্রধান বাংলা

গানও অল্প সংখ্যক রাগরাগিণীর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের অজস্র রাগরাগিণীর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক রাগে বাংলা রাগপ্রধান গান গাওয়া হয়। বাংলা গানের কাব্যরস ও বাঙালিয়ানা সুরের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন রাগের উপর ভিত্তি করেই রাগপ্রধান বাংলা গানের সৃষ্টি। এখন করুণ বিরহগাঁথার সাথে যদি দীপক রাগের ব্যবহার করা হয় তা হলে, না হবে ঠুমরী, না হবে রাগপ্রধান। এক কথায় বলতে গেলে ঠুমরী বা রাগপ্রধান গানের যে আবেদন, তা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাবে। গানের বাণীর সাথে তাই সঠিক রাগের মিলন ঘটানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঠুমরী গানে ব্যবহৃত অধিকাংশ রাগ বাংলা রাগপ্রধান গানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ঠুমরী অপেক্ষা রাগপ্রধান বাংলা গানের রাগ সংখ্যা একটু বেশি। ঠুমরী গানে ব্যবহৃত রাগ ছাড়াও বাংলা রাগপ্রধান গানে বসন্ত, বাহার, মালকোষ, মধুবন্তী, মিয়া-মল্লার, দরবারী, রামকেলী, ললিত, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি রাগের ব্যবহার দেখা যায়। রাগপ্রধান গানে মূল রাগের সাথে বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে এমন রাগের মিশ্রণের যে লালিত্য দেখা যায় তাও ঠুমরী গানের অনুকরণেই করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ– কাফি-ভৈরবী রাগে ভীষ্মদেবের 'যদি মনে পড়ে সে দিনের কথা', ভূপাল-টোড়ী রাগে তারাপদ চক্রবর্তীর 'চামেলী মেল আঁখি', কোমল-আশাবরী রাগে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মধুরাতি ভোর হয়', সিন্ধু-কাফি রাগে জ্ঞান গোঁসাই এঁর 'ওগো যাহা কিছু মোর', যোগীয়া-ভৈরবী রাগে নিরোদ বরণ বড়ুয়ার 'জাগায়ো না তারে' ইত্যাদি গানগুলো উল্লেখযোগ্য।

অবয়ব/তুক

প্রচলিত আধুনিক বাংলা গানের তুলনায় রাগপ্রধান বাংলা গানের বাণীর পরিসর ক্ষুদ্র, ঠিক যেন ঠুমরী গানের মতো। তাই ঠুমরী গানের মতো এই শ্রেণির গানের গঠনপ্রণালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই তুক বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যথা:- স্থায়ী এবং অন্তরা। এরকম প্রভাবের কারণ হতে পারে সরাসরি হিন্দি, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত ঠুমরী গানের অনুকরণে শুধুমাত্র ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঠুমরী অঙ্গে বাংলা রাগপ্রধান গান সৃষ্টির জন্য। যেহেতু ঠুমরী গানের রাগ, তাল, সুর, কাঠামোর অনুকরণের ফলে কথার পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি, সেহেতু পরবর্তীকালে একই নিয়মে রাগপ্রধান গান সৃষ্টির ফলে দুই তুক বিশিষ্ট বাণী রাগপ্রধান বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

কথা ও সুরের সমন্বয়

রাগপ্রধান বাংলা গানে কথা ও সুর পরস্পর সমান মর্যাদা বহন করে। সুরকে সঙ্গে নিয়ে কথা বা কাব্যের যে পথচলা পরিলক্ষিত হয় এই রকম রীতি ঠুমরী গানের অনুকরণে রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠাই নিয়েছে বলা যায়। কারণ ঠুমরী গানে রাগের চেয়ে গানের কাব্য-ভাবকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কাব্যের যথার্থ ভাব

ফুটিয়ে তুলতে গানের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ঠুমরী গানে। একই ভাবে রাগপ্রধান বাংলা গানের রাগভাব এবং কাব্য-ভাব উভয় প্রকাশ পায় কথা ও সুরের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে। গানে কোন একটির কম বা বেশি প্রয়োগ বাংলা রাগপ্রধান গানের বৈশিষ্ট্য বা কাঠামো বহির্ভূত। রাগসংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল গায়নকালে কথার চেয়ে সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি। এর যথাযথ কারণও রয়েছে। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে যে রাগ ব্যবহৃত হয় তার সঠিক রূপ প্রকাশের জন্য শিল্পীকে কথার চেয়ে সুরের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হয়। এর কারণ হলো শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগের রাগরূপ প্রকাশের মাধ্যমই সুর। কিন্তু বাংলা রাগপ্রধান গানে সুর এবং ভাষার প্রাধান্য সমান। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষার কাব্যের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাংলা কাব্যকে ছাপিয়ে রাগ বা সুর কখনো বাঙালি শ্রোতার মনে স্থান করেতে পারে না। বাংলা গানে কথা ও সুরের গুরুত্ব বোঝাতে মীনাক্ষী বিশ্বাস বলেছেন –

> "বাংলার সংগীতে 'কথার সাথে সুরের পরিণয় ঘটেছে' বা 'বাণীর সাথে সুরের মিলন' অর্থাৎ কথা এবং সুর দুই সমান তালে চলে এখানে। উত্তর ভারতীয় সংগীতে সে জায়গায় কথা বা গীতের ভাবের চেয়ে সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। এখন সুরের বিভিন্ন উত্থান, পতন, কায়দা-কানুন, কালোয়াতি ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে যতই মাহাত্ম্য থাক না কেন বাঙ্গালির মনে তা দাগ কাটতে পারে নি।"[১৫৬]

মীনাক্ষী বিশ্বাসের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের গায়নরীতি যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, বাঙালির মনকে আকৃষ্ট করতে হলে গানে বাংলা কাব্যগীতের যথাযথ উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাগপ্রধান গান প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে, রাগপ্রধানের সাথে বাংলা গান কথাটির সংযোজন যথার্থ অর্থ প্রকাশে সক্ষম।

বোল-বানাও বিস্তার

বোল-বিস্তার রাগপ্রধান বাংলা গানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ঠুমরী গানের অনুসরণেই রাগপ্রধান বাংলা গানে বোল-বিস্তারের লালিত্য এসেছে। রাগপ্রধান বাংলা গানে ঠুমরী গানের অনুরূপ বোল-বানাও বিস্তার (অভিব্যক্তির প্রকাশ) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। বোল-বানাও বা বোল-বিস্তার বলতে বোঝায়, গানের বাণীকে এমন ভাবে ভাঙ্গা যেন কথার অর্থ পরিবর্তন না হয় কিন্তু নতুন ভাবের সঞ্চার ঘটে। অর্থাৎ, গানের কাব্যাংশ থেকে কিছু কিছু শব্দ নিয়ে রাগের স্বরের উপর বসিয়ে নতুন ভাব ও রসের সৃষ্টি করা যেখানে গানের বাণীর অর্থ এবং রাগের স্বর উভয় বিশুদ্ধ থাকবে। কলকাতাসহ সমগ্র বাংলায় ঠুমরীর অধিক চর্চা পরবর্তীকালের রাগপ্রধান বাংলা গানে এরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণ হতে পারে। তাই একথা স্পষ্ট যে রাগপ্রধান বাংলা গান ঠুমরী গানের দ্বারা অধিক প্রভাবিত।

১৫৬। মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা* (কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

রাগরূপ আলাপ

রাগরূপ আলাপ, ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের গায়নশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উভয় গীতধারায় সংক্ষিপ্ত আলাপের প্রচলন রয়েছে। এই আলাপ খেয়ালের ন্যায় স্বর-নির্ভর না হয়ে সুর-নির্ভর হয়ে থাকে। খেয়ালের পরিবেশনায় রাগের চলনের উপর ভিত্তি করে এর আলাপে ধীর লয়ে যথাযথভাবে স্বরের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে ঠুমরী গানের আলাপে সংক্ষিপ্ত আকারে অলংকারযুক্ত স্বর প্রয়োগ করে রাগরূপ প্রকাশ করা হয়। রাগপ্রধান বাংলা গানেও ঠুমরীর মতোই স্বর-নির্ভর আলাপের চেয়ে সুর-নির্ভর আলাপের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু ঠুমরী গান বাংলা রাগপ্রধান গান অপেক্ষা প্রাচীন গীতশৈলী তাই রাগরূপ আলাপের যে লালিত্য রাগপ্রধান বাংলা গানে লক্ষ্য করা যায় তা ঠুমরী গান থেকেই এসেছে বলে ধারণা করা হয়।

হালকা চাল

হালকা চাল বলতে গম্ভীর প্রকৃতি ও ভারি গমকমুক্ত গায়নপদ্ধতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেখানে রাগ গায়নের কঠিন ও জটিল নিয়ম অপেক্ষা সহজ-সরল প্রকৃতির সুরে কাব্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়। বাংলা রাগপ্রধান গানের পরিবেশনা রীতিতে হালকা চালের ব্যবহার ঠুমরী গান থেকেই এসেছে। কারণ ঠুমরী গানে হালকা চাল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অন্যদিকে খেয়াল বা ধ্রুপদে গম্ভীর ভাবের অধিপত্য লক্ষণীয়।

স্বর-বিস্তারে স্বাধীনতা

স্বর বিস্তারের স্বাধীনতা বাংলা রাগপ্রধান গানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে ঠুমরী গানেও এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গানের মাঝে শিল্পী তার ইচ্ছামতো রাগরূপ ঠিক রেখে বিভিন্নরকম নান্দনিক স্বরসমষ্টির রচনা করে বাংলা রাগপ্রধান গানের সৌন্দর্য বর্ধন করে থাকেন। এতে গানের রাগভাব ও কাব্যরসের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না বরং গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ পণ্ডিত অরুণ ভাদুরীর গাওয়া 'ঐ ঘিরে আসে বাদলের মেঘ' এবং 'গুঞ্জরনে এলো অলি' গান দুটি শুনে নিলে বুঝতে সহজ হবে যে, দক্ষতার সাথে সঠিক স্বর-বিস্তার গানের মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি করে। গান দুটির গীতিকার ও সুরকার শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী। প্রথম গানটি দেশ রাগের এবং দ্বিতীয় গানটি ছাঁয়া-হিন্দোল রাগ দ্বারা নিবন্ধিত। বাংলা রাগপ্রধান গানে স্বর-বিস্তারের স্বাধীনতা ঠুমরী গানের প্রভাবের বার্তা বহন করে। স্বর-বিস্তার অবশ্যই সুর-নির্ভর হতে হবে। অর্থাৎ বোল-বানাও এর মতো গানের বাণীর প্রয়োগ না করে শুধু স্বর আর সুরের মিশ্রণে সৃষ্টি হবে বিস্তারের। যার নিখুত বুননশৈলী বাংলা রাগপ্রধান গানের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবপ্রধান

ঠুমরী গানে কৃষ্ণ-চেতনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ, বর্ষা-মেদুর বিরহঘন ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কাফি রাগের– যবসে শ্যাম সিধারে, খাম্বাজের– তারপ তারপ জিয়া যায়ে, মিশ্র-পিলু রাগের– ঘির আয়িহে কারী বদরীয়া শ্যাম বিন লাগে না মোরা জিয়া ইত্যাদি। ঠুমরী গান ভাবপ্রধান গীতধারা যা রাগের বিশুদ্ধতার চেয়ে ভাবের প্রতি বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর ভাব প্রকাশে সহায়তা করে কথা ও সুর। উক্ত বিষয়গুলো রাগপ্রধান বাংলা গানেও লক্ষণীয়। শুদ্ধ রাগে রাগপ্রধান গাওয়া না হলেও এই গানে রাগের একটা ভাব বজায় থাকে। রাগের চেয়ে ভাবের প্রতি আগ্রহের প্রবণতা ঠুমরী গান থেকেই এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বেহাগ রাগে গীত প্রেম-বিরহের কাহিনী সম্বলিত 'আমায় বলো না ভুলিতে বলো না' রাগপ্রধান বাংলা গানের কথা বলা যেতে পারে। এই গানে রাগভাব বজায় রেখেই গানের কাব্যভাবকে সার্থকরূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সুরের দ্বারা।

তান–সরগম

রাগপ্রধান বাংলা গানে তান-সরগমের ব্যবহার খেয়াল ও ঠুমরী গানের দ্বারা প্রভাবিত। পাঞ্জাবী ঠুমরী গানে তানের প্রয়োগ থেকে উৎসাহিত হয়ে কতিপয় গায়ক বাংলা রাগপ্রধান গানে এর প্রয়োগ করে থাকেন। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া রাগপ্রধান বাংলা গানে তান-সরগম অধিক পরিলক্ষিত হয়। তবে রাগপ্রধান বাংলা গানে তান–সরগম এর ব্যবহার আবশ্যক কোন বিষয় নয়। এই ধারার গান পরিবেশনে গায়ক তার প্রয়োজনে বা আবেগতারিত হয়ে এই অলংকারের প্রয়োগ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংগীত সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই ভারতবর্ষে সংগীতের বিকাশ শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বহুরূপ সংগীত ধারার মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় সংগীতে যখন রাগের প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে এই উপমহাদেশের সংগীতের গতি-বিধিতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাগসংগীতের আধারে জন্মলাভ করে নানা ধরনের গীতধারা। এদের মধ্যে প্রাচীন ধ্রুবপদ প্রবন্ধ গানের আদলে রচিত ধ্রুপদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গায়নশৈলী। পরবর্তীকালে যুগে যুগে আরও অনেক গায়নধারার সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, তারানা, দাদরা, গজল, চৈতী, কাজরী, ত্রিবট, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উক্ত গীতিধারা গুলোর মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়াল বহুকাল রাজত্ব করেছে ভারতীয় সংগীত ভুবনে। একসময় এই ধারাগুলোর শাস্ত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা শ্রোতার মনোরঞ্জনের যোগান দিতে ব্যর্থ হলে শাস্ত্রীয় নিয়মের জটিলতামুক্ত এবং অধিক রসালো মনোরঞ্জনকারী রচনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এক বিশেষ গীতিধারা যার নাম 'ঠুমরী'। ঠুমরী গান উত্তর প্রদেশের গ্রাম্যগীতের পরিবর্তিত ও পরিশীলিত রূপ। জন্মলগ্নে এই গান গ্রাম্য লোকগীত ও নৃত্যগীত হিসাবে প্রচারিত হয়েছে। উত্তর ভারতের বাঈজীদের অর্থ উপার্জনের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল এই ঠুমরী গান। তারা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন আসরে এই ঠুমরী গানের অধিক পরিবেশন করতেন। তবে তাদের গায়নপদ্ধতি বর্তমানকালের ঠুমরীর মতো পরিপাটি ছিল না। তৎকালীন সময়ে বাঈজীরা নৃত্যসহযোগে নানা অঙ্গভঙ্গি প্রকাশের দ্বারা ঠুমরী গানের কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। নারী মনের ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি এই গানের বিষয়বস্তু হওয়ায় শাস্ত্রীয় সংগীতের পর্যায় বহির্ভূত ছিল এই ঠুমরী গান। তবে পরবর্তীকালে রাজদরবারের বিভিন্ন সংগীতজ্ঞদের সংস্পর্শে এসে অবহেলিত ও অনুন্নত ঠুমরী গান একটি উন্নত পর্যায় পরিগ্রহ করে। ঠুমরীর এই উৎকর্ষ লাভে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্। তিনি তাঁর দরবারে এই গানের স্থান না দিলে হয়তো ঠুমরী গান আজও গ্রাম্য-লোকগীত হিসাবেই রয়ে যেত। অষ্টাদশ শতকে এসে ঠুমরী গানের একটি বিধিবদ্ধ রূপ সৃষ্টি হয় লক্ষ্ণৌ শহরে। অষ্টাদশ শতক থেকেই আধুনিক ঠুমরী গানের জয়যাত্রা শুরু হয় এবং সমগ্র ভারতে এর মধুরতা ছড়াতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ঠুমরী গানের চর্চা প্রসারিত হয় কলকাতায় নবাব ওয়াজেদ আলীর আগমন উপলক্ষে। অভিনব পদ্ধতির ঠুমরী গান কলকাতার শ্রোতা সমাজকে করেছিল অধিক আকর্ষিত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজদরবারের সংগীতজ্ঞরা বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিতে শুরু করেন এবং সংগীত শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমন্ত্রণে আসরে সংগীত পরিবেশন আরম্ভ করেন। এ ধারা কলকাতায়ও ব্যাপক সাড়া ফেলে। ফলে বহু শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞের আগমন ঘটে কলকাতায় এবং রাগসংগীতের চর্চা অধিক প্রসারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য গীতধারার তুলনায় বিশেষ করে ঠুমরী গানের গ্রহণযোগ্যতা কলকাতায় অধিক দেখা যায়। ঠুমরী গানের গায়নশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক বাংলা গান ও রাগরাগিণীর মিশ্র প্রয়োগে ঊনবিংশ শতকে সৃষ্টি হয় রাগপ্রধান বাংলা গানের। অভিনব পদ্ধতির এই বাংলা গান বাংলা সংগীত জগতকে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বাংলা গানের কাব্যভাব যথাযথ রেখে তাতে রাগের রূপ প্রকাশপূর্বক শৃঙ্গার রসাত্মক সুর সৃষ্টি বাংলা রাগপ্রধান গানকে করেছে সমৃদ্ধ। এই গানের সৌন্দর্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিল তৎকালীন কলকাতা বেতার কেন্দ্র। 'রাগপ্রধান' শিরোনামে এই গানের প্রচার শুরু হয় কলকাতা বেতার থেকে। এরপর রাগপ্রধান বাংলা গান সমগ্র বঙ্গদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই গানের মধুর সুর ও সাহিত্য যুগে যুগে জন্ম দিয়েছে বহু গীতিকার ও সুরকারের। ঠুমরী গানের হালকা চাল, সুর-বিস্তার, বিষয়বস্তু, রাগ মিশ্রণ, স্বর-বিস্তারের স্বাধীনতা, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বাংলা রাগপ্রধান গানে। এই গানের অধিক জনপ্রিয়তার কারণ হলো রাগপ্রধান বাংলা গান রাগসংগীতের শ্রোতা ও বাংলা গানের শ্রোতা উভয়ের মনোরঞ্জনে সক্ষম। তাই রাগপ্রধান বাংলা গান অন্যান্য বাংলা গান থেকে পৃথক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চার এবং পৃষ্ঠপোষকতার যে ব্যাপকতা রয়েছে, বাংলাদেশে তার পরিধি তুলনামূলকভাবে কম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুণী সংগীতজ্ঞদের দ্বারা এ দেশে ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশে রাগসংগীত তথা ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা, বাংলা কাব্যের সাথে রাগরাগিণীর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান সাপেক্ষে ঠুমরী ও বাংলা রাগপ্রধান গানের ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন করাই এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে ঠুমরী গান ও রাগপ্রধান গানে ঠুমরীর প্রভাব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এই অভিসন্দর্ভটি ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গান সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা কাজে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১

চিত্র- ঠুমরী ও রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পী

চিত্রঃ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্

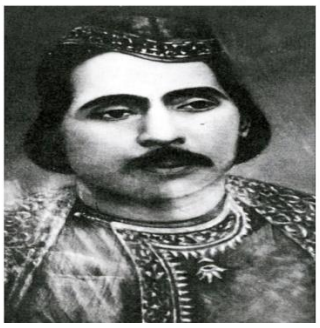

চিত্রঃ বিন্দাদীন মহারাজ

চিত্রঃ গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)

চিত্র: ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ

চিত্রঃ ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

চিত্র: বিদুষী গহরজান

চিত্রঃ পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

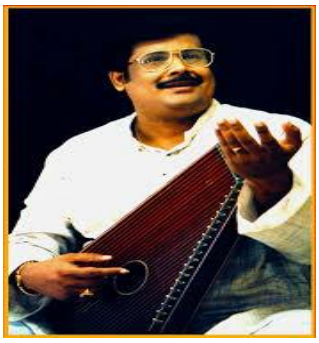

চিত্রঃ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী

চিত্র: বিদুষী গিরিজা দেবী

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রঃ বেগম আখতার (আখতারী বাঈ)

চিত্রঃ শিপ্রা বসু

চিত্রঃ পণ্ডিত অরুণ ভাদুরী

চিত্রঃ পণ্ডিত ভীমসেন যোশী

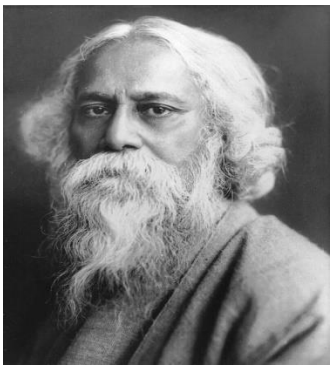

চিত্র: কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

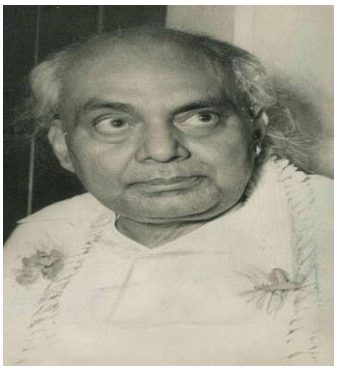

চিত্র: কবি কাজী নজরুল ইসলাম

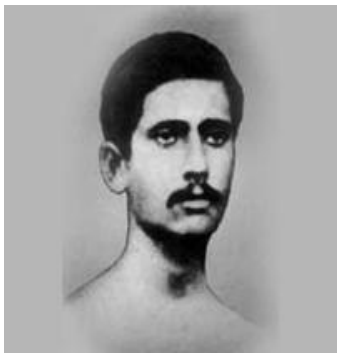

চিত্র: রজনীকান্ত সেন

চিত্র: অতুলপ্রসাদ সেন

চিত্র: দিজেন্দ্রলাল রায়

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী

চিত্রঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

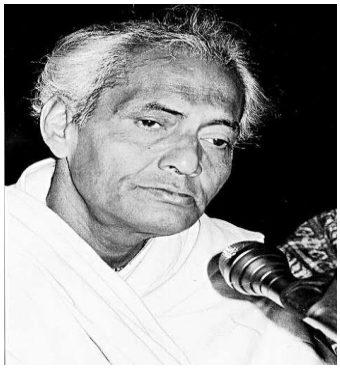

চিত্র: অখিলবন্ধু ঘোষ

চিত্রঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্র: প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র: চিন্ময় লাহিড়ী

চিত্র: সুধীরলাল চক্রবর্তী

চিত্র: তারাপদ চক্রবর্তী

চিত্র: শচীন দেব বর্মন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রঃ অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী

চিত্র: দীপালী নাগ

চিত্র: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

চিত্র: হৈমন্তী শুক্লা

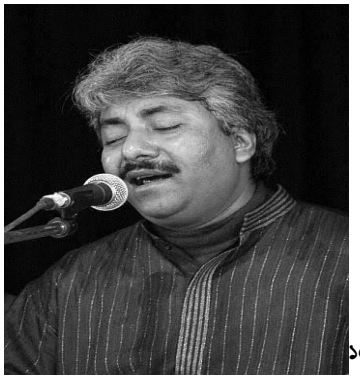

চিত্র: ওস্তাদ রসিদ খান

১৫৭

১৫৭। চিত্রসূত্র– Google Photos

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান বাংলা গানের তালিকা

গানের নাম	রাগের নাম	অঙ্গ	শিল্পীর নাম	গীতিকার	সুরকার
১। ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল	নটমল্লার	ভজন	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
২। শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়	ছায়ানট	টপ্পা	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৩। জোছনা করেছে আড়ি	পিলু	ঠুমরী	বেগম আখতার	রবিগুহ মজুমদার	রবিগুহ মজুমদার
৪। তুমি তো জানো না	রাগেশ্রী	রাগপ্রধান	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
৫। ভোরের শিশির হয়ে	বিলাসখানী টোড়ী	রাগপ্রধান	অজয় চক্রবর্তী	অতনু চক্রবর্তী	অরুণ ভাদুরী
৬। পিয়া ভোল অভিমাসন	পিলু	ঠুমরী	বেগম আখতার	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৭। ফুলেরি দিন হলো যে অবসান	জয়জয়ন্তী	রাগপ্রধান	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	অজয় ভট্টাচার্য	অজয় ভট্টাচার্য
৮। মম মন্দিরে কে এলে	আড়ানা	রাগপ্রধান	শচীনদেব বর্মন	হিমাংশু দত্ত	হিমাংশু দত্ত
৯। অন্তর দ্বার খোল গো খোল		রাগপ্রধান	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
১০। তিলক দিলে কে শ্যাম	তিলককামোদ	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
১১। তুমি ব্যাথা দিলে		রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
১২। রিনিঝিনি পায়ে	মধুবন্তী	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	অমলেন্দু বিকাশকর চৌধুরী	অমলেন্দু বিকাশকর চৌধুরী
১৩। আজি বসন্তে মঞ্জুরবায়	বসন্ত	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
১৪। গুঞ্জরনে এলো অলি	ছায়া-হিন্দোল	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী	অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী
১৫। ঐ ঘিরে আসে বাদলের মেঘ	দেশ	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী	অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী
১৬। কেন তুমি প্রিয়	পিলু	রাগপ্রধান	ভারতী কর চৌধুরী	অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী	অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী
১৭। এ কি তন্দ্রা বিজরিত	মালকোষ	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
১৮। গানে গানে কে গো	ললিত	রাগপ্রধান	শিপ্রা বসু	গোপাল দাশগুপ্ত	গোপাল দাশগুপ্ত
১৯। রাধা নামে বাঁশরী বাজে		রাগপ্রধান	চিন্ময় লাহিড়ী	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
২০। মধু বসন্তের আজি	বসন্ত	রাগপ্রধান	দীপালী নাগ	শ্যামল গুপ্ত	দীপালী নাগ
২১। আমায় বোলো না ভুলিতে	বেহাগ	রাগপ্রধান	দীপালী নাগ	হিমেল নস্কর	দীপালী নাগ
২২। ফিরায়ে দিও না মোরে	মিশ্র সুহা	রাগপ্রধান	বেগম আখতার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
২৩। গুঞ্জন মঞ্জির পায়	পিলু	রাগপ্রধান	অজয় চক্রবর্তী		

Dhaka University Institutional Repository

২৪। ফিরে যা বনে	পিলু	রাগপ্রধান	বেগম আখতার	রবিগুহ মজুমদার	রবিগুহ মজুমদার
২৫। চুপি চুপি চলে না গিয়ে	ভৈরবী	রাগপ্রধান	বেগম আখতার	রবিগুহ মজুমদার	রবিগুহ মজুমদার
২৬। চুপি চুপি কাছে এসে	দরবারী কানাড়া	রাগপ্রধান	ফেরদৌসী রহমান	মো: মনিরুজ্জামান	আলী হোসেন
২৭। ফিরে যা ফিরে যা পাপিয়া		রাগপ্রধান	পুতুল চক্রবর্তী	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
২৮। আর ডেকোনা আমায়		রাগপ্রধান	পুতুল চক্রবর্তী	বৈদ্যনাথ বিশ্বাস	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
২৯। ফিরে কেন এলেনা		রাগপ্রধান	বেগম আখতার	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৩০। কোয়েলিয়া গান থামা	মাঝ-খাম্বাজ	ঠুমরী	বেগম আখতার	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৩১। এই মৌসুমে পরদেশে		রাগপ্রধান	বেগম আখতার	রবিগুহ মজুমদার	রবিগুহ মজুমদার
৩২। আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি	দরবারী	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
৩৩। ওগো যাহা কিছু মোর	সিন্ধু-কাফি	টপ্পা	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৩৪। হলো নিশি ভোর	কাফি-ভৈরবী	রাগপ্রধান	কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫। আমার সহেলী ঘুমায়	মারুবেহাগ	রাগপ্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	অরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়	অখিলবন্ধু ঘোষ
৩৬। সে কুহু যামিনী	জয়জয়ন্তী	রাগপ্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অখিলবন্ধু ঘোষ
৩৭। চামেলী মেল আঁখি	ভূপাল-টোড়ী	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
৩৮। মধুরাতি ভোর হয়	কোমল আশাবরী	রাগপ্রধান	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৯। কেন ফিরে যাও	কলাবতী	রাগপ্রধান	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
৪০। মেঘ এসে ছুঁয়ে যায়	মিয়া মালহার	ঠুমরী অঙ্গ	গুলাম আলী	আসাফউদৌলা	
৪১। আমি সুরে সুরে ওগো	রাগেশ্রী	রাগপ্রধান	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪২। রজনী ফুরালো যে পথপানে চাহিয়া		রাগপ্রধান	চিন্ময় লাহিড়ী	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
৪৩। বাঁধো ঝুলনা তমাল বনে	বসন্ত	রাগপ্রধান	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪৪। রাঙালে যারে সে ফাগুনে	কৌশিকধ্বনি	ঠুমরী অঙ্গ	অজয় চক্রবর্তী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪৫। কি করি সজনী	পিলু	ঠুমরী অঙ্গ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ওস্তাদ মুনাব্বর আলী খাঁ
৪৬। অন্তর দ্বার খোল	কৌশিকধ্বনি	ুরাগপ্রধান	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪৭। কোথা গেল শ্যাম	ভৈরবী	খেয়াল অঙ্গ	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
৪৮। যদি মনে পড়ে	কাফি-ভৈরবী	রাগপ্রধান	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	অজয় ভট্টাচার্য	অজয় ভট্টাচার্য
৪৯। যমুনা কি বলতে পারে	কিরওয়ানী	রাগপ্রধান	শিপ্রা বসু	সুনীল বরণ	সুকুমার মিত্র
৫০। তুমি না এলে জলসা ঘরে	মিশ্র পিলু	রাগপ্রধান	শিপ্রা বসু	অতনু চক্রবর্তী	অতনু চক্রবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৩

উল্লেখযোগ্য ঠুমরী গানের তালিকা

গানের নাম	রাগ	তাল	রচয়িতা/শিল্পী
১। রস্‌কে ভরে তোরে ন্যায়ন	ভৈরবী	যৎ	পণ্ডিত ভীমসেন যোশী
২। আব কে সাওয়ান ঘর আজা	তিলককামোদ	দীপচন্দী	বেগম আখতার
৩। ক্যায়সে বিতাও ব্যায়রী র‍্যায়ন	কাফি	সিতারখানি	ওস্তাদ গোলাম আলী
৪। রসিয়া মোহে বোলায়ে	কৌশিকধ্বনি	কাহারবা	ড. প্রিয়াংকা গোপ
৫। যাও ওহি তুম শ্যাম	মিশ্র-খাম্বাজ	যৎ	বিদুষী গিরিজা দেবী
৬। নদীয়া কিণারে মোরা গাও	পিলু	দীপচন্দী	পণ্ডিত ভীমসেন যোশী
৭। কাটে না বিরহ্ কি র‍্যায়ন	পিলু	যৎ (বিলম্বিত লয়)	বিদুষী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
৮। মোহে মাত মারো শ্যাম	মিশ্র-ভূপালী	অদ্ধা	ড. প্রিয়াংকা গোপ
৯। যব সে শ্যাম সিধারে	কাফি/ জংলা	যৎ	বেগম আখতার
১০। যা রে যা কাগা	মিশ্র-পাহাড়ী	কাহারবা (মধ্য লয়)	বিদুষী পারভিন সুলতানা
১১। বাবুল মোরা নৈহার ছুট যায়	ভৈরবী	যৎ	আখ্‌তর পিয়া
১২। পানী ভরে কৌন অলবেলে	মিশ্র-গারা	দাদরা	ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ
১৩। নাহক লায়ে গবনবা মোরা রে	ভৈরবী	আদ্ধা	গহরজান
১৪। মদ কে ভরে তোরে নৈন	মিশ্র-খাম্বাজ	দীপচন্দী (১৬ মাত্রা)	বিদুষী গিরিজা দেবী
১৫। ইয়াদ পিয়া কী আয়ে	কৌশিকধ্বনি	কাহারবা	ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
১৬। কা করু সজনী আয়ে না বালম	পিলু	কাহারবা	ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
১৭। পিয়া কে মিলন কী আস	যোগীয়া	ত্রিতাল (বিলম্বিত লয়)	ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ
১৮। কৌন গলি গায়ো শ্যাম	খাম্বাজ	দীপচন্দী (মধ্য লয়)	ড. প্রভা আত্রে
১৯। সুধি ন লীনি জবসে গয়ে	খাম্বাজ	দাদরা (মধ্য লয়)	
২০। সমঝত নাহি পনঘট পিয়া	খাম্বাজ	ত্রিতাল (মধ্য লয়)	
২১। বরজোরী ন করো মোসে	খাম্বাজ	ত্রিতাল (মধ্য লয়)	
২২। অন মিলো সাজনা	খাম্বাজ	কাহারবা	পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী
২৩। আব মান যাও সাইয়া	পিলু	দাদরা (মধ্য লয়)	ওস্তাদ রসিদ খাঁন

Dhaka University Institutional Repository

২৪। বাল্‌মওয়া নহি আয়ে মোর	শিবরঞ্জনী	দাদরা	বেগম আখ্‌তার
২৫। বলমুয়া তুম ক্যা জানো প্রীত	জংলা	কাহারবা	বেগম আখতার
২৬। নজরিয়া লাগে নহি কাহি ওর		কাহারবা	শোভা গুর্ত
২৭। খেলত নন্দ কুমার রে	কাফি	যৎ (বিলম্বিত লয়)	পণ্ডিত ভীমসেন যোশী
২৮। ইতনি তো মানো শ্যাম	কাফি	যৎ (বিলম্বিত লয়)	
২৯। ঘির আয়ি হে কারি বদরিয়া	দেশ	কাহারবা	
৩০। জা মে তোসে নাহী বলু	ভৈরবী	দাদরা	
৩১। পী কী বোল না বোল	পিলু	যৎ (বিলম্বিত লয়)	বেগম আখতার
৩২। কোয়েলিয়া মাত্‌ কর পুকার	মাঝ-খাম্বাজ	দাদরা	বেগম আখতার
৩৩। বেদারদি তুনে দরদ্‌ না জানা	পাহাড়ী	কাহারবা	ওস্তাদ রসিদ খান
৩৪। আজ রাধা বৃজ কো চলে	ভৈরবী	আদ্ধা	ওস্তাদ রসিদ খান
৩৫। নদীয়া ব্যয়রী ভয়ি	দেশ	আদ্ধা	ওস্তাদ রসিদ খান
৩৬। নৈয়না মোরে তরস গায়ে	ভৈরবী	কাহারবা	ওস্তাদ বড়ে গোলম আলী খাঁ
৩৭। সৈয়া বলো তানেক মোসে	পিলু	দাদরা	ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
৩৮। সৈয়া নিকাস গায়ে	ভৈরবী	কাহারবা	কৌশিকি চক্রবর্তী
৩৯। সৈয়া গায়ে পরদেশ	পিলু	দাদরা	ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
৪০। তোরে বিন্‌ মোহে চ্যান নহি	কিরওয়ানী	আদ্ধা	ওস্তাদ রসিদ খান
৪১। তোসে নহি বলু শ্যাম	খাম্বাজ	যৎ	বিদুষী কিশোরী আমন্‌কর
৪২। পিয়া নহি আয়ে	মিশ্র-গারা	যৎ (বিলম্বিত লয়)	বেগম আখতার
৪৩। বরসন লগী বদরিয়া	মিশ্র-পাহাড়ী	দাদরা	কৌশিকি চক্রবর্তী
৪৪। ইয়াদ সাতায়ে দিন র‍্যায়না	মিশ্র-ভৈরবী	কাহারবা	ন্যায়না বুর্মি
৪৫। যাও ওহি তুম শ্যাম	মিশ্র-খাম্বাজ	যৎ (বিলম্বিত লয়)	পিও মুখার্জী
৪৬। বাজুবন্দ খুল খুল যায়ে	ভৈরবী	আদ্ধা/ সিতারখানি	ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
৪৭। বাত্‌ বাত্‌ ম্যায় বিত গায়ে রাত	পাহাড়ী	দাদরা	ওস্তাদ রসিদ খান
৪৮। প্রেম না জানে রসিয়া		যৎ (বিলম্বিত লয়)	নির্মলা দেবী
৪৯। লাখো কি বোল সহি	কৌশিকধ্বনি	কাহারবা	নির্মলা দেবী
৫০। লাগিরে মানওয়া মে চোট	পাহাড়ী	কাহারবা	শাফকত আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- কর চৌধুরী, অমলেন্দুবিকাশ। *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*। কলকাতা ঃ ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪।
- খান, মোবারক হোসেন। *সংগীত মালিকা*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩।
- খান, মোবারক হোসেন। *সংগীত প্রসঙ্গ*। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮০।
- খান, মোবারক হোসেন। *সংগীত সাধনা* । ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
- খান, মোবারক হোসেন। *রাগসংগীত*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
- খান, মোবারক হোসেন। *কণ্ঠ সাধন*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।
- খান, মোবারক হোসেন। *গীতমঞ্জুরী*। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৫।
- খান, লীনা তাপসী। *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*। ঢাকা ঃ নজরুল ইনষ্টিটিউট, ২০১১।
- গোস্বামী, উৎপলা। *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা*। কলকাতাঃ দীপায়ন, ১৪০৫।
- গোস্বামী, করুণাময়। *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*। ঢাকা ঃ বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ২০১৪।
- গোস্বামী, করুণাময়। *সংগীতকোষ*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
- গোস্বামী, করুণাময়। *বাংলা গানের বিবর্তন*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ। *রবীন্দ্র নজরুল বিভাকর*। কলকাতা ঃ সঙ্গীত প্রকাশন, ১৯৮০।
- গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *ভারতীয় সংগীতের কথা*। কলকাতা ঃ প্রকাশক–শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫।
- ঘোষ, শম্ভুনাথ। *সংগীতের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড)। কলিকাতা ঃ সঙ্গীত প্রকাশন, ২০১৫।
- ঘোষ, শম্ভুনাথ। *সংগীতের ইতিবৃত্ত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলিকাতা ঃ সঙ্গীত প্রকাশন, ২০১৫।
- ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার। *ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তন* ঃ সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, ১৯৮৯।
- ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার। *বাংলায় রাগ সংগীত চর্চার ধারা*। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমী, ১৯৯৯।
- ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার। *ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ক্রমবিবর্তন*। কোলকাতা ঃ আশিস পাবলিকেশনস, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
- ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার। *মধ্যযুগের সংগীত ও সঙ্গীতজ্ঞ*। কলকাতা ঃ শিবলিঙ, ২০১০।
- ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার। *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা*। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, ২০০৫।
- ঘোষ, জ্ঞান প্রকাশ। *তহজীব এ মৌসিকী*। কলকাতা ঃ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- ঘোষ, সাবেত্রী। *বাংলা গানের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা ঃ ১৯৭৬।
- ঘোষ, শান্তিদেব। *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*। কলিকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭২।
- চক্রবর্তী, মৃদুলকান্তি। *হাজার বছরের বাংলা গান*। ঢাকা ঃ প্যাপিরাস পাবলিকেশন, ২০০৫।
- চক্রবর্তী, মৃদুলকান্তি। *সংগীত-সংলাপ*। ঢাকা ঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪।
- চক্রবর্তী, ড: অঞ্জলী। *ঠুমরী গানের ইতিকথা* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা ঃ মুখার্জী প্রিন্টার্স, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।
- চক্রবর্তী, অজয়। *শ্রুতিনন্দন*। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

- দাস, রাধামোহন সেন। *সঙ্গীত–তরঙ্গ*। কলিকাতা ঃ প্রকাশক- শ্রী নুটবিহারী রায়, সম্পাদক- শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৯০৩।
- দত্ত, দেবব্রত। *সঙ্গীত সোবন*। কলকাতা ঃ ব্রতী প্রকাশনী, ২০০৪।
- দত্ত, দেবব্রত। *সঙ্গীত–তত্ত্ব ঃ তবলা প্রসঙ্গ*। কলকাতা ঃ ব্রতী প্রকাশনী, ১৯৮২।
- দত্ত, দেবব্রত। *সঙ্গীত-তত্ত্ব ঃ শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ*। কলকাতা ঃ ব্রতী প্রকাশনী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
- দত্ত, দেবব্রত। *সঙ্গীত-সহায়িকা ঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশ্নোত্তরী পুস্তক* (১ম-২য়)। কলিকাতা ঃ ব্রতী প্রকাশনী, ১৯৭৫-৭৬।
- দত্ত, দেবব্রত। *সঙ্গীততত্ত্ব* (১ম-২য়)। কলকাতা ঃ ব্রতী প্রকাশনী, ২০১১-১২।
- নস্কর, স্বপন। *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা* (২য় খণ্ড)। কলকাতা ঃ শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯।
- প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *রাগ ও রূপ* (১ম ভাগ)। কলিকাতা ঃ শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।
- প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস* (২য় খণ্ড)। কলিকাতা ঃ শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন। *সঙ্গীত পরিচিতি* (উত্তরভাগ)। কলকাতা ঃ আদিনাথ ব্রাদার্স, ২০০৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন। *সঙ্গীত পরিচিতি* (পূর্বভাগ)। কলকাতা ঃ আদিনাথ ব্রাদার্স, ২০০৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়রঞ্জন। *সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা*। কলকাতা ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন। *গীতসূত্রসার (১৪)*। কলিকাতা ঃ এ. মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৭৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্। *বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত*। কলকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ২০০১।
- বিশ্বাস, নন্দগোপাল। *ঠুমরী লহড়ী* (১ম-৩য়)। কলিকাতা ঃ দীপায়ন, ১৪০২-১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
- বিশ্বাস, মীনাক্ষী। *পরম্পরা*। কলকাতা ঃ সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩।
- ভট্টাচার্য, শক্তিপদ। *উচ্চাঙ্গ ক্রিয়াত্মক সঙ্গীত*। কলকাতা ঃ নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮০।
- মিত্র, শ্রী রাজ্যেশ্বর। *মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা*। কলিকাতা ঃ লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৪।
- মন্ডল, কৃষ্ণপদ। *বাংলা রাগ সংগীত* (১ম খণ্ড)। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৭।
- মুখোপাধ্যায়, কুমার প্রসাদ। *খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সংগীতের অবক্ষয়*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং,২০০৩।
- মুখোপাধ্যায়, কুমার প্রসাদ। *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায়, কুমার প্রসাদ। *মজলিস*। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬।
- মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার। *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*। কলকাতা ঃ এ মূখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায়, ড. বিদ্যুৎশিখা। *সঙ্গীতজ্ঞকোষ*। কলকাতা ঃ নীলশিখা প্রকাশনী, ২০১৫।
- মুহুরী, রেবা। *ঠুমরী ও বাঈজী*। কলকাতা ঃ প্রতিভাস, ১৯৮৬।
- মজুমদার, মানসী। *প্রসঙ্গঃ রাগসংগীত*। কলকাতা ঃ আশাদীপ, ২০১৫।
- মজুমদার, দীপ্তি প্রকাশ। *হাজার বছরের বাংলা গান*। কলকাতা ঃ অমর ভারতী, ২০০৩।
- রবিশঙ্কর। *রাগ-অনুরাগ*। কলকাতা ঃ আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৮০।
- রায়, ইন্দু ভূষণ। *সঙ্গীত শাস্ত্র* (৩য় খণ্ড)। কলিকাতা ঃ প্রকাশিকা-মল্লিকা রায়, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
- রায়, ইন্দু ভূষণ। *সঙ্গীত শাস্ত্র* (২য় খণ্ড)। কলিকাতা ঃ প্রকাশিকা-মল্লিকা রায়, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
- রায় চৌধুরী, বিমলাকান্ত। *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ*। কলকাতা ঃ সাম্প্রতম প্রকাশন, ১৩৭২।
- রায়, অসিত। *সংগীত অন্বেষা*। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১৯।
- রায়, সুকুমার। *বাংলা সংগীতের রূপ*। কলিকাতা ঃ এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
- শোয়েব, মোহাম্মদ। *ষড়জঃ সংগীত শিক্ষা সহায়িকা*। ঢাকা ঃ সালমা প্রকাশ, ২০১৭।
- সরকার, পংকজ কান্তি। *রাগ সঙ্গীত সাধনা*। ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েবসাইট ও অন্যান্যঃ

- ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী- প্রচলিত সংগ্রহ- শ্রেণি পাঠদান থেকে।
- https://nazrulgeeti.org/sa
- http://indianmusicschool.com/gara/
- https://meetkalakar.com/Artipedia/Gara%20
- https://lucknowobserver.com/bindadin-maharaj/
- https://www.swarganga.org/artist_details.php?id=160
- https://musicgoln.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a7%9f%e0%a6%be/
- https://www.banglatribune.com/literature/series/375813/%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%B0%E0%A6%99
- https://www.sangtar.com/2009/11/jangla/
- http://onushilon.org/music/tal/dhumali.htm
- https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/rabibashoriyo/the-time-when-lat-nawab-of-awadh-wajid-ali-shah-lived-in-kolkata-1.761756
- https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.265936
- https://granthagara.com/
- https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80
- https://www.newsg24.com/culture-news/124//

তথ্য ও উপাত্ত প্রদান সহায়তায়ঃ

- নিলুফার ইয়াসমিন স্মৃতি পাঠাগার, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার।
- সুধীজন পাঠাগার।